Anjali 2024 Durga Puja Magazine

GBBA DURGAPUJA

অঞ্জলি ১৪৩১

সূচীপত্র

মহাব্রতা মণ্ডল প্রচ্ছদ (Front Cover)
রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায় শেষের পাতার অঙ্কন (Back Cover)
অনসূয়া দত্ত~~GBBA Puja(Inside cover page)
প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি~~ অলঙ্করনের অঙ্কন এবং সম্পাদকীয়

গল্প

পায়েল চট্টোপাধ্যায়:ময়নাগুড়ির কেচক-কেচকানির কথা গোসানী মা বৃত্তান্ত—P 1

নুপুর রায়চৌধুরী: ল্যাভেন্ডার মুন :----------P 5

গান্ধর্বিকা ভট্টাচার্য: অহেতুক: ----------P 9

ঝর্না বিশ্বাস: বৃক্ষযাপন: ----------P 24

অচিন্ত্য দাস: কিছু একটা: ----------P 26

শিবানী ভট্টাচার্য দে: ভবঘুরে: ----------P 37

সংযুক্তা মহলানবীশ: স্বপ্নের ফেরিওয়ালা: ----------P 46

উত্তম চক্রবর্তী: এক দুষ্টু পাত্রীর গল্প: ----------P 54

মিলি ঘোষ : শিকড় থেকেই যায়: ----------P 58

সুদীপ সরকার: মনে মনে: ----------P 62

তমেকা ঘোষ: পুজোর স্মৃতি -- স্মৃতির পুজো: ----------P 68

স্বরূপ মণ্ডল: ডায়াগনোসিস: ----------P 71

অনন্যা দাশ: মার্জার উপাখ্যান: ----------P 81

সুস্মিতা ঘোষ:ত্রিনয়না: ----------P 86

দেবাশিস দাস: বিভ্রান্তি: ----------P 95

প্রবন্ধ

সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়- ঔপনিবেশিক বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা: ---------- P 21

তন্ময় কবিরাজ- তোতাপাখির ঐক্য: ----------P 32

অনির্বাণ সাহা- চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার শোভাযাত্রার ইতিকথা: ----------P 41

ভ্রমণ

দেবায়ন চৌধুরী-হরিদ্বার: স্বর্গের প্রবেশপথ: ----------P 14

অঞ্জনা মজুমদার-কম্বোডিয়া, হিন্দু আর বৌদ্ধধর্মের মিলনক্ষেত্র: ----------P 50

দিব্যেন্দু ঘোষ- নদীর ঘাটের কাছে নৌকা বাঁধা আছে; ----------P76

স্মৃতিকথা

শোভন সেনগুপ্ত- পুজোর দিনে : ----------P 3

রম্য রচনা

চৈতালি সরকার- রুনুদি: ---------- P 18

অনুপ কুমার বসাক- অবসরের আড্ডায়: ----------P 35

অদিতি ঘটক ত্রিভুবন কাপ: ----------P65

কবিতা

আর্যা ভট্টাচার্য-'চান্স ইন আ মিলিয়ন ': ----------P 106

সুবীর বোস-সত্যবতী: ----------P107

জয়া মজুমদার- ফিকে ভালোবাসা: ----------P108

কবিরুল (রঞ্জিত মল্লিক)- অভিমান: ----------P108

কাজল মৈত্র- প্রেমের পাঁচালী : ----------P109

চয়ন দত্ত- মহাকাব্য স্মৃতি: ----------P109

শম্পা ঘোষ- সীমানা: ----------P110

নীলাঞ্জনা হাজরা- রূপের বাহার : ----------P110

স্নেহাশিস মুখোপাধ্যায়- বর্ষার নিরুপমা : ----------P111

স্বপনকুমার পাহাড়ী- ভাবনা: ----------P112

তুষার ভট্টাচার্য-আবার যদি দেখা হয়: ----------P112

অঞ্জলি দেনন্দী, মম- অঞ্জলি: ----------P113

সুখময় দাস- বেল পাতা: ----------P113

ঝুমা দত্ত মা এলো : ----------P114

দীনেশ সরকার- আলোর বেণু বাজে: ----------P114

গোবিন্দ মোদক বছর পরে নিজের ঘরে : ----------P115

নিমাই চন্দ্র দে- অনাহূত: ----------P115

হরবোলা সুনীল আদক- বাঙালির প্রিয় উৎসব: ----------P116

কবিতা

সুজন দাশ- চাইছি মাগো তোর কাছে আজ: ----------P116

গৌউর দে- শারদীয়া ইতিকথা: ----------P 117

শ্রীকান্ত মাহাত-মেঘলা দিনে: ----------P118

মলয় সরকার- ভোরে:----------P119

বিকাশ ভট্টাচার্য-আঁধারমাধুরী: ----------P120

মোহন মিত্র- শান্তির খোঁজে: ----------P121

প্রভাত ভট্টাচার্য-জাদুআয়না: ----------P122

দিলীপ হরি- বাংলার বারো মাস----------P123

নয়ন মণি মিশ্র- আমি ফেলে এসেছি: ----------P124

অন্বেষা চক্রবর্তী মুখার্জী- আমার বিকেল: ---------- P125

ছন্দা দাম-আগলে রাখার রোগ: ----------P126

জয়ন্ত কুমার মল্লিক-সুখের ঘরের চাবি: ----------P127

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়-পরিস্থিতি: ----------P128

সুজিত বসু কবিতা নয়: ----------P129

দিলীপ হরি- আমি জানিনা: ----------P130

সঞ্জীব হালদার-এ শহরে নিজেকে বন্দী করি: ----------P132

Art

Allabhya Ghosh: ----------P100

Maitreyee Mukherjee: ----------P102

Neelesh Nandi (Photography): ----------P99

Rupanjana Rakhsheet: ----------P104

Rajarshi Chatto Sri Durga (Back Cover): ----------

Sanghamitra Bhattacharya: ----------P103

Snehasish Mukherjee painting: ----------P101

Anusua Datta: ----------P105

Youth Corner

Tiana Mazumder: ----------P133

Kumari Sarit Kar: ----------P134

Anish Pal: ----------P136

Udita Maitra: ----------P135

English Section

Vaswati Biswas: First Durga Puja at Belur Math: ----------P137

PARAMARTHA BANDYOPADHYAY: ONE LAST TIME: ----------P140

Rwitwika Bhattacharya: Goodbye Riju: ----------P141

Asish Mukherjee: The Guiding Angel: ----------P143

Wribhu Chattopadhyay:The Flow: ----------P144

Sushma Vijayakrishna: An Ode to a Million-dollar memory: -- -P148

Aniruddha Sen: The Pilot and His Dames: ----------P150

Archana Susarala: Caregiving: ----------P155

Śyāmalakr̥ṣṇa basu: Oh, my Love: ----------P156

Prasun Kumar Dutta: THE GREAT CONTRACT: ----------P157

Sushovita Mukherjee: Maira's Wedding: ----------P163

Sheema Roychowdhury: Plant Prajanmo: ----------P166

সম্পাদকীয়

আবার এসে গেল বাঙালির অতি প্রিয় উৎসব, দুর্গাপূজা । সেই সঙ্গে প্রতিবারের মত আমরা গ্রেটার বিংহাম্পটন কম্যুনিটির(GBBA) পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য আমাদের শারদীয়া অঞ্জলি ১৪৩১ পত্রিকা কে সাহিত্য ও শিল্প-সম্ভারে সাজিয়ে নিয়ে এসেছি আপনাদের পূজার দিনগুলিকে সাহিত্য পাঠের আনন্দে ভরিয়ে দেবার জন্য ।

আমাদের এই শহর ও তার চারিপাশের বাঙালিরা সংখ্যায় খুবই কম । তবুও অতি অল্প কয়েকজনের ইচ্ছা, উদ্যম, পরিকল্পনা,ও পরিশ্রমের ফলে এই পূজা গত বছর পনেরো ধরে অতি সমারোহের সঙ্গে পালন করা সম্ভব হয়ে চলেছে ।

দুর্গাপূজা সকলের জন্যই অতি শুভ সময় । বাঙালিদের জন্য ধর্মীয় উৎসব হয়েও দুর্গোৎসব বছরের পর বছর ধরে বাঙালি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে ও সকল ধর্মের মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে । সংস্কৃতি এবং ধর্মের এই অভিনব সমন্বয় আর কোনও অনুষ্ঠানে দেখা যায়না । আমাদের এই অতি ক্ষুদ্র কম্যুনিটিতেও এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ।

এখন পশ্চিমবঙ্গ ও তার আশেপাশের এলাকা জুড়ে চলেছে বড় দুঃসময় । মানুষ অন্যায় ও দুর্নীতি সহ্য করতে আর রাজি নয়, সে চাইছে সুবিচার এবং সুরক্ষা। এই ন্যায় ও অন্যায়ের সংঘর্ষে দৈনন্দিন জীবন বিক্ষিপ্ত। আশা করব এই অন্যায়ের যেন সুবিচার মেলে । আর পূজোর দিনগুলি যেন সকলের আনন্দে কাটে ।

আপনারা অনেক লেখক লেখিকারা গত কয়েক বছর ধরে আমাদের পাশে থেকে সাহিত্য অবদানের দ্বারা শারদীয়া অঞ্জলি কে সমৃদ্ধ করে চলেছেন, তাঁদের জন্য অনেক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন রইল ।

এবারের অঞ্জলি অন্য বছরগুলির থেকে একটু অন্যরকম করবার চেষ্টা করেছি । আশাকরি আপনাদের ভাল লাগবে ।

এবারের অঞ্জলিতে রয়েছে রকমারি লেখা। নতুন, পুরানো, অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ লেখক লেখিকার সমন্বয় আশাকরি নতুনত্ব দিয়েছে আমাদের পত্রিকাটিকে ।

নতুন লেখক লেখিকা ও আর্টিস্টদের ধন্যবাদ ও স্বাগত জানাচ্ছি ।

অঞ্জলির পক্ষ থেকে রইল আপনাদের সবাইকার জন্য শারদীয়া ও শুভ বিজয়ার প্রীতি, ও শুভেচ্ছা।

নমস্কারান্তে...।

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

ময়নাগুড়ির কেচক-কেচকানির কথা
গোসানী মা বৃত্তান্ত

গল্প

পায়েল চট্টোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গের সবুজ-ঘেরা রাস্তা। ময়নাগুড়ি থেকে ভোটপট্টি, সেখান থেকে হেলাপাকরি। এই হেলাপাকরি যাওয়ার আগে একটা চওড়া রাস্তা পড়ে। এককালে বিরাট জলাধার ছিল ওখানে। তাই লোকে আজও ওই অঞ্চলকে বলে জল ট্যাঙ্কি। সেখান থেকে কিছুটা এগোলেই খয়ের খাল মোড়। এই মোড়ে পৌঁছলেই দেখা পাওয়া যায় একটা আশ্চর্য বিলের। ঘাসে মোড়া সবুজ বিল। বিল কী? একটা পুরু সবুজ ঘাসের স্তর যার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় জলা জমি। এই ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটো পানসিপ্টি গাছ। দুই গাছ যেন দুই বন্ধু। এই বিল অনেক মাছেদের থাকার জায়গা। স্থানীয় মানুষরা এই জায়গাটাকে বলে 'ঢোল'। উপরে ঘাস, নীচে জল। এই ঢোল অঞ্চলেই নাকি এককালে দেখা পাওয়া গিয়েছিল মা গোসানীর। মা গোসানী হলেন দেবী দুর্গা। লোকশ্রুতি মতে এক রাজবংশী মাড়েয়া এই বিল থেকে উদ্ধার করেছিলেন সোনার দুর্গামূর্তি। সেই উদ্ধারকারীকে দেবী মা-ই স্বপ্নে নিজের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছিলেন। তিনি দেবী মায়ের কথা শুনে ওই ঢোল অঞ্চল থেকে উদ্ধার করেন সোনার দুর্গামূর্তি। দশভূজা, সেই সোনার দুর্গামূর্তি নাকি সরাসরি ওই মাড়েয়ার স্বপ্নে এসে তাকে পুজো করার আদেশ দেন।

এই মূর্তি উদ্ধার হওয়ার পরে খয়ের খাল মোড়ে একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়। দেবী দুর্গা মা গোসানী রূপে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হতে থাকেন এখানে।

কেচক-কেচকানি ও তাদের লোভের কথা:-

বহু যুগ আগের কথা। মা গোসানীর মন্দির তখন তৈরি হয়ে গেছে। দেবী গোসানিকে জাগ্রত দেবতা হিসেবে সকলে পুজো করেন। এক যাযাবর স্বামী-স্ত্রী কেচক ও কেচকানি ময়নাগুড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন বাড়িতে নাচ-গান করে জীবন কাটাত। তবে অভাব সঙ্গ ছাড়েনি। তাদের অর্থ কষ্ট দেখে দয়া হয় মা গোসানীর। দেবী মানুষের বেশ ধারণ করে কেচকানির সামনে এসে দাঁড়ান। "তোকে আমার বাড়ি নিয়ে যাব, আমার বাসায় নাচ-গান করবি?" কেচকানির রোদে পুড়ে যাওয়া মুখ দেখে বললেন ছদ্মবেশী মা গোসানি। এক কথায় রাজি কেচকানি।

নিজের নাচ গানে মাকে সন্তুষ্ট করে কেচকানি। উপহার হিসেবে পায় একঘড়া মোহর। বাড়িতে সেই মোহর নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই অবাক হয় কেচক। "তুই যে সাত রাজার ধন এনেছিস রে।" লোভে চকচক করে ওঠে কেচকের চোখ। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মোহর দেখে লোভী হয়ে পড়ে। তারা পরামর্শ করে পৌছে যায় মা গোসানির বাড়ি। তারা তখনো জানত না যে মা গোসানি আসলে ছদ্মবেশী দেবী মা। যে বাড়িতে কেচকানি নাচ-গান করেছিল সেই বাড়িটিও যে একটি পরিত্যক্ত ঘর তাও জানত না কেচক-কেচকানি। আবার নাচ-গান করে মাকে তুষ্ট করে আরো মোহর আদায়ের জন্য ওই বাড়িতে পৌঁছয় স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু দেবী গোসানি বুঝতে পারেন কেচক-কেচকানির মনের কথা। মায়ের অদৃশ্য অভিশাপে চিরকালের মতো ওই বাড়িতেই আটকে পড়ে কেচক কেচকানি। সারা জীবনের মতো ওই বাড়িতেই থেকে যায় তারা।

কেচক-কেচকানির পুজো ও শেষ কথা

মায়ের অভিশাপে আটকে পড়ে বিলাপ করতে থাকে কেচক কেচকানি। নিজেদের ভুল বুঝতে পারে তারা। অবশেষে তাদের প্রার্থনায় মন গলে মা গোসানির। কথিত আছে মা গোসানি তার মন্দিরের এক পূজারীকে কেচক কেচকানি মুক্তির নির্দেশ দেন । শুধু তাই নয় দেবী মায়ের নির্দেশে গোসানি মায়ের মন্দিরের পাশেই আরেকটি মন্দির নির্মাণ করে কেচক কেচকানির পুজো শুরু করা হয়। টিনের এক ফালি ছাউনি দেওয়া ঘরে পূজিত হন এই দম্পতি। মূলত রাজবংশী মাড়েয়ারাই পুজো করেন কেচক কেচকানির। দুটি পাথরের খন্ডকে এই দম্পতি কল্পনা করে পূজা করা হয়। দুর্গাপুজোর নবমীর দিন ঘটা করে এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। মুরগি বলি দেওয়া হয়। এই মন্দির উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে জাগ্রত। এই মন্দির আজও ময়নাগুড়ির স্থানীয় মানুষকে লোভী না হওয়ার, সাধারণ জীবন-যাপন করার বার্তা দেয়।

তথ্যসূত্র-

১. বাংলার বিচিত্র দেবদেবী, লেখক মৃগাঙ্ক চক্রবর্তী

২. গোসানী মঙ্গল- রাধা কৃষ্ণ দাস বৈরাগী

৩. উত্তরবঙ্গের ময়নাগুড়ি অঞ্চলে লেখিকার সরাসরি ভ্রমণ অভিজ্ঞতা

পায়েল চট্টোপাধ্যায়; আকাশবাণী কলকাতার সম্প্রচার আধিকারিক। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে প্রথম বই, নিবন্ধন সংকলন - রাজবাড়ীর ইতিকথা।

পুজোর দিনে

স্মৃতিকথা

শোভন সেনগুপ্ত

ভোর সাড়ে তিনটেয় অ্যালার্মটা বেজে উঠতো । সেই গভীর সুষুপ্তির মাঝেও টের পেতাম মা উঠে বসেছেন । এর দুমিনিট পরেই বোধহয় দরজায় একটা টোকা পড়তো ।

"তাপসী , তাপসী "

মেজ জ্যাঠি ডাকতে এসেছেন ।

মা সাড়া দিলেন । খাট থেকে নেমে স্নান করতে গেলেন , স্নান করে এসে ইনহেলার নিলেন, গরদের কাপড় পড়লেন , নেমে গেলেন নিচে , পুজোর কাজ শুরু হবে এবার ।

এর একঘন্টা বাদে আবার দরজায় টোকা - "রণি রণি , জ্যাঠামণির স্নান হয়ে গেছে । বাথরুম ফাঁকা হয়েছে ।"

আবার মেজ জ্যাঠি ।

এবার আমার পালা । আমি যে মন্ডপী । মন্ডপের কাজ করি , মার পুজোর যোগানদার । ধড়মড় করে উঠে স্নান সেরে , প্রাত্যহিক পুজো সেরে ছোট্ট একটা বাটি নিয়ে চলে গেছি বাড়ির পিছনের রাস্তায় ।

শরৎের প্রথম সকাল , আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে ধীরে ধীরে । সারারাত গান বাজিয়ে বিদ্রোহী ক্লাবের প্যান্ডাল ঘুমিয়ে পড়েছে । ঘাসের আগায় আমি শিশিরের জল খুঁজতে বেড়িয়েছি । মাদুর্গা শিশির জলে স্নান করবেন ! কচুর পাতায় এক খন্ড হিরের মত জ্বলজ্বলে শিশিরের কণা ভরে নিয়ে বাড়ি ফিরতাম ।

সবাই তখনো ঘুমোচ্ছে । পথ ঘাট নিস্তব্ধ । ভোরের হাওয়ায় তখন শিউলির গন্ধ মাখা আবেশ। চারিদিক নিস্তব্ধ । কিন্তু নিঃশব্দের মধ্যেও সুর শুনতে পেতাম । সেটা শারদ প্রাতের সুর, মার পুজো দেখতে মর্ত্যে নেমে আসা দেবদেবীদের মাতৃ আরাধনার সুর । মন্দ্র গম্ভীর অলৌকিক অপার্থিব সেই সুর ।

বাড়ি এসে দেখি ঠাকুরঘরে ফল কাটার শব্দ , জ্যাঠামণি প্রাত্যহিক পুজো শেষ করে আসন পেতে বসছেন । বাবার স্নান সারা , মন্ডপে নেমে এসেছেন পট্ট বস্ত্র পড়ে । মন্ডপে দাদা সাজিয়ে রাখছেন মার স্নানের সামগ্রী , আমাকে দেখে বললেন - "এবার চানের জল গরম করো । "

এই চানের জল মায়ের চানের জল । মাদুর্গা স্নান করবেন উষ্ণ জলে, তার মন্ত্র আছে । জল গরম হবে মাটি কলসে । সেই কলস বসানো হবে ধুনুচির মধ্যে নারকেলি ছোবার ফাঁকে । তারপর জল গরম হয়ে ফুটে উঠলে , দুটি মোটা কাঠি দিয়ে সাড়াশির মত নামিয়ে নাও । ফুটন্ত জল একটু জুড়োতে দাও । যতক্ষণে মার স্নান শুরু হবে সেই জল উষ্ণ হয়ে থাকবে । তাই তো ! এখন তো সকালবেলায় হাল্কা ঠান্ডার আমেজ । বাড়িতে এই সময় মা তো গরম জলেই চান করতে বলেন । তাই বিশ্বমায়ীর চানেও হাল্কা গরমজলের আয়োজন । ছোটবেলার নবীন মনের বিস্ময় ও আনন্দটা এখনো ছুঁতে পারি ।

এরপর আখ থেকে আখের রস বার করতাম, নারকেল থেকে নারকেলের জল বার করতাম , দুধ দই মধু , সোনা রুপো মুক্ত সব সাজিয়ে রাখতাম , এদের সবার জলে মা স্নান করবেন ।

এমনি করে রোজ , পুজোর প্রত্যেক দিনের সকাল পার হত । যত বেলা বাড়ছে তত অতিথি অভ্যাগতের ভীড় , আত্মীয় স্বজনের হইহই । পুজোর আনন্দ সাগরে বান ডাকতো তখন ।

সারাদিনের সারাবেলার কাজে অকাজে , খেলাধুলায় , গল্পে গানে আড্ডায় , হাসির হুল্লোড়ে , কখনো বা চলে যাওয়া মানুষের স্মৃতিচারণের ছলছলে চোখে , পুজোর দিন পার হত । সমস্ত দিন অব্যক্ত আনন্দের সুরে বাঁধা দিন ।

সন্ধ্যায় আরতির পর সবাই মিলে বসে গান করতাম আমরা । মাকে গান শোনাতাম সবাই ।

এখনো কি মন রবে অচেতন ; ওই শোনো মায়ের বাজনা বাজিছে .... পরিব্রাজক স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দের রচিত গান ।

গানের ওই যেখানে আছে .." মায়ের মত মা কভু দেখি নাই , মা বলে ডাকিলে অমনি সারা পাই " - কতবার বাবা , জ্যাঠামণিকে কাঁদতে দেখেছি এই লাইনে এসে । ওরা ছোট্টবেলায় জন্মদাত্রী মা কে হারিয়েছিলেন । কিন্তু কোনদিন বোধে , আশ্বাসে , অনুভবে , মাতৃহারা হননি ।

গানের পর্ব মিটেছে যখন, তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছে ; কোনদিন হয়ত সোনামা বললেন কর্প্পুর ফুরিয়েছে যা নিয়ে আয় ।বাড়ির পিছন দিকের নির্জন আগাছা ভরা ফাঁকা রাস্তা ধরে দশকর্মের দোকান থেকে যখন ফিরছি তখন দেখি ছাতিমের গন্ধে সমস্ত পাড়া ভরে আছে ।

ওই ছাতিমের গন্ধ ভরা নির্জন সন্ধ্যায় আমি আজও পথ হারাই ।

সময় থেমে থাকে না । বাবা , জ্যাঠামণি , দাদা , ঠাকুমা , কত লোকজন যারা সেদিনের দুর্গাপূজোয় আলো জ্বালাতেন , তারা এখন অমৃতলোকের প্রদীপ হয়ে জ্বলেন । ওদের দেখানো আলোয় আমরা পথ হাটি , সলতে পাকাই , মায়ের মন্দিরে বসে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখি ।

আনন্দময়ীর অঙ্গনের আলো কখনো নেভে না । সে অনন্তের অম্লান শিখায় আঁধার মুছে সোনার হাসি হেসে যায় ।

জয় মা দুর্গা ।

শোভন সেনগুপ্ত : জন্ম : কলকাতা,পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ,বর্তমানে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে, চিফ ফ্যাকাল্টি রূপে কর্মরত। নেশা : বই, গান

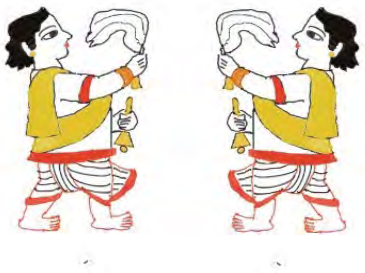

ল্যাভেন্ডার মুন

গল্প

নুপুর রায়চৌধুরী

ছবি: আন্তর্জাল

প্রতি সপ্তাহে তিনবার করে গভীর রাতের বাসটা নিউ মুন ক্যাফের সামনে এসে দাঁড়ায় । হাই তুলতে তুলতে যাত্রীরা সব বাস থেকে নিচে নামে । একে একে সকলে ক্যাফের ভিতরে প্রবেশ করে আর ক্যাফের দরজার গায়ে লাগানো ঘণ্টাটা টিংটিং শব্দে বাজে ।

এইটাই ল্যাভেন্ডার মুনের সারা দিনের ব্যস্ততম সময়। শীতকালে যাত্রীরা মিনেস্ত্রনে স্যুপ, আর গরমাগরম কফি চায়; গরমকালে তাদের পছন্দ চেরি-পাই আর ঠান্ডা ঠান্ডা ফলের রস ।এই সারাটা সময় মুন তাড়াহুড়া, ছুটাছুটি করে, তার ক্যাশ বাক্সে পয়সা ঝমঝম করে ।

ঠিক সাড়ে দশটার সময় ড্রাইভার টোবি লেমলি হাঁক পাড়ে, ''সময় হয়ে গেছে'' । যাত্রীরা সব হেলতে দুলতে, ক্যাফের টেবিল ছেড়ে বেরিয়ে আসে, দরজার ঘন্টিও আবার তখন টিংটিং করে ওঠে ।মুন উঁকি মেরে দেখে, বাসটা কেমন গর্জন করতে করতে চলে যায়, বাসের আলো আস্তে আস্তে ফিকে হতে হতে শেষমেশ দূরের কোন গ্রামের অন্ধকারের গহ্বরে হারিয়ে যায় ।

বিশ বছর কত না লম্বা সময়, চেরি-পাই কাটতে কাটতে আর স্যান্ডউইচ সেঁকতে সেঁকতেই কেটে গেল--- দরজায় ''বন্ধ'' সাইন ঝোলাতে ঝোলাতে আনমনে ভাবে মুন ।

পরের বার বাসটা যখন আবার আসল, ড্রাইভার টোবি'র কাপে কফি ঢালতে ঢালতে মুন বলল, মিস্টার লেমলি, আমি স্থির করেছি, তোমার বাসে চড়ে দেখতে যাব এই বাস-রাস্তা কোথায় শেষ হয়েছে ।

টোবি বলে, আরে মুন, তুমি শোনোনি-- এই বাস তো আর চলবে না । আমারও তো বয়স হলো, এবার একটা জায়গা দেখে থিতু হতে হবে, টোবির কণ্ঠ কেমন শ্লথ শোনায় ।

সে কি, কী বলছো তুমি - চিৎকার করে বলে ওঠে মুন ।

মুনের এবার খুব ভয় করতে লাগল, তার হাতের সুপ্ আর পাই খেতে যাত্রীরা আর আসবে না, রাতের বাসে চড়ার সুযোগ আর মিলবে না, বাস-রাস্তাটা যে শেষমেশ কোথায় চলে গেছে, তাও আর কোনোদিন জানা যাবে না, সে যে বড্ডো দেরি করে ফেলেছে ।

নাহ, আমি আর পাইয়ের ছাঁচ তৈরি করা আর এঁটো কাটা চামচ ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারছি না, সেই একই সুপ-চামচ, টেবিল-ক্লথ আর ভালো লাগছে না ---ক্যাশ কাউন্টারের দিকে আসতে আসতে মুনের মাথায় কী এক চিন্তা খেলে গেল । ক্যাফের

দরজায় ''বন্ধ'' সাইন ঝুলিয়ে দিতে দিতে তার মনটা খুশি হয়ে গেল, আর অজান্তেই একটা হাসিও এসে গেল ঠোঁটের কোণে ।

তারপর এমন কিছু একটা ঘটে গেল, যা আগে কক্ষনও ঘটেনি।

গভীর রাতের বাস সেদিন ভোর ভোর ক্যাফের দরজায় এসে থামল । কোন যাত্রী বাইরে নেমে এল না, এল শুধু টোবি লেমলি। সে বাসের চাবিটা মুনের হাতে তুলে দিয়ে বলল, মুন তোমার যাত্রা শুভ হোক । মুনও টোবির হাতে ক্যাফের চাবি দিতে দিতে বলে, মিস্টার লেমলি,আমি আশা করি তুমি এখানে খুশিই থাকবে। টোবি সম্মতি জানিয়ে বলে, ওহ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমি তো এখানে একটি হার্ডওয়্যারের দোকান খুলব, ঠিক করেছি। কত দিন ধরে যে এই স্বপ্নটা আমি দেখেছি!
মুন চারটে ধাপ বেয়ে বাসে উঠল, গাড়ির ইঞ্জিনও গর্জন করে চলা শুরু করল। সেই বাস-রাস্তাটা ধরে মুন অজানা দেশের দিকে রওনা দিল ।

কখনো সবুজ পাহাড় আর কর্মরত কৃষকদের পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যায় মুন। কখনো বা ঝকঝকে নদী'র ঢেউ পার করে, নৌকার মাঝিদের কাছে অপরিচিত শহরে লম্বা আইসক্রিম সানডে কেনে মুন। কখনো বা ব্যান্ড-এর বাজনার সাথে সাথে ঘাসের উপর সে নেচে চলে। উষ্ণ গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় রঙিন আলপনা আঁকা ঘোড়ার পিঠে চড়ে দুলে দুলে গোল হয়ে চরকি কেটে চলে মুন । আকাশে তখন আতশবাজি ফুটছে ।

কখনো কখনো বাসটা চালিয়ে মুন একটা চকচকে লেকের পাশে এসে থামে, সেখানে ডাইভিং প্ল্যাটফর্ম থেকে ঝপাৎ করে আচমকা লেকের জলে ঝাঁপ দিয়ে ছোট ছোট মাছগুলোকে ভয় পাইয়ে দেয় সে, তারা সব খলবল খলবল করে গভীর জলে সেঁধিয়ে যায় । মুনের একটা কুমির আকৃতির ফ্লোট আছে, সেটার উপর সটান উপুড় হয়ে শুয়ে পা আর হাত দিয়ে দাঁড় বাওয়ার মতো জল কেটে কেটে ঘুরে বেড়ায় সে । আর তখনই কেমন তার মনে হয়, না জানি এমন আরও কত কত জায়গা আছে, কিন্তু সে তো এখনো এই রাস্তার শেষটাতেই পৌঁছুতে পারল না । সুতরাং আবার চলা । চলতে চলতে মরুভূমিতে এসে তার মনে হলো এই জায়গাটা ভারী শান্তিপূর্ণ। মুন সেখানে গুহায় গুহায় খোঁড়াখুঁড়ি করে ডাইনোসরের হাড় খুঁজে বেড়াল । তারপর গরম বাতাস-ভরা একটা বেলুনে চড়ে আকাশে খানিক ভেসে বেড়াল। তারপর অবশেষে, সে তার বাসে ফিরে আসল ।

মুন ভাবে, আমি তো জানি না আমি কোথায় যাচ্ছি, কিন্তু সেখানে গেলে নিশ্চয়ই আমি জানতে পারব। এরপর পাহাড়ে গিয়ে মুন ভেলায় চেপে, পাহাড়ি ঝোড়া বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামল। পাহাড়ি ছাগলের সাথে সাথে পাহাড়চূড়োয় আরোহণের জন্য সে নতুন বুটজুতো পড়ল । এইসবে তার এত মজা লাগছিল যে সে তার বাসের কথা প্রায় ভুলেই যাচ্ছিল । কিন্তু তখুনি তার মনে পড়ে গেল, এখনও সে তার যাত্রার শেষ পর্যন্ত পৌঁছায়নি ।

এক বিকেলে যখন সে তার ক্যাফে থেকে অনেক অনেক দূরে, তখন মুন সাগরে এসে পৌঁছাল । সেখানে সে উষ্ণ বালির উপর খালি পায়ে হাঁটল এবং ঢেউয়ের মাথার ওপরে একটি ঘুড়ি ওড়াল ।

হঠাৎ তার মনে হলো, এই বুঝি আমার রাস্তার শেষ। এটাই আমার জায়গা । মুন সেখানে একটি বাড়ি কিনল যেখানে গ্রাম এবং বালিয়াড়ি এসে মিশে গেছে । বাড়িটার চূড়োয় জাহাজের মত দেখতে একটা বায়ুনির্দেশক আছে, আর রান্নাঘরের মেঝেময় বালি। মুন দেখে, একটি চর্মসার বিড়াল বারান্দার নীচে লুকিয়ে আছে । মুন তাকে বলে, আমি বাড়িতে পৌঁছে গেছি আর এই বাড়ি আমরা দুজনে ভাগ করে নেব। তোমাকে আমি এখন থেকে ফিশহুইস্কার বলে ডাকব ।

টোবি'র কাছে একদিন একটা পোস্টকার্ড এল। সে ডাকহরকরাকে বলল, আমার বন্ধু মুন সমুদ্রের ধারে খুশিতে আছে, কিন্তু আমি এখানেই খুশি, এটা আমার জন্য ঠিক জায়গা।

টোবি একটু বাদে সমুদ্র সম্পর্কে সব ভুলে যায় এবং নিজের যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক করে।

ওদিকে মুন ছবি আঁকা শুরু করে। শিশুদের জল ছেটানোর এবং কুকুরের খেলার ছবি আঁকে সে । মুন একটি সার্ফ বোর্ড কিনেছে। যখনই ভালো ঢেউ থাকে, তখনই উজ্জ্বল স্নান-পোশাক পড়ে সে তীরের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সমস্ত গ্রীষ্ম সে দারুণ খুশি থাকে । গ্রীষ্ম শেষ হলে, তখন আর সাগরপাড়ে আঁকা যায় না, সব জিনিসপত্র এক্কেবারে ভিজে যায় এবং সার্ফ করার জন্য সমুদ্দুরকে খুব রুক্ষ মনে হয় । মুন লক্ষ্য করে যে তার বাড়িটা কত্ত শান্ত। বাতাস সেখানে একাকী শব্দ করে। মুনের মনে পড়ে যায়, তার হাতের স্যুপ এবং পাই মানুষজনেরা কত না পছন্দ করত । তারা বলত মুন, তোমার মতো কেউ রান্না করতে পারে না।

অথচ এখন তার নিজের জন্য রান্না করারও কেউ নেই।

আচ্ছা, আমি কি আবার ফিরে যেতে পারি না? সে মনে মনে ভাবে,

পরক্ষণেই তার মনে পড়ে----নাহ, আমার ক্যাফে তো এখন একটা হার্ডওয়্যারের দোকান।

যখন বৃষ্টি পড়ে এবং বাদল-হাওয়া তার চেয়ারকে দোলা দেয়, মুন তখন নতুন এক পরিকল্পনার কথা ভাবে।

মুন ছুতোর ফরেস্ট সিডার'কে ডাকে, সেও অমনি সঙ্গে সঙ্গে এসে তার কাজ শুরু করে দেয়। শীঘ্রই ফরেস্ট গভীর রাতের বাস থেকে সব সিটগুলো একটা একটা করে বের করে নেয়, তারপর সেগুলো দিয়ে সে কাউন্টার এবং টেবিল তৈরি করে । কাজ করতে করতে ফরেস্ট প্রায়ই শিস দিয়ে গান করে । আর ওদিকে মুন তখন ন্যাপকিন ভাঁজ করে, ছুরি, কাঁটা-চামচ গুনেগেঁথে রাখে, বাসের দেয়ালে পেইন্টিং ঝুলিয়ে রাখে।

এখন মুন কিছু কিছু দিন ছবি আঁকে। অন্য দিন, ঢেউ ঠিকঠাক থাকলে সে তার সার্ফবোর্ড নিয়ে সমুদ্র সৈকতে চলে যায়। বাকি সব দিন, মুন তার চলমান বাস-ক্যাফেকে সুমুদ্দুরের উপকূল বরাবর চালিয়ে নিয়ে যায় । চলতে চলতে যে জায়গার দৃশ্য সবচেয়ে ভালো লাগে, সেখানেই সে তার বাস থামায় । তারপর সে লোকেদের ক্ল্যাম চাউডার, ভাজা মাছ, ঝিনুক, চিপস এবং ঠান্ডা ঠান্ডা সোডা পপ পরিবেশন করে। সবাই বলে, মুন, তোমার মতো সামুদ্রিক খাবার কেউ রান্না করতে পারে না । আরেকবার করে চায় তারা ঐসব খাবার এবং কখনও কখনও তারা মুনের আঁকা একটা পেইন্টিংও কিনে নেয় । ক্যাশ বাক্স

ঝমঝম করে, মুন আবার ছোটাছুটি, তাড়াহুড়ো করে। ওদিকে ফিশ হুইস্কারও বেশ নাদুসনুদুস হয়ে উঠেছে এবং সে প্রায়ই ভালো ভালো মাছের স্বপ্ন দেখে ।

***ট্রুন হ্যারিসনের লেখা Lavender Moon বই থেকে অনূদিত ।

(This is a translation of Eugenie Fernandes and Troon Harrison's story 'Lavender Moon. ' It is such a beautiful story that I couldn't resist the temptation to translate it and share it with other readers.)

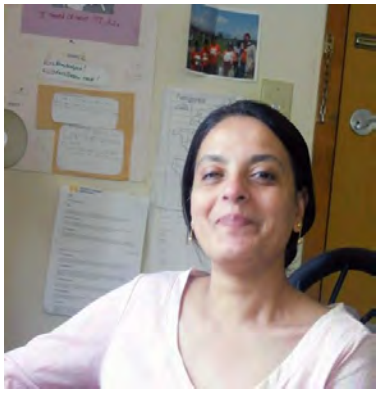

নুপুর রায়চৌধুরী, জন্ম, পড়াশুনো দেশে । বোস ইনস্টিটিউট থেকে ডক্টরেট করে বিশ্বভারতীতে শিক্ষকতা করেছেন। লেখালিখির নেশা . মিশিগানের বাসিন্দা ।

অহেতুক

গল্প

গান্ধর্বিকা ভট্টাচার্য

সকাল থেকে তীব্র গুলি গোলার শব্দে যুদ্ধক্ষেত্র কেঁপে কেঁপে উঠছে। যখন তখন এদিক ওদিক থেকে অতর্কিতে ছুটে আসছে প্রাণঘাতী মিসাইল।

"সৌরাংশু!"

"হুঁঃ! সেকেলে নাম। নিউমারলজি অনুযায়ী শতানীক বেটার!"

"ছ্যাঃ, এ তো আরো সেকেলে! কোন আদ্দিকালের মহাভারতের নাম!"

"আমি বলছি, রোহিত রাখ।"

"মোস্ট কমন!"

"কাম্মা, ওর নাম সোহাম রাখ। আমার বেস্ট ফ্রেণ্ডের নাম।"

এ ক'দিনের মধ্যেই বাড়ির কি চেহারা হয়েছে! মা-ছেলের মধ্যে প্রায় হাতাহাতি চলছে, দাদু-নাতনি পরস্পরকে শত্রু মনে করছে, স্বামী-স্ত্রীর মুখ দেখাদেখি বন্ধ। সকলেরই ইচ্ছে, তার পছন্দের নামটাই যেন মনোনীত করা হয়। তাহলেই যেন বাচ্চার ওপর তার একাংশের মালিকানা জন্মাবে। যেন বড়লোকের চাঁদে জমি কিনে অধিকার স্থাপনের চেষ্টা। আর সমস্ত হ্যাপাটা গিয়ে পড়েছে বেচারা মহিমার ওপর। আফটার অল সে-ই ফ্রেশলি ম্যানুফ্যাকচার্ড বেবির জন্মদাত্রী বলে কথা। আলটিমেট ভিটো পাওয়ার তাই তারই হাতে রয়েছে।

এ'কদিনে মহিমা আরো লক্ষ্য করেছে। যুদ্ধকলার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোকজনের কূটবুদ্ধিও কম নয়। তাই দাবি দাবার ফাঁকে ফাঁকে সমানতালে চলছে টুকটাক উৎকোচ। সেদিন শাশুড়ী হঠাৎ এক গ্লাস ফলের রস নিয়ে হাজির।

"এটা খেয়ে নাও। ভিটামিন সি আছে। এই সীজনে খুব সর্দিকাশি হচ্ছে। নিজের দিকে তো তাকানোর সময় পাও না, না ঘুমিয়ে কি চেহারা হয়েছে!"

মহিমা অবাক চোখে শাশুড়ীর এই নব কলেবরের দিকে তাকিয়ে থাকে। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটাতে গিয়ে হোঁচট খায়।

"থ্যাংক ইউ।"

একটু ইতস্তত করে বৃন্দাদেবী বউমার কাছ ঘেঁষে বসে পড়লেন।

"বাচ্চার নাম কি দেবে কিছু ডিসাইড করলে? এক মাস তো হয়ে এল, এবার কর্পোরেশনে জানাতে হবে।"

তাহলে এই মতলব...

মহিমার চোখ নিমেষে সন্দেহে ছোট হয়ে গেল।

"এখনো কিছু ফাইনাল হয়নি।"

বৃন্দাদেবীও গলা খাদে নামিয়ে আনেন।

"খুব কমন নাম দিও না, কেমন? তোমার বড়জা-কেও বলেছিলাম। কিন্তু মেয়ের নাম রাখল *অনন্যা*। সেই আমাদের সময় থেকে বাড়ি বাড়ি মেয়েদের নাম অনন্যা হচ্ছে। এর মধ্যে আর 'অনন্য' কিছু নেই এখন!"

"...আই গেস।"

মহিমা কাষ্ঠ হাসি দিয়ে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু শ্বশ্রুমাতার ইঙ্গিত পরিষ্কার। অপ্রচলিত, রীতিমতো অদ্ভুত সব নাম খুঁজে বের করার কৃতিত্ব এ বাড়িতে আছে একমাত্র বৃন্দার (অথচ নিজের ছেলেদের বেলায় নাম রেখেছেন অনির্বাণ আর অয়ন)। মহিমার ভাসুরঝির বেলায় 'অসন্ধিমিত্রা' প্রায় ফাইনাল করে ফেলেছিলেন। তুতুদি কান্নাকাটি করে অনশনে বসে আর কি। তারপর দাদা শেষ মূহুর্তে পালটি খেয়ে কর্পোরেশন অফিসে লোকচক্ষের অগোচরে টুক করে 'অনন্যা' লিখে আসায় সে যাত্রা তুতুদির প্রাণ বাঁচল। কিন্তু বৃন্দাদেবী এই বিশ্বাসঘাতকতা মেনে নিতে পারলেন না। প্রতিশোধের আগুন বুকে নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছেন গত পাঁচ বছর ধরে। অবশেষে ঠাকুর মুখ তুলে চেয়েছেন। নাতির নামকরণ করে পূর্ব গ্লানি ঝেরে ফেলার এমন সুযোগ আর আসবে না। মহিমা কানাঘুষো শুনতে পাচ্ছে, শাশুড়ী ঘোষণা করেছেন, তাঁর পছন্দমতো নাম রাখলে এক পিস সোনার চেন পুরস্কার দেওয়া হবে।

মহিমা ঝুঁকে পড়ে ছেলের সঙ্গে খেলা করে, যেন শাশুড়ীর কথা ভুলেই গেছে। বৃন্দাদেবী কিছুক্ষণ আশায় আশায় বসে থেকে তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে পড়তে বাধ্য হলেন। সে যাত্রা রক্ষা পাওয়া গেল।

মহিমার শ্বশুরমশাই, অর্থাৎ স্বপনবাবুর অ্যাজেন্ডা আবার একটু আলাদা। আগের বার বাড়িতে প্রথম সন্তান এসেছে, তার ওপর কন্যাসন্তান। 'মেয়েদের নামের আবার তুমি কি বোঝ? অত মেয়েছেলের নাম ঘাঁটতে হবে না' বলে তাঁকে সম্পূর্ণ সাইডলাইন করে দেওয়া হয়েছিল। মিষ্টভাষী মানুষটি সামনে প্রতিবাদ করতে পারেননি, কিন্তু মনে মনে সংকল্প দৃঢ় হয়েছে পাঁচ বছর ধরে। এবার নাতি হতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। যাকে বলে সাইকোলজিকাল ওয়ারফেয়ার, বা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। এখানে ওখানে লুকিয়ে বসে থাকেন, আর মহিমাকে দেখতে পেলেই গেরিলা স্টাইলে আবেদনপত্র নিয়ে চলে আসেন। ঠোঁটের আগায় লেগে থাকে স্মিত নিয়তির হাসি।

“আর কতদিন আছি কে জানে? অ্যাট লীস্ট যদি নাতিটার নাম রেখে যেতে পারতাম...”

“ওমা, কতদিন আছ আবার কি? তোমার বয়স তো মোটে একষট্টি। এখন অনেকদিন আছ।”

স্বপনবাবু অর্ধনিমীলিত চক্ষে হাসতে থাকেন।

“মা আমার নাম দিতে চেয়েছিল ধ্রুবজ্যোতি। কিন্তু বাবা রাখতে দেয়নি...”

“ধ্রুবজ্যোতি? চমৎকার নাম। ছেলেদের কারুর নাম দিলে না কেন?”

মেসির দক্ষতায় ড্রিবল করে বেরিয়ে এল মহিমা। মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ না করে পারল না। কিন্তু পরক্ষণেই...

“তোমার মা রাখতে দিল না। জান তো কিরকম মেজাজ। তার কথার ওপর কেউ কথা বলতে পারবে না। আমার কথা আর এ-বাড়িতে কবে শোনা হয়?”

কথার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সামান্য গলা কাঁপান স্বপনবাবু।

“কি? কি হচ্ছে ওখানে?” বৃন্দাদেবী ভুরু কুঁচকে ছুটে আসেন। “আবার চা চাইছ নাকি? ডাক্তার ক্যাফিন খেতে বারণ করেছে সে কথা কানে যাচ্ছে না?”

“না, চা খেতে আসিনি আমি।”

“ফালতু মিথ্যে কথা বলবে না। চা চাইছিল না, মহিমা? সত্যি করে বলবে।”

“ওকে কেন কথার মধ্যে টানছ? আমি তো বলছি চায়ের জন্যে আসিনি...”

স্বামী-স্ত্রীর বাকবিতণ্ডার সুযোগ নিয়ে মহিমা সেখান থেকে কেটে পড়েছিল। তারপর কাজের লোকের মৃদু গুঞ্জন (“ছোটবউদি, সঞ্জয় নাম রাখ”) নস্যাৎ করতে বেশী সময় লাগেনি। কিন্তু যখন তুতুদি পর্যন্ত বেবির নখ কাটতে কাটতে

আহ্লাদী স্বরে বলেছিল, "ছেলে হলে ভেবেছিলাম নাম রাখব অপ্রতিম," সেদিন মহিমা বুঝেছিল বিপদ চরমসীমা অতিক্রম করতে চলেছে।

ওঃ, সব থেকে বড় বিপদের কথা তো বলাই হয়নি। সে হল অয়ন নামক আপদের কথা। পৃথিবীর যত উদ্ভট নাম, যা যথেষ্ট কারণেই কেউ রাখে না, সেগুলো খুঁজে বের করে এনে মহিমার পায়ে উজাড় করে ঢেলে দেওয়াই ওর একমাত্র কাজ।

"অজাতশত্রু নামটা কেমন হবে?" বলে কখনো অজাতশ্মশ্রু বালকের আনন্দে তাকিয়ে থাকে। কোনদিন আবার "দিগম্বর নামটা বেশ হেবি না? বেশ একটা পাওয়ারফুল ব্যাপার আছে," বলতে বলতে কোমরের তোয়ালেটা ফস্কে যাওয়া থেকে আটকায়। একদিন আবার কি খেয়াল হল, দাড়ি কাটতে কাটতে বলে উঠল, "কুম্ভ নামটা কেমন গো মৌ? রাজকাহিনীতে পড়েছিলাম না, রাণা কুম্ভ?"

রাগে মহিমার গা রি রি করে। অয়ন যদি একটু স্বাভাবিক হত, বাচ্চার একটা ঠিকঠাক নাম দিত তাহলে মহিমাকে পুরো শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে ফিল্ডিং করে বেড়াতে হত না। যত্তসব!

তা এখনো পর্যন্ত এই ছিল কার্গিল যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। পরিবেশ যতই উত্তপ্ত হোক, তা গৃহবিবাদ অবধিই সীমিত ছিল। কিন্তু আজ যুদ্ধক্ষেত্রে নতুন সেনানীর প্রবেশ ঘটতে চলেছে। মহিমার মা-বাবা ক্যালিফোর্নিয়ায় দিদির বাড়িতে হলিডে সেরে গতকালই ফিরেছেন, এবং আজ প্রথমবার নাতির মুখ দেখতে আসছেন। সঙ্গে যে নামের নতুন ফিরিস্তি আসছে তা বলাই বাহুল্য। সমবেত যুযুৎসবদের হাত থেকে নিজেকে কি করে বাঁচাবে সেই চিন্তাতেই মহিমার রাত কেটে গেছে।

শ্বশুরকুলের সকলে কিন্তু আমেরিকা ফেরত বেয়াই বেয়ানের খাতির যত্নের ব্যবস্থায় লেগে গেছে। ফিনাইল দিয়ে ঘর মোছানো হয়েছে, অয়ন কাচা পর্দা টাঙিয়েছে, স্বপনবাবু ভালো নিরামিষ খাবার আনিয়ে রেখেছেন, বৃন্দাদেবী ম্যাক্সি ছেড়ে ধোপদুরস্ত সালোয়ার কামিজ পড়েছেন। চারিদিকে বেশ একটা উৎসবের আমেজ।

ঠিক সন্ধে সাতটায় কলিং বেল বেজে উঠল। মহিমার বাবা মিলিটারিতে ছিলেন না কোনদিন, কিন্তু আজীবন অকারণে মিলিটারি নিয়ম পালন করে চলেছেন। বলাই বাহুল্য, বাড়ির সবার জীবন অতিষ্ঠ করে।

"হ্যালো, হ্যালো, ওয়ের ইজ মাই গ্র্যান্ডসন?"

বাবার বাজখাঁই গলা শুনে মহিমার হাত কেঁপে চা চলকে গেল। সদ্য ঘুম ভাঙা বেবি তারস্বরে কেঁদে উঠল। প্রণববাবু আর রেণুকাদেবী সেই শব্দভেদী অনুসরণ করে মহিমার ঘরে ঢুকে এলেন। তারপর শুরু হল রাম-ভরতের মিলন, অর্থাৎ বেবির সঙ্গে তার মাতৃকুলের সাক্ষাৎকার। রেণুকাদেবী বাচ্চা সামলাতে এক্সপার্ট। ভীষণ থেকে ভীষণতর কাঁদুনে কার্তিকরাও তাঁর কোলে গিয়ে স্লিপিং বিউটি হয়ে গেছে, তা এই বেবি তো চুনোপুঁটি।

ফাঁকে ফাঁকে তিনি মহিমার খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

"শাশুড়ী দেখভাল করছে? টাইমে খানা খাচ্ছিস? আমি বাদাম সরবত করে এনেছি, এখানে লুকিয়ে রাখ। রোজ খাবি। আর কাউকে দিবি না। অয়নকেও না।"

"হি লুকস জাস্ট লাইক মি," প্রণববাবু সপ্রশংস চোখে নাতির দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বেয়াই বেয়ানকে মেয়ের সঙ্গে যথেষ্ট সময় প্রাইভেসি দেওয়ার পর মহিমার শ্বশুর শাশুড়ী ইতি উতি উঁকি মারতে থাকেন।

"আরে, মিস্টার চৌধুরী," প্রণববাবু হাসি মুখে এগিয়ে যান, "কাম কাম। কেমন আছেন?"

"আর আমার থাকা আর না থাকা," স্বপনবাবু বিরস হেসে ঘরে ঢোকেন, "ডাইবেটিস বাঁচা মরা এক করে দিয়েছে।"

বিছানায় সাজানো বিদেশী চকলেটের দিকে তাকিয়েই কথাটা বলেন আর কি।
বৃন্দাদেবী টেবিলের ওপর খাবারের প্লেট সাজিয়ে দেন।
"আসুন, নাতি হয়েছে একটু মিষ্টিমুখ করুন। একদম পিওর ভেজ দোকান থেকে আনিয়েছি।"
অয়ন, দাদা, তুতুদি সবাই এক এক করে ঢুকে আসে। মহিমা মনে মনে কাউন্টডাউন শুরু করে দিয়েছে। অনতিকাল পরেই মোক্ষম বোমাটা ছাড়া হবে। সোরাব রুস্তমের যুদ্ধে কোন পক্ষ আগে আক্রমণ করে সেটাই শুধু দেখার।
চার...তিন...দুই...এক...
"তা, বেবির কি নাম হোবে কিছু ডিসাইড করলেন?" প্রণববাবুই চায়ে চুমুক দিতে দিতে অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন।
"নাম...মানে..."
দীর্ঘদিন গৃহযুদ্ধে রত পরিবার বিপক্ষ সেনার সামনে যৌথ ফ্রন্ট রাখতে সমর্থ হল না। প্রণববাবুর প্রশ্নের উত্তরে এ ওর মুখ চাওয়া চায়ি করতে লাগল। প্রণববাবু এবার একেবারে সোজা ট্যাংকার চালিয়ে দিলেন।
"আমরা পণ্ডিতজীকে কনসাল্ট করেছি। বেবির নাম 'হ' সে শুরু হোবে। 'হ' ইজ লাকি ফর হিম।"
"হ...হ...হ..."
তিনবার 'হ' এ ঠোক্কর খেয়ে স্বপনবাবুর স্বপ্ন চূর্ণ হওয়ার উপক্রম হল। চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো তিনি সোফার এক কোণায় সেঁধিয়ে গেলেন – হতাশ ও হতবাক।
"আমি ভাবছিলাম হ সে হেমন্ত কেমন হোবে?" চূর্ণিত স্বপ্নের ওপর ট্যাংকার তার জয়যাত্রা চালাতে থাকে। "আপনাদের সুপারস্টারের নাম, হেমন্তকুমার? হেঃ হেঃ হেঃ!"
বৃন্দাদেবীর নাক কুঁচকে উঠেছে, কিন্তু শর্ট নোটিসে 'হ' দিয়ে কোন চলনসই নাম ভেবেও উঠতে পারছেন না। অয়নের মুখে এক চিলতে হাসি। নির্ঘাত হিরণ্যাক্ষ বা হিরণ্যকশিপু টাইপের কিছু একটা ওর মাথায় এসেছে।
"নিউমারলজি অনুযায়ী শতানীক নামটা লাকি হচ্ছে," গলা খাঁকারি দিয়ে বৃন্দাদেবী স্বমত প্রতিষ্ঠায় লেগে পড়েন।
"ওসব ওয়েস্টার্ন জিনিস ফালতু আছে," রেণুকাদেবী পালটা পেটো মারেন। "আমাদের শাস্ত্র একদম সায়েন্টিফিক। আজ আমরা মানছি কাল দুনিয়া বলবে।"
রেণুকাদেবীর শাস্ত্রের সামনে বৃন্দাদেবীর নিউমারলজির বাণ দু খণ্ড হয়ে কেটে পড়ে গেল। তিনি নতুন করে ধনুকে জ্যা বাঁধলেন।
"ঠিক আছে, আপনারা নামকরণের সময়ে 'হ' দিয়ে নাম রাখুন। ওটাই বেবির রিলিজিয়াস নাম হবে। অফিসিয়াল নামটা আমরা রাখছি।"
রেণুকাদেবী সহজেই বাণ হজম করে নিজের জায়গায় অটল রইলেন।
"অফিসিয়াল নাম হী তো পুরো লাইফ ইউজ করবে। ইট মাস্ট বি লাকি ফর হিম!"
"শুনুন," স্বপনবাবু মিহি গলায় একটা টিনের তলোয়ার তুলে ধরেন, "আমাদের কমিউনিটিতে হেমন্ত নামটা এখন আর চলে না। সেকেলে হয়ে গেছে।"
"নো প্রবলেম," প্রণববাবু অমায়িক হেসে শান্তি প্রস্তাব দেন, "অন্য নাম রাখুন। হ সে হরিশ আছে, হ সে হার্দিক আছে, হ সে হেরম্ব আছে – হেরম্বচন্দ্র কলেজ হেঃ হেঃ হেঃ!"
"না না," বৃন্দাদেবী মাথা নাড়েন। সঙ্গে তুতুদিরও মাথা নড়ে ওঠে। শান্তির ললিত বাণী ফুৎকারে উড়ে যায়। "ওসব নাম এখন আর এখানে চলে না।"

“আরে লড়কা একা আপনাদের কমিউনিটির তো না। আমাদের ভী কমিউনিটির আছে।”
“একশবার তাই। কিন্তু আমাদের বংশের প্রথম ছেলে তো, তাই এবারটা আমাদের পছন্দ মতো নাম দিই? আপনার তো অলরেডি নাতি আছে।”
“বাট লাকি লেটার দিয়ে নাম দিতে কি প্রবলেম আছে? বেবির ফিউচারের কথাটা ভাববেন না?”
“ফিউচারের কথা ভেবেই বলছি দাদা। হেমন্ত নাম দিলে স্কুলে ওকে সবাই মুর্গি করবে!”
“মুর্গা বনায়েগা?”

মহিমা অতি কষ্টে হাসি চাপে। হঠাৎ করে কেমন ক্লান্ত লাগে তার। কোথায় যেন পড়েছিল, রানী মদালসা ছেলের নাম দিয়েছিলেন অলর্ক, যার মানে 'পাগল কুকুর'। রাজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে বলেছিলেন, নাম শুধু শরীরের সঙ্গে যুক্ত, আত্মার সঙ্গে নয়। তাই মানুষকে যে নামেই ডাকা হোক, শেষ অবধি সেই নামের কোন অর্থ নেই। অবশ্য এত বড় দার্শনিক কথা মহিমা উপলব্ধি করতে পারেনা। কিন্তু সে এটুকু বুঝতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ বা আইনস্টাইন কোটিতে একজন হতে পারে। এই পৃথিবীতে এমন ক'জন আছে যাদের নাম ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছে? বেশীর ভাগ মানুষ জীবদ্দশায় নিজের নামটুকু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলেই খুশী। অনেকে তো তাও পারেনা। বেঁচে থাকতেই তাদের নামগুলো কোথায় যেন তলিয়ে যায়...নাকি রাস্তাঘাটে ট্রাম বাস চাপা পড়ে যায়? তারা নিজেরা হেঁটে চলে যায়, নাম পরিচয়হীন। রোজ সকালে বড় বড় অফিসগুলো হাঁ করে কত মানুষকে গিলে নিচ্ছে, আবার সন্ধেবেলা উগড়ে দিচ্ছে। তাদের নাম কে মনে রাখছে? রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালা, আইস্ক্রিম ওয়ালা হাঁক দিয়ে যাচ্ছে, কে তাদের নাম জিজ্ঞেস করে? বাড়ির জমাদারের নাম কার মুখস্থ আছে?

অথচ এরা যখন জন্মেছিল এদের বাড়িতেও নিশ্চয়ই নামকরণ নিয়ে এরকমই যুদ্ধ হয়েছিল? পণ্ডিতজীকে দেখিয়ে, ঘটা করে যজ্ঞ করে নাম দেওয়া হয়েছিল? তারপর সারা জীবন বাবলু, সোনাই, পিংকি, পিকাই, অমুকের বাবা, তমুকের মা এইসব আদরের নামের আড়ালে সেই বহুমুল্য নাম অতর্কিতে হারিয়ে গেছে। হ সে হেমন্ত আর শ সে শতানীকের জীবন কি সত্যিই শুধুমাত্র নামের তফাতে আলাদা হয়ে গেছে? তাহলে অহেতুক এই নামকরণ নিয়ে এত ঝামেলার মানে কি?
কোলে শোয়া ছোট্ট পুঁটলিটা হঠাৎই নড়ে উঠল। মহিমা তাকিয়ে দেখে বেবি দুটো ছোট ছোট হাত তুলে ওকে ডাকছে। মুখটা হাসি হাসি করে কি সব ইশারা ইঙ্গিত করছে। যেন মায়ের সঙ্গে কত গোপন আলোচনা করার আছে। মূহুর্তে সব ভুলে গিয়ে মহিমাও ওর সঙ্গে ভাষাহীন আলাপে মেতে যায়। ঘরের উত্তাল আলোচনার মতোই অর্থহীন সে আলাপ। অথবা হয়তো গভীর অর্থ আছে তার।

গান্ধর্বিকা ভট্টাচার্য পেশায় আইনজীবী। বাড়ি দক্ষিণ কোলকাতায়। লেখালেখির সঙ্গে শখ আছে রান্না করার, দেশে বিদেশে ঘোরার আর গল্পের বই পড়ার।

হরিদ্বার: স্বর্গের প্রবেশপথ

ভ্রমণ

দেবায়ন চৌধুরী

ভারতের আধ্যাত্মিক মানচিত্রে হরিদ্বারের গুরুত্ব অপরিসীম। হরিদ্বার নাম কীভাবে হল, তা নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। শৈবদের মতে 'হর-দ্বার' আর বৈষ্ণবেরা মনে করেন 'হরি-দ্বার'। মহাভারতে একে 'গঙ্গাদ্বার' বলা হয়েছে। হিউ এন সাং-এর বিবরণে 'ময়ূলো' নামে যে স্থানটি পাওয়া যায়, তাকে মায়াপুরী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ঐতিহাসিকেরা। যা হরিদ্বারের একটু দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। হরিদ্বারে গঙ্গা শিবালিক পর্বতকে ভেদ করে সমতলে এসে পড়েছে। মনে পড়ে, রাজা ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের প্রসঙ্গ। দেবাদিদেব মহাদেব ও বিষ্ণুর আশীর্বাদধন্য এই স্থান। হান্টারের বিবরণে হরিদ্বারকে 'কপিলস্থান' বলা হয়েছে, কেননা কপিল মুনি এখানে তপস্যা করেছিলেন।

গত পুজোর ছুটিতে পারিবারিক অনেক বাধাবিপত্তির মধ্যেই চলে গিয়েছিলাম এই পবিত্র তীর্থে। শেয়ালদা থেকে বিকেল চারটে পঞ্চাশে রাজধানী এক্সপ্রেসে রওনা দিয়ে দিল্লি পৌঁছুলাম পরদিন বেলা বারোটা নাগাদ। ট্রেন ঘণ্টাখানেক লেট ছিল। তারপর দিল্লি থেকে বিকেল তিনটে কুড়ি মিনিটে জনশতাব্দীতে যাত্রা শুরু। সন্ধে সাড়ে সাতটায় হরিদ্বার স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। অটো থেকে যখন নামলাম সুভাষ ঘাটের কাছে, চারপাশে হলদে আলোয় হাল্কা ঠাণ্ডা নেমেছে।

হোটেল জ্ঞানের অবস্থান হর কি পৌরির খুব কাছেই। গঙ্গায় তখন জল ছিল না। দশমী থেকে কালীপুজো পর্যন্ত এই নদীখাতে জল থাকে না। কৃত্রিম উপায়ে জল শুকিয়ে ফেলা হয়। নদী-সংস্কার চলে এইসময়। কেউ কেউ মনে করেন গঙ্গাদেবী 'বিজয়া দশমীর দিনে তার পৈতৃক বাড়িতে ঘুরতে যান ও ভাইফোঁটার দিন ফিরে আসেন।' যাইহোক, যেদিন পৌঁছুলাম সেদিন রাতেই ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে চলে গেলাম হর কি পৌরিতে। শিব বা বিষ্ণুর পদচিহ্ন থেকেই এই স্থানের এমন নাম। এখানেই অবস্থিত ব্রহ্মকুণ্ড। চারপাশে রয়েছে বিষ্ণু, ব্রহ্মা, গঙ্গা, দুর্গা, হনুমান, মহাকালী প্রমুখ দেবতার মন্দির। মার্বেলনির্মিত বিস্তৃত মন্দিরচাতাল খুব সুন্দর। রাত তখন প্রায় বারোটা, ঘুমন্ত-জাগ্রত-ভ্রাম্যমান মানুষ দেখতে দেখতে গিয়ে বসলাম এক চায়ের দোকানে। কুড়ি টাকায় এক কাপ গরম চা খেতে খেতে শুনছিলাম সারা রাত চায়ের দোকান খোলা। ভাঁড়গুলো খুব সুন্দর। এক অদ্ভুত গন্ধ ভেসে আসছিল। মাটির না তীর্থের কে জানে!

(২)

সকালের নরম আলোয় রাস্তায় বেরিয়ে দেখি দোকানে দোকানে ভিড়। কোনো একজন হয়তো বিশজনকে পুরি-সবজি খাওয়াবেন বলে মনে করেছেন। আপনি দুশো টাকা ধরে দিলে তার ভিত্তিতে কয়েকজনকে ভাত কিংবা রুটি দেওয়া হবে। তাঁরাও সিঁড়িতে

লাইন দিয়ে বসে আছেন। যে ব্যবস্থা করে দিচ্ছে পুণ্যার্জনের, শেষে সে-ও নিজের ভাগ বুঝে নেবে। ভিক্ষাপ্রার্থীর সংখ্যা কম নয়। কেউ কপালে তিলক লাগিয়ে পয়সা চাইছে। গঙ্গাকে কেন্দ্র করেই এত মানুষের বেঁচে থাকা, ঘাটের কথায় রোদ পোহায় প্লাস্টিকের গ্যালন। জলের কাছে মনের কথা বলতে হয়। পেট না ভরলে মন কি আর কথা বলতে পারে?

মাছেভাতে বাঙালির শুদ্ধ শাকাহারিতে পরিবর্তন চোখেই পড়বে না হরিদ্বারে এলে। বেনারসের মতো বিচিত্র ব্যঞ্জন না থাকলেও যতটুকু আছে, তা চেখে দেখতে দেখতেই সময় চলে যাবে। হরিদ্বারে এসে দাদা বৌদির দোকানে হানা দিতেই হয়। একাধিক দাদা বৌদি। যেখানে খুশি খেলেই হল। আমরা তো আর আমরাই সবার আগে বলে নিউজ চ্যানেলের মতো টিআরপি বাড়াতে চাইছি না! যেখানে দুপুরে পেটপুরে খেলাম, সেখানে লেখা 'সর্বপ্রথম পুরোনো দাদা বৌদির হোটেল'—গরম ভাত, ঘি, লঙ্কা, তেল চুপচুপে বেগুন ভাজা, ডাল, দুরকম তরকারি, চাটনি ও পাপড়। বাংলা থেকে এত দূরে 'আসুন বসুন যত খুশি নিন' শুনতে ভালোই লাগছিল। মাত্র নব্বই টাকায় এই রকমারি আয়োজন অবিশ্বাস্য। কেননা চটিওয়ালা কিংবা নামজাদা দোকানে আলাদা আলাদা করে রুটি, তরকা, নান কিংবা পনিরের দাম কিন্তু বেশ চড়া। শুধু এক প্লেট ভাতের দাম একশ সত্তর টাকা মাত্র। আবার একশো কুড়ি টাকাতে ডাল, রুটি, সবজি, ভাত, পনিরও মিলবে। একটু দেখেশুনে ঘুরেঘুরে খেলে মন্দ লাগবে না। পকেট ও পেট দুই-ই ভালো থাকবে।

গরম দুধ, রাবড়ি, জিলিপি, প্যাঁড়া প্রভৃতি মিষ্টি দ্রব্য চাখতে চাখতে দেখবেন সময় চলে যাচ্ছে স্রোতের মতো। পেল্লাই সাইজের সিঙারায় কামড় দিতে দিতে চা নিতে হবে আবার। তবে চিনি ছাড়া চা বললেও যেটা পাবেন আপনি, তাতেও মধু কম নয়!

(৩)

হরিদ্বার থেকে এবার একটু বেরোনোর পালা। এখান থেকে ঋষিকেশের দূরত্ব ২৪ কিমি। হর কি পৌরি থেকে টোটোতে করে কিছুটা এগিয়ে যেতে হল, সেখান থেকে বড়ো গাড়ি করে হৃষিকেশের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। পথে দেখলাম শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির। ঋষিকেশ থেকে বদ্রিনাথ (২৯৮ কিমি, ভায়া রুদ্রপ্রয়াগ), কেদারনাথ (২২৩ কিমি, ভায়া রুদ্রপ্রয়াগ), গঙ্গোত্রী (২৪৬ কিমি, ভায়া উত্তরকাশী), যমুনোত্রী (২২২ কিমি, ভায়া তেহরি)-র যাত্রা শুরু হয় বলে এই স্থানের পৃথক গুরুত্ব রয়েছে। ঋষিকেশ থেকে যাওয়া যেতে পারে দেরাদুন (৪২ কিমি) কিংবা মুসৌরিতে (৭৭কিমি)। সাধুসন্তদের বাসস্থান ও যোগচর্চার কেন্দ্র হিসেবে ঋষিকেশ সুপরিচিত। ত্রিবেণী ঘাট, ভারত মন্দির রয়েছে এখানে। এবং বিখ্যাত শতাব্দীপ্রাচীন লক্ষ্মণঝোলা। আমরা অবশ্য সেই ঝুলন্ত সেতুতে যাইনি। গাড়িচালকের মুখে শুনলাম বেশ কিছুদিন ধরে সেটি বন্ধ আছে। নতুন জানকীঝোলায় গঙ্গা পার হয়ে অনেকটা হেঁটে, রামঝোলা দিয়ে গাড়ি ধরতে হয়েছে। গঙ্গার পাশ দিয়ে দর্শনীয় পথ। বিভিন্ন ঘাট, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, পরমার্থ নিকেতন, গীতা ভবন প্রভৃতি দেখতে দেখতে সময় কেটে যায় অনেকটাই। স্বচ্ছসলিলা প্রশস্ত গঙ্গা ভারি মনোরম। মনটা অজানা আনন্দে ভরে যায় যেমন, তেমনি ক্লান্তও লাগে। যে পথ দিয়ে স্বর্গের কাছে পৌঁছুনো যায়, যে পথ দিয়ে হেঁটে গেছেন পুরাকথার নায়কেরা, সেইসব অঞ্চলে পদচারণার অনুভব সত্যি হয়ে ওঠে ঠিক সেইসময় যতটা, পরবর্তীকালে তার চেয়েও বেশি। মনে হয় শরীর সায় দিলে আরো যদি ঘুরে ঘুরে দেখা যেত চারপাশটা!

(৪)

হৃষিকেশ থেকে দুপুরের খাওয়া সেরে আমরা চলে গেলাম কনখল। খল ব্যক্তিও এখানে এসে মুক্তি না পেয়ে যাবে না-- মহাভারতে এমন কথা পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত'-এ কনখলের উল্লেখ আছে। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত অখিলচন্দ্র পালিতের 'মেঘদূত'-এর অনুবাদে পাই—"কনখলের নিকট গঙ্গা হিমালয়ের ক্রোড় ছাড়িয়া সমতলে প্রবেশ করিতেছেন।

তাঁহার জলধারা হিমালয়ের গায়ে ধাপে ধাপে সোপানপরম্পরার ন্যায় দেখাইতেছে। এই সোপান অবলম্বন করিয়া সগরতনয়েরা স্বর্গে গিয়াছিলেন। উচ্চ হইতে নীচে জল পড়িয়া বিস্তর ফেনা হইতেছে, যেন গঙ্গা হাসিতেছেন। হাসিতেছেন কেন? গঙ্গা শিবের জটায় পড়িতেছেন, চন্দ্র করোদ্ভাসিত তাঁহার তরঙ্গরূপ হস্তদ্বারা মহাদেবের কেশ গ্রহণ করিতেছেন ; এবং সেই সৌভাগ্যে স্ফীত হইয়া সপত্নী গৌরীকে উপেক্ষা করিয়া গঙ্গা এত উপেক্ষার হাসি হাসিতেছেন।" কী অসাধারণ বর্ণনা!

কনখলে গঙ্গা নীলধারা নামেও পরিচিত। কেননা কাছেই নীলপর্বত। হরিদ্বারের থেকেও কনখল প্রাচীন বলে মনে করা হয়। এখানেই দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। সতীঘাট, সতীকুণ্ড, দক্ষেশ্বর মহাদেব মন্দির প্রভৃতি স্থান পৌরাণিক ইতিহাসকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

(৫)

কনখলে রামকৃষ্ণ মিশ্রম সেবাশ্রমে গিয়ে মন ভরে গেল। ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে স্বামী কল্যাণানন্দ এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিশালাকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের পাশে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির ও সাধুনিবাস। অদ্ভুত শান্ত ও পবিত্র এই ক্যাম্পাস। তারপর আমরা গেলাম আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে। এখানে রয়েছে তাঁর সমাধি মন্দির। মায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ঢাকায়, ১৯৩২ সাল নাগাদ তিনি চলে এসেছিলেন দেরাদুনে। কনখলে আশ্রমের পরিবেশ মনে প্রশান্তি এনে দেয়। সেদিন ফিরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই।

(৬)

মাইকের আওয়াজে পরদিন ঘুম ভাঙল ছটা নাগাদ। কালীপুজোর দিন গঙ্গায় স্নান সেরে নিলাম সকাল সকাল। গঙ্গা পুনরুজ্জীবিত হতেই মানুষের ঢল নেমেছে শহরে। শাস্ত্রে বলা হয়, হরিদ্বারে তিন রাত্রি বাস করে গঙ্গাস্নান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। ফলের আশায় নয়, ভালোবাসার টানেই দিলাম তিন ডুব। লোহার শেকল ধরে নদীতে অনেকটা দূর পর্যন্ত যাওয়া যায়। জল যতটা মনে হয়েছিল ততটা ঠাণ্ডা নয়। সূর্যপ্রণাম করে চলে গেলাম মহাকালীর মন্দিরে। অঞ্জলি দিলাম। পুরোহিত মশাইয়ের ব্যবহার, সংস্কৃত উচ্চারণ সম্ভ্রম আদায় করে নিল।

পুজোর পর ভারি খিদে পেল। তাই পেটপুরে পুরি আর ঘুগনি। হালুয়া। আর গরম গরম চা। হোটেলে ফিরে একটু জিরিয়ে নিয়েই আবার চলা। মনসা মন্দির ও চণ্ডীদেবী মন্দিরের জন্য রোপওয়ের টিকিট একসঙ্গে জনপ্রতি প্রায় সাড়ে চারশো টাকা। চণ্ডীদেবী মন্দিরে রোপওয়ে পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য গাড়িভাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। রোপওয়ে থেকে পাখির চোখে দেখা যায় চারপাশ। দূরে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। এক পাহাড় থেকে চলে যাচ্ছি অন্য পাহাড়ে। 'দেবতাত্মা হিমালয়' বইতে প্রবোধকুমার সান্যাল লিখেছিলেন—"নদীর এপারে শিবপূজায় ব্যস্ত হরিদ্বার, ওপারে চলছে শক্তিপূজা ! কনখলে যাবার পথে মায়াবতীর পাশ দিয়ে গঙ্গার মূলধারার তীরে তীরে পথ। আশ্চর্য, এই নদীর উপর দাঁড়ালে উত্তর দিগন্তে সোজা দেখা যায় তুষারমৌলী বদরিনাথের পর্বতচূড়া—আকাশপথে হয়ত পঞ্চাশ মাইলের বেশী নয়। এই গঙ্গার দুই তীর ভূমি থেকে তুলেছি কত বিচিত্রবর্ণের নুড়ি, -- নিটোল মসৃণ মোলায়েম পাথরের টুক্‌রো। হরিদ্রাভ, রক্তিম, নীল, সবুজ, লোহিত-নীলাভ, কৃষ্ণ,--আরো কত রং।" জীবনের রং দেখতে হলে তীর্থে যে আসতেই হবে।

(৭)

বিকেলের আলো নরম হতেই হর কি পৌরিতে গঙ্গা আরতির ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। অনেক আগে থাকতেই লোকজন বসে পড়ে সিঁড়িতে। বসবার জন্য প্লাস্টিক বিক্রি করছে অনেকে। একজনের থেকে নিলে অন্যজন রাগ করছে। আরতির আগে মন্দির কমিটির স্বেচ্ছাসেবকেরা মোবাইল, পার্স সামলে রাখতে বলছেন। রসিদ দিয়ে প্রণামী আদায়ও চলছে। বড়ো স্ক্রিনে গঙ্গা আরতির সম্প্রচার হচ্ছে। আরতি শুরু হতেই উশখুশ ব্যস্ততায় কেউ দাঁড়িয়ে পড়ছে। কেউ তাকে বসতে বলছে। জটলার মধ্যে আলো ঘুরছে। ঝুপ করে অন্ধকার চলে এল। গান শেষ হল। প্রদীপের তাপ মাথায় ঠেকিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে যখন ব্রিজের ওপর থেকে দেখছি চারপাশ, বুঝতে পারছি ভারতের বুকে গঙ্গার মাহাত্ম্য। অনুভবের গভীরতার জন্য আঁধার তৈরি করতে করতেই বুঝি জীবন বয়ে যাবে। অস্থি প্রবাহ ঘাটের কাছে ফুলের সাজি আর প্রদীপ নিয়ে সারারাত শুয়ে থাকে দুজন।

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে...। জলের স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে টলমল আলো-ফুলের সাজিকে। পেছন ফিরে তাকাই না আর। আকাশে মাঝেমাঝে আলোর ঝলকানি। ক্লক টাওয়ারের কাছে কারা যেন শব্দবাজি পোড়াচ্ছে।

(৮)

'তীর্থ' নামে জয় গোস্বামীর একটি গদ্যগ্রন্থ আছে। ১৯৯৮ সালে হরিদ্বারে 'শতাব্দীর শেষ কুম্ভে' গিয়েছিলেন তিনি, সেইসব অভিজ্ঞতার নির্যাস নিয়েই এই বই। হরিদ্বারে যাবার আগে এবং পরে বইটি আমার সঙ্গে থেকেছে। সেখান থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি—"রিকশা ভর্তি করে তিন চার জন বেঁকে দাঁড়িয়ে চলেছে। এই রে, ওঁদের পাদানির সুটকেশটা পড়ে গেল রাস্তায়। পিছনের রিকশা, জিপ দাঁড়িয়ে গেল। পুলিশ এসে তুলে দিচ্ছে। ওই যে একজন ধুলো-হলদে রঙের সন্ন্যাসী হেঁটে আসছে, হাতে চিমটে, সর্ব অঙ্গে কিচ্ছুটি নেই—কিন্তু পায়ে নতুন ক্যাম্বিসের জুতো। এই যে একটা বাচ্চা চায়ের দোকানে ঢুকে বাবার কাছে বায়না ধরেছে ডিমভাজা খাব। আর তাঁর ভালোমানুষ বাবা যে তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না এই হরিদোয়ারে ডিমভাজার কথা বলতে নেই, আর মা যে বলছে আন্ডে উন্ডে সব ঘর পৌছ্নে কে বাদ, আর তার কিশোরী দিদিটি যে সামনের টেবিলে পুরি-তরকারি নিয়ে বসা তরুণটির চোখ থেকে ইতিমধ্যেই দু'বার চোখ সরিয়ে নিল—এরা সবাই তো মানুষ। এরা সবাই স্নানে এসেছে। তীর্থস্নান।

আর মানুষ দেখাও তো এক রকম তীর্থই।"

আর এমন তীর্থে বারবার যেতে ইচ্ছে করে!

দেবায়ন চৌধুরী— কবি ও প্রাবন্ধিক। সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর উইমেন, পূর্ব মেদিনীপুর।

রুনুদি

রম্য রচনা

চৈতালি সরকার

কিছু ঘটনা গল্পের মতো শোনায়। সেগুলো সত্যি ভাবতে কষ্ট হয়। আসলে যা সহজে সমাধান হয় না তাই তো রহস্য, কী বলিস ?

রুনুদির কথাগুলো একমনে শোনার পর নেতিয়ে পড়লাম সবাই। সুকৃতি বলল , অত হেঁয়ালি না করে তোমার ঝুলিটা উল্টে দাও তো। গপ্পো সপ্পো আছে কিনা দেখি।

রুনুদি বলল, দিতে পারি আগে এককাপ গরম কফি খাওয়া।

কথাটা খারাপ বলেনি রুনুদি। দুদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি হওয়ায় শীত শীত করছে। গরম কফিতে নিজেদের সেঁকে নিতে পারলে মন্দ হয় না।

আমরা চারজন বরানগরে একটা মেসে থাকি। রান্নার লোক দুবেলা রান্না করে দিয়ে যায়। চা, চাউমিন যা কিছু উপরি রান্নাবান্না সেসব আমাদের ওপরেই বর্তায়। তাই সময় নষ্ট না করে সহেলি সবার জন্য কফি বানাতে গেল। আমরা রুনুদিকে ঘিরে বাচ্চা মেয়েদের মতো বায়না করে চললাম। আগেই বলেছি রুনুদি বয়সে বড় হলেও আমাদের বন্ধুর মতোই। আর রুনুদির গল্পের ভান্ডার কখনো মোহনায় পৌঁছয় না।

কফিতে চুমুক দিয়ে দীর্ঘ শ্বাস নিল রুনুদি। মুখে পরিতৃপ্তির হাসি এনে শুরু করল আজকের কাহিনী।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমি তখন সবে বি. এ ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি। কলেজ থেকে বাড়ির দূরত্ব পায়ে হেঁটে প্রায় ঘন্টাখানেক। আর তোরা তো

জানিস আমি কোনোকালেই সাইকেল চালাতে পারিনা। অগত্যা ঘন্টাখানেক পথ পাড় হতে পদযুগলই সম্বল ছিল। কয়েকদিনের মধ্যে বুঝতে পারলাম আমার কোনও পথ-সঙ্গী হওয়া সম্ভব নয়। আকাশের এক-ফালি চাঁদের মতো এই এলাকায় আমিই একমাত্র ছাত্রী ।

রুনুদিকে থামিয়ে দিয়ে জয়িতা বলল, তুমি কীসের গল্প বলছ বলো তো? কোনও রহস্য আছে নাকি পূর্বস্মৃতি রোমন্থন চলবে?

রুনুদি বলল , গল্পের মাঝে কমা সেমিকোলন টানছিস কেন? জানিস না গল্পকারকে বাঁধা দেওয়া গর্হিত অপরাধ।

কথার মাঝে ফোঁড়ন কাটা জয়িতার একটা বদভ্যাস। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে জয়িতার মুখ বন্ধ করলাম। রুনুদি কফি কাপ টেবিলে রেখে আবার এসে আসর জমিয়ে বসল। প্রাক-কথনের সূত্র ধরে নিজস্ব ভঙ্গীতে শুরু করল পরবর্তী অংশ।

এতদিন বাড়ির কাছাকাছি স্কুলে পড়াশোনা করেছি। একটু দূরে যাবার নাম শুনলেই বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করত। হারিয়ে যাবো না তো! তবে তা কদ্দিন? ভয় নিয়ে কী বেঁচে থাকা যায় ! আর একটা ব্যাপার আমার কলেজের পথ মোটেই কণ্টক-হীন ছিল না। বাড়ি থেকে দশমিনিট চওড়া সিঁথির মতো গেলেই শুরু হত আমবাগান। এই আমবাগান ঘেঁষা রাস্তার উল্টোদিকে বিরাট দিঘি। এদিকে বসত বাড়ি খুব একটা ছিল না। বরং দিঘির পাশে শূন্যস্থানের মতো জবরদখল করে ছিল ফাঁকা মাঠ।

দিনের বেলা এদিকে লোকজন যাতায়াত করলেও রাতে খুব একটা কেউ যেত না। আমি অবশ্য কলেজের শর্টকাট রাস্তা হিসেবে এই পথটি বেছে নিয়েছিলাম।

রুনুদি ঘড়িতে দম দেওয়ার মতো থামল কিছুক্ষণ। দেখলাম বাইরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এদিকে বেশ খিদে খিদে পাচ্ছে। বললাম ," চালভাজা খাবে রুনুদি? " গল্পের তাল কেটে গেলে এমনিতে রুনুদি বিরক্ত হয়। তবে এখন হল না। মনের ইচ্ছে যেন প্রকাশ করে ফেলেছি সেভাবে ঘাড় নাড়ল। জয়িতা এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আস্তো গিলে ফেলবে। আমি অগ্রাহ্য করার ভঙ্গী নিয়ে ছুটলাম রান্নাঘরে। দুটো প্যাকেট চটজলদি কেটে থালা সমেত হাজির হলাম। রুনুদি

একমুঠো চালভাজা মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে আবার শুরু করল

সেদিনটা কলেজের সোশ্যাল প্রোগ্রাম। বাইরে থেকে
অনেক শিল্পী এসেছে। আমাদের মধ্যে টানটান উত্তেজনা। সাজগোজের বহর দেখবার মতো। আর সাজব নাইবা কেন! কতদিন পর একটা অনুষ্ঠান। ছেলেরা একটু হ্যাংলার মতো তাকাবে তবেই না! জমিয়ে অনুষ্ঠান দেখছি। ঘড়ির দিকে কারোর খেয়াল নেই। যখন সব শেষ হল ঘড়ির কাঁটা আটটার দিকে। আর একটুও সময় নষ্ট না করে চটপট হল থেকে বেরিয়ে একটা রিক্সা ধরে নিলাম। বললাম শর্টকাট পথ দিয়ে তাড়াতাড়ি চলো।
আকাশে টিপের মতো তারারা মিটমিট করছে। আমি সম্রাজ্ঞীর মতো রিক্সায় বসে আছি। চালক-মশাই সর্বশক্তি দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছেন সম্মুখে। আমবাগানে ঢোকার মুখে হঠাৎই একটা বিকট আওয়াজে চমকে উঠলাম দুজনে।
জিজ্ঞেস করলাম" কী হল?"
চালক বললেন, "টায়ার ফেটে গেছে। গাড়ি আর যাবে না। "
মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল যেন। এবার কী করব! দীর্ঘ শুনশান পথ একা যেতে হবে ভেবেই পেটের ভেতর মোচড় মারতে শুরু করল। তবে এভাবে ভেঙে পড়লে তো হবে না। নির্ভীক পথিকের মতো হনহন করে হাঁটা শুরু করলাম।
কয়েক পা এগোতেই শুরু হল লোডশেডিং । এক নিঃসীম অন্ধকারে ডুবে গেল চারিধার । আকাশের চাঁদ তারা সবই তখন আমবাগানের আড়ালে মুখ লুকিয়ে। দিঘির অস্পষ্ট জলের আবছা আলো দেখে কোনরকমে এগিয়ে চলেছি। এভাবে কতক্ষণ জানিনা, হঠাৎ মনে হল কে যেন পিছনে ছায়ার মতো আসছে। প্রথমে ভাবলাম হতেই পারে আমার মতো কোনও পথচারী। শর্টকাট রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছে।
ভয়ে ভয়ে নিজের গতিবেগ কিছুটা কমিয়ে তাকে পাশ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু একি ! পেছনের আগন্তুক আরও ধীরে চল নীতি নিল কেন?
প্রশ্নটা বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটছে। পেছন ফিরে তাকাবার সাহস পর্যন্ত নেই। কোন্ কিম্ভূত মূর্তি দেখব কে জানে! একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। কোনও বদ মতলবে কেউ আবার পিছু নেয়নি তো! মায়ের মুখটা শেষবারের মতো মনে পড়ল। চোখ ভেঙে কান্না আসছে। আমি নিশ্চিত এক্ষুণি জীবন্ত শরীর খুবলে নেবে শকুনে! কী করব মনস্থির করতে পারছি না। অদ্ভুত পদধ্বনি আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এ পথের যেন শেষ নেই!

পাথরের মতো ভারী পা, নিথর শরীর, আর মাথায় এলোমেলো প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছি। প্রায় আমবাগান শেষ। আর মাত্র দশ মিনিট। ঠিক তখনই পাশের স্ট্রিট লাইট অর্তকিতে জ্বলে উঠল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন! এবার দেখতে হবে পেছনের আগন্তুকটি কে? এক-বুক সাহস নিয়ে পেছন ফিরতেই আঁতকে উঠলাম। ওটা কী?

এখানেই ফুলস্টপ টেনে নির্বাক চোখে তাকাল রুনুদি। কয়েক মিনিট বিরতি চাইছে যেন। আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়লাম সবাই। জয়িতা ভ্রু কুঁচকে বলল, কী দেখলে রুনুদি?

বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ। আমাদের মনের ভেতর উল্টোপাল্টা ঝড় বইছে। সকলের একটাই প্রশ্ন পেছনে কে?

মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ল কিছুটা। নাটকীয় ভঙ্গীতে রুনুদি বলল, " পেছন ফিরে দেখি কালো মিশমিশে একটা ষাঁড়।"

বললাম ," মানে?"

"মানে আবার কী আমি তখন দৌড়চ্ছি। ষাঁড়ের গুঁতো বলে কথা!"

রুনুদির বলার ভঙ্গীতে সবাই হেসে উঠলাম হো হো করে।

চৈতালি সরকার: বর্ধমানের অন্তর্গত বিল্বেশ্বর বিনোদীলাল বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স। কবিতা, গল্প লেখা নেশা। গল্প, কবিতা বিভিন্ন ওয়েব ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা

প্রবন্ধ

সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঔপনিবেশিক শাসনের বিজ্ঞানচর্চা প্রসঙ্গে George Basalla র 'Diffusion' তত্ত্বে ইউরোপকে বিজ্ঞান চর্চার মূল কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে পরবর্তীকালে বিভিন্ন গবেষক তাঁর এই তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। সমালোচক গবেষকগণ উপনিবেশিক বাংলা বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে কিভাবে ইউরোপকে প্রভাবিত করেছিল তা তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে বিশিষ্ট ভূমিকা নেন ড. দীপক কুমার। তিনি ভারতীয় এবং ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান চর্চার ধারার মধ্যে সমন্বয়ের সঙ্গে বাংলার ক্ষেত্রে কিভাবে বিজ্ঞান চর্চায় রাজনীতিকরনের সূচনা হয়েছিল তাও তিনি তুলে ধরেন। গবেষক দীপক কুমারের মতে, বিজ্ঞান বলতে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বিজ্ঞানীদের ভূমিকা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভূমিকা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের একটি সম্মিলিত রূপকে গণ্য করেছেন।

বাংলার বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটি। এশিয়াটিক সোসাইটি ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি চর্চার পাশাপাশি ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণারও সূচনা করে। উদ্ভিদ বিজ্ঞান সংক্রান্ত পৃথক গবেষণা কেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে। তবে ১৮৮০ -র দশক পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে ভারতীয়দের কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো না এবং ভারতীয়দের সদস্য করা হতো না।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৯ সালে বাংলা ভাষায় শারীর বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা করেন শ্রীরামপুর মিশনের অন্যতম সদস্য ফেলিক্স কেরি। এছাড়া শ্রীরামপুর মিশন কলেজে রসায়নের পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। উইলিয়াম ওয়ার্ড -এর নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে আধুনিক মুদ্রণ ও কাগজ নির্মাণ শিল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এইভাবে ঔপনিবেশিক বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার ধারা দেখা যায়।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রাচ্য পাশ্চাত্যপন্থীদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়। পাশ্চাত্য পন্থীদের মধ্যে মেকলে ও বেন্টিং থাকায়, পাশ্চাত্য পন্থীরাই জয়লাভ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাধান্য লাভ করলেও মেকলে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি প্রবর্তনের দায়িত্বে থাকায় তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে সাহিত্য ও কলা চর্চার ব্যাপারেই বেশি গুরুত্ব দেন। কিন্তু গবেষক দীপক কুমার এক্ষেত্রে ভারতীয়দের মধ্যে থেকে বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পাঠ্যসূচি তৈরির কথা দাবীর উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা নেন অক্ষয় কুমার দত্ত। তিনি এ নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধও লেখেন। ফলে ভারতীয়দের তরফ থেকে বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারে আগ্রহ দেখা দেয়।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে 'স্কুল বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয় । এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর বিভিন্ন বই বাংলা ভাষায় রচনা করা হয়। বিভিন্ন গবেষকগণ বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন, ১১২ টি গণিত এবং ৯৯ টি চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করে।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চার বিষয়টি প্রসারিত হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেন মহেন্দ্রলাল সরকার। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তার উদ্যোগে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন সায়েন্স' গড়ে তোলা হয়। মহেন্দ্র-লাল সরকার মনে করতেন, ভারতে নিজস্ব বিজ্ঞানকুল গড়ে তুলতে গেলে এবং জাতীয় বিজ্ঞান চর্চা করতে গেলে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও অনুসন্ধান চালাতে হবে। এর জন্য দরকার ব্রিটিশ শক্তির সাহায্য ব্যতীত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান। তার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রমথনাথ বসু প্রমুখ। তাঁদের লক্ষ্য ছিল পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে মৌলিক গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

১৯০১ সালের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। সেখানে প্রথম থেকেই বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল, কৌতূহল এবং অনুসন্ধিৎসা নির্ভর বিজ্ঞান চর্চার ভিত্তিতে মানুষের চিন্তাধারাকে গড়ে তোলা। এরপর ১৯০২ সালে সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নেতৃত্বের 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অক্টোবর নভেম্বর মাসে ছাত্র পীড়ন শুরু হলে ১৯০৬ সালের ১১ই মার্চ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল জাতীয় স্বার্থে ও জাতীয় কর্তৃত্বে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন চরমপন্থি ব্যক্তিবর্গ। নরমপন্থী ব্যক্তিবর্গরা প্রতিষ্ঠা করলেন 'কারিগরি শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি'। এই 'কারিগরি শিক্ষা উন্নয়ন সমিতির' অধীনে স্থাপিত হয় 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট'। ফলে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে দেওয়া হতো, সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষা আর বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে দেওয়া হতো কারিগরি শিক্ষা। চরমপন্থি দলে ছিলেন সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন দত্ত প্রমুখ। নরমপন্থী দলের নেতা ছিলেন তারকনাথ পালিত।

ভারতের ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে বিজ্ঞান শিক্ষা একমাত্রিক ছিল না। পাশ্চাত্য পন্থীরা 'ফলাফল কেন্দ্রিক বিজ্ঞান' চর্চাকে গুরুত্ব দিত। কিন্তু ভারতীয়দের বিজ্ঞান চর্চার ভিত্তি ছিল অনুসন্ধিৎসা ও বাস্তব জীবন। ব্রিটিশদের বিজ্ঞান চর্চার সাথে সাম্রাজ্যের স্বার্থও সংযুক্ত ছিল। আর ভারতীয়দের বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে স্বদেশী শিল্পায়ন প্রক্রিয়া এবং ভারতীয়ত্বের একটি মেলবন্ধন দেখা যায়। বিনয় কুমার সরকার ভারতীয়দের শিল্পায়ন কেন্দ্রিক বিজ্ঞান চর্চাকে 'Education for Industrialization' বলে উল্লেখ করেছেন।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় ব্যক্তি প্রমথনাথ বসু 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট'- এর প্রধান উদ্যোক্তা এবং প্রথম অবৈতনিক অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে 'বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' এবং 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট'- এর পরিচালকমন্ডলী যৌথভাবে ১৯১০ এ একটি সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তার প্রধান আচার্য হন প্রমথনাথ বসু। তিনি স্বদেশী শিল্পোদ্যোগের বিকাশের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। এছাড়া শান্তিনিকেতনের বিজ্ঞান শিক্ষক জগদানন্দ রায়, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ ব্যক্তিরাও বিজ্ঞান প্রসারের জন্য বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখে জনসচেতনতা বাড়িয়ে তোলেন।

জগদীশচন্দ্র বসু পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। তাঁর শব্দ তরঙ্গ বিষয়ে মৌলিক গবেষণা Marconi- র 'radio wave' তত্ত্বের অনেক আগেই প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ব্যাপারে মৌলিক আবিষ্কার

করেন। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষের বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য তাঁর সাথে বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হয় এবং তাই তিনি তিন বছর কোনো বেতন নেননি। এরপর নিজ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় 'Bose Institute' বা 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' তৈরি করেছিলেন।

মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিকে শিল্পোদ্যোগে ব্যবহার এবং স্বাদেশিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। তিনি ১৮৯৩ সালে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল ভারতের প্রথম কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠান। এরপরে তিনি 'বেঙ্গল এনামেল', 'বেঙ্গল পটারিজ' ও 'বেঙ্গল সল্ট' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো ১৮৯৫ সালে মারকিউরাস নাইট্রাইটের। এছাড়া তিনি স্বদেশী মেলার সাথে যুক্ত হন। তিনি প্রথম "হিন্দু রসায়ন বিজ্ঞান চর্চার" সূত্রপাত ঘটান।

মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ছিলেন। মেঘনাদ সাহার বিজ্ঞান চর্চার মূল ভিত্তি ছিল মানবতাবাদী দেশপ্রেম। তিনি স্বাধীন ভারতের উন্নতির জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা করেন যা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে জানিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বাংলায় বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর উদ্যোগে 'ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে ওঠে। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৯২৪ সালে 'প্ল্যাঙ্কের সূত্র ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব 'গবেষণাপত্র লিখে তিনি 'ফিলোসফিক্যাল' ম্যাগাজিনে পাঠান। কিন্তু কোনো উত্তর না আসায় তিনি আইনস্টাইনকে তা প্রেরণ করেন। আইনস্টাইন বোসের এই আবিষ্কারটি যা 'বোস সংখ্যায়ন পদ্ধতি' নামে পরিচিত, তা নিজের গবেষণায় প্রয়োগ করে তিনি তৈরি করেন 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন'। সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য গড়ে তুলেছেন 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে গবেষণা করে তিনি কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার করেন। এছাড়া কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী), হৈমবতী সেনের কৃতিত্বও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সময় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি পুনরায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। চিকিৎসার পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ public health -র ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে মার্ক হ্যারিসন অবশ্য মনে করেন যে, উপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনে এই জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। তবে এর দ্বারা ভারতীয়রাও উপকৃত হয়।

১৯৯০ দশকে ভারতের উপনিবেশিক শাসনের ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়ে দীপক কুমার, ইরফান হাবিব এবং প্রতীক চক্রবর্তী উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। তাঁরা তাদের গবেষণায় আধুনিক বিজ্ঞান এর সার্বিক চিত্র তুলে ধরেছিলেন। তবে দীপক কুমার উপনিবেশিক বিজ্ঞান চর্চাকে 'নির্ভরশীল বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেন। তা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান চর্চা বাংলা তথা ভারতীয় ইতিহাসকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বহু পত্রিকায় তার লেখা প্রবন্ধ ও অণুগল্প প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক কাজের সহিত তিনি যুক্ত।

তথ্যসূত্র:-

১) বাংলার আর্থিক ইতিহাস, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়।

২) Science in Modern Bengal- Deepak Kumar

৩) ঔপনিবেশিক ভারতে বিজ্ঞান : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস – সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় , সুজিত রাজবংশী

৪) আধুনিক ভারত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক - শুচিব্রত সেন, আমিয় ঘোষ ও সংস্কৃতির ইতিহাস (১৮৮৫-১৯৬৪)

বৃক্ষযাপন

গল্প

ঝর্না বিশ্বাস

হঠাৎই সেই অপ্রত্যাশিত খবর - মালবিকা সেন আর নেই। অমিয় কল করে আগেই জানিয়েছিল ওর অসুস্থতার কথা। টানা বেশ কদিন হাসপাতালে একাই লড়ে যাচ্ছিল মালবিকা।

চশমা খুলে টানা এক দীর্ঘশ্বাসে আরও কিছুক্ষণ বসে রইল রজত।

মালবিকা! দুজনের সামনাসামনি দেখা হওয়া খুবই কম, আর পরিচয় মানে কটা চিঠিপত্র ও ম্যাগাজিনের লেখালেখি।

ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল রজতের। মনে পড়ছিল প্রথম আলাপের কথা। সেবার উত্তরবঙ্গ সাহিত্য কমিটি থেকে ওকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল দু দিন ব্যাপী সাহিত্য সভার প্রধান অতিথি হয়ে আসার। আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করেছিল রজত।

তখন অল্প নাম ডাক হয়েছে রজতের। সদ্য প্রকাশ পাওয়া "অতিথি" বইটি নিয়েও বেশ হইচই...

স্টেশনে মালবিকা নিতে এসেছিল। জায়গাটা রজতের কাছে একদম নতুন তাই আগেই কমিটি প্রধানকে জানিয়ে দিয়েছিল, আর সেই মতন স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে সামনের পার্কিংয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল রজত।

তখনই একটা রোগাপাতলা মেয়ে সামনে এগিয়ে এসে বলল,

- নমস্কার রজতবাবু।

- একি! আপনি আমায় চেনেন? কিছুটা হলেও অবাক হয়েছিল রজত।

- অবশ্যই। আপনার সব লেখা পড়ি। গতবার যে পূজো সংকলনটা বেরিয়েছিল ওতে ছবি দেখেছি আপনার।

ধন্যবাদ দিয়ে একটা স্মিত হাসি দিল রজত।

- ব্যাগ কী এই একটাই?...

ছোট স্যুটকেসের দিকে ইশারা করে মালবিকা জিজ্ঞেস করল।

- হ্যাঁ। মোটে তো তিনদিন, এতেই হয়ে যাবে।

'চলুন' বলে দুজনে এগিয়ে গেল আরও কিছুটা।

গাড়িটা বড় গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। ড্রাইভার ব্যাগ উঠিয়ে পেছনের সিটে রাখতেই রজত বসল সামনে। আর মালবিকা মাঝের সিটে বসে কাঁচটা অর্ধেক তুলে দিয়ে বলল,

- এদিকে কদিন খুব শীত পড়ছে জানেন। সকালের দিকটা আরো বেশি।

- হ্যাঁ, বেশ টের পাচ্ছি। সোয়েটার ফুঁড়ে ঠান্ডা ঢুকছে যেন...

গাড়ি স্টেশন রোড ঘুরে এসে উঠল বড় রাস্তায়।

সেদিন হোটেলে নামিয়ে দিয়ে মালবিকা বলেছিল, বিকেলে আসব কিন্তু। তৈরি থাকবেন।

সেই মত রজতও তৈরি ছিল। ছোটবেলা থেকে একা রজত। কাছের তেমন কেউ ছিল না যে শাসন করতে পারে, ভালোবাসতে পারে। তাই মেয়েটার বলার ভঙ্গিটা অনায়াসেই মনে ধরেছিল প্রথম দিন।

বিকেলে সময়মত উপস্থিত হয়েছিল মালবিকা, কচি কলাপাতা শাড়িতে তখন তাকে একদম অন্যরকম লাগছে। গাড়ির কাঁচ দিয়ে অনেকবার লক্ষ্য করেছিল রজত আর চোখাচোখিতে বেশ কবার সরিয়ে নিয়েছিল চোখ।

সভায় সেদিন কলাকুশলীদের ভিড়ে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছিল রজতের লেখালেখি। রজত নিজেও বলেছিল তাঁর লেখা শুরুর দিনগুলোর কথা...আর পাঠ করেছিল নতুন বই থেকে বেশ কিছু কবিতার অংশ...

সামনের চেয়ারে সেদিন ঠাঁই বসেছিল মালবিকা।

কবিদের স্মারক হিসেবে প্রশংসাপত্রের সাথে একটি করে চারাগাছও দেওয়া হলো। রজতের হাতে মালবিকা সেটা দিয়ে বলেছিল, আপনার সমস্ত লেখালেখি একদিন আরো বড় হোক, অনেক বড়। বৃক্ষ হয়ে ছায়া দিক আমাদের মত নতুনদের, যারা অল্প লেখালেখি করি, লিখতে ভালোবাসি।

বাড়ি ফিরে সেই কথা রেখেছিল রজত। ঘরের পূব দিকের কোণে গাছটা লাগিয়ে চলত চরম দেখা শোনা, রোজ নিয়ম করে জল দেওয়া – খেয়াল রাখা ইত্যাদি...

একটু একটু করে সে গাছ যখন বড় হচ্ছিল, মালবিকাও বন্ধু হয়েছিল...চিঠিতে কথা হত। কিন্তু একটা সময় উত্তর আসা বন্ধ হয়ে গেল।

অমিয়র কাছে শোনা, গুচ্ছ বইয়ের সংসারে একা থাকতে থাকতে একদিন দৈত্যের মত হানা দিয়েছিল অসুখটা...

শেষ চিঠিতে মালবিকা বলেছিল, আমি যেখানেই থাকি রজতবাবু আপনার লেখালেখির সাথে তার একান্ত পাঠিকা হয়ে চিরকাল জুড়ে থাকব।

বুকপকেটে মালবিকার সমস্ত স্মৃতি জড়িয়ে বাগানের ঐ গাছটা ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রজত।

ওর নতুন উপন্যাস "বৃক্ষযাপন" যে সেই পাঠিকাটিকেই উৎসর্গ করা, একবার যদি সে জানত...!

ঝর্না বিশ্বাস – জন্ম ও পড়াশোনা কলকাতায়। গণিতে স্নাতকোত্তর। পেশা শিক্ষকতা। মুম্বাই প্রবাসী। ভালোবাসি বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি কবিতা পড়তে। ভালোবাসি লিখতে ও অনুবাদ করতেও। প্রকাশিত ই-বুক : "ঋতুযান পাবলিকেশন" থেকে অক্টোবর ২০২০তে প্রকাশিত এলিয়ানোর এচ পোর্টারের 'পলিয়ানা' উপন্যাসের অনুবাদ।অ্যামাজন ও গুগল প্লে স্টোর-এ

কিছু একটা

গল্প

অচিন্ত্য দাস

শ্যামাঞ্জন মিত্র একা মানুষ। বছরখানেক হলো অবসর নিয়েছেন, বড় চাকরি করতেন। টাকা-পয়সার অভাব নেই তবে বাড়িতে বসে আজকাল আর সময় কাটতে চায় না। বিয়ে-থা করেননি – নতুন কিছু কারণ নয়, সেই একই গল্প। উনিশ-কুড়ি বছরে কার যেন প্রেমে পড়েছিলেন, তবে তেমন এগোয়নি। মেয়েটির শুভ-পরিণয় এবং ছেলেপুলে হয়ে গেলেও শ্যামাঞ্জন তাকে বহুদিন ভুলতে পারেননি। প্রথম প্রেমের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতেই তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ হয়ে গেল। তারপর আর বিয়ে-থা হয়ে উঠল না।

চাকরিতে ওপরের দিকে থাকাতে বাড়ি ফিরতে দেরি হতো। আজ মুম্বাই কাল হায়দ্রাবাদে মিটিং। হপ্তায় দু-তিন দিন ডিনার। কাজ ছাড়া আর কিছু ভাবার সময়ই ছিল না।

রিটায়ার করার পরই তাল কেটে গেছে।

চারতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিলেন। ভর দুপুরে কেউ নেই। গাড়িঘোড়াও দেখা যাচ্ছে না। চারদিক ফাঁকা আছে দেখে একটা প্লাস্টিকের ঠোঙা এক পেট বাতাস খেয়ে ফুলেফেঁপে গড়াতে গড়াতে রাস্তা পার হয়ে গেল।

এইভাবে থাকতে থাকতে কেমন যেন একটা ডিপ্রেশন মানে অবসাদের ভাব এসে পড়ছে। এক পেয়ালা চা বানিয়ে খেলে কেমন হয়? নাঃ, এখন চা খেলে বিকেলে কী করবেন!

শ্যাম নিজের মনে বললেন, "দূর ছাই, দেখি সুকুকে পাওয়া যায় কি না।" সুকু মানে সুকৃতি, অনেকদিনের বন্ধু। ফোনে তিনটে সতেরো, এখন সুকু আপিসে – ও এক্সটেনসন পেয়েছে। তবে বিশেষ কাজটাজ করতে হয় না। সুকুর নামের ওপর আঙুল রাখলেন।

সুকুকে পাওয়া গেল। ব্যস্ত কি না জিগেস করতে সে এমন একটা হাসি হাসল যে শ্যামাঞ্জনকে ফোনটা কান থেকে একটু সরাতে হলো।

"শোন সুকু, আর এই চারতলার ফ্ল্যাটে বসে দিন কাটছে না। ডিপ্রেশনে আধ-পাগল গোছের হয়ে যাচ্ছি। ভাবছি সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাবো।"

"আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, পুরো পাগল হয়ে গেলে বরং দেখাস।"

" দিনগুলো কাটাই কেমন করে!"

"অ্যাই, শোন। মনে পড়েছে। তুই আচার্যি বাবুর আশ্রমে যা।"

"আচার্যি বাবুর আশ্রম?"

"হ্যাঁ, ওই পুরুলিয়ার ওদিকটায়। শুনেছি যারা বাড়িতে বসে বসে আকাশ-পাতাল ভেবে সময় কাটায় অথচ ব্যাঙ্কে অনেক টাকা তাদের জন্য ভালো জায়গা। মাস দুয়েক মতো থাকতে হয়। আর যে দু-মাস ওখানে টিকে যায় সে নতুন মানুষ হয়ে ফেরে।"

"আমার নতুন মানুষ হবার দরকার নেই। আমার যে 'মডেল' সেই মডেলই থাক"

"অকেজো ভিনটেজ গাড়ির মতো গ্যারেজে বসে বসে দিন কাটাবি? তোর মনে ডিপ্রেশনের ভাইরাস ঢুকেছে। সেটা এবার তোর শরীর আক্রমণ করতে পারে। বুঝলি?"

***

শেষ পর্যন্ত শ্যাম মিত্র কিন্তু পুরুলিয়ার পাহাড়ি এলাকায় আচার্যিবাবুর আশ্রমে গেলেন। কোলকাতা থেকে খুব বেশি দূর নয়, একটা স্যুটকেস আর হাত-ব্যাগ সহ নিজেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। অনেকদিন এরকম বেরোনো হয়নি, ভালোই লাগছিল। সময়টাও ভালো, গরম বা শীত কোনোটাই তেমন নেই।

শ-দেড়েক ফুট উঁচু একটা টিলার ওপর আশ্রম। গাড়ি ওঠার সুন্দর পাকা রাস্তা, গাড়ি রাখারও জায়গা আছে। থাকার ঘরটা এক নজরেই পছন্দ হয়ে গেল। কিং-সাইজ বিছানা। পড়ার টেবিল। ফুল-লেন্থ আয়না লাগানো দেয়াল আলমারি। বাথরুম পরিষ্কার ঝকঝকে। মোটামুটি চার-তারা হোটেল ধরনের ব্যাপার। সেদিক থেকে থাকার ভাড়া যা নিচ্ছে তা কমই বলা যায়। সব থেকে ভালো জানানলাটা – পরদা সরালে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। মাঠ, ক্ষেত, পাহাড়ের সারি, বন-জঙ্গলের পরিলেখা। এখন যে বসন্ত কাল তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।
রাস্তায় দুপুরের খাওয়া সেরেছেন। এখন করার কিছু নেই, বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। আচার্যিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে বিকেল সাড়ে-পাঁচটায়।
আচার্যিবাবুর সঙ্গে দেখা করার আগে পর্যন্ত চলছিল ভালোই তবে প্রথম মুখোমুখি দেখাটা কেমন যেন উদ্ভট গোছের হলো। টোকা দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন, ভেতর থেকে কেউ আসতে বলল না। অথচ তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন আপিসঘরের ভেতরে উচ্চস্বরে দু-তিনজনের কথাবার্তা চলছে। আর অপেক্ষা না করে ঢুকেই পড়লেন।
একটা বড় টেবিল, ওপারে যিনি বসে আছেন তিনিই নিশ্চয় আচার্যিবাবু। একেবারে সাধারণ চেহারা – কোনো বিশেষত্ব নেই, পাঞ্জাবীর ঘোর নীল রংটি ছাড়া। তবে তিনি এত ব্যস্ত যে শ্যাম মিত্রর দিকে চোখ তুলে তাকাতেই পারছেন না। সামনে একটা ল্যাপটপ। আরেকটা টেবিলে আরও দুজন কম-বয়েসী কর্মী বসে আছে। আচার্যিবাবুর মেজাজ চড়ে আছে, ছেলে দুটোকে ধমক-ধামক করছেন।
“রীতেশকে ছুটি দেবার সময় তোরা আমাকে মনে করালি না যে বিদেশ থেকে উনি সাতদিন বাদে আসছেন! এখন কী করা যাবে?”
“স্যার, রীতেশবাবুর ছেলের অসুখ, আপনিই তো বললেন ওকে যেতে।”
শ্যামাঞ্জন যে এসে দাঁড়িয়েছেন তা কেউ দেখছেও না, এত ব্যাস্ত সবাই। এতদূর থেকে এসেছেন, অ্যাডভান্স যা চেয়েছিল সব দিয়েছেন। আর এরকম ব্যাবহার। কী করা যায় যখন ভাবছেন তখন আচার্যিবাবুর হুশ হলো। বললেন, “আপনি কে?”
“শ্যাম মিত্র। কোলকাতা। আসার কথা ছিল।”
“আসার কথা ছিল তো জানিয়েছিলেন?”
“হ্যাঁ, আপনাদের অফিসে মেল আর হোয়াটসঅ্যাপ করে জানিয়েছিলাম। “
“আরে মশায়, শুনলেন তো রীতেশ ছুটি নিয়েছে, ওই তো এসব দেখে। আমি জানব কী করে?”
শ্যামবাবু বলতে যাচ্ছিলেন কে ছুটি নিয়েছে নেয়নি তা জানার কথা তাঁর নয়। সামলে নিলেন। তবে মনে হলো টাকা-পয়সা, সময় সব জলে গেল। এত অগোছালো এরা। যাইহোক এসেছেন যখন তখন ... বললেন, “আমাকে এখন কী করতে হবে...”

“আরে মশায় কী এমন রাজকাজ আছে আপনার! একটু বসতে পারছেন না? দেখছেন আমরা ব্যস্ত আছি।”
প্রথম দিকে আপিসে শ্যামবাবুর একজন তিরিক্ষে বস জুটেছিল, তবে সেও এই আচার্যি লোকটার তুলনায় ‘মধুরভাষি’ বলা যায়। এমন সময় আর একটা ছেলে হাতে ল্যাপটপ নিয়ে যেন নাচতে নাচতে ঢুকল। “স্যার, সুখবর আছে, বিরাট সুখবর!”

সকলে তাকাতেই ছেলেটি বলল, "স্যার, সেই প্রফেসর কার্লসন আরও ছ-সপ্তাহ পরে আসবেন, কীসব কাজে ফেঁসে গেছেন।"
আচার্যিবাবু নিশ্বাস ফেলে বললেন "যাক, বাঁচা গেল। তা ওই ...কী নাম যেন ... ওই যে রে কাজটা যার করার কথা ছিল, তিনি কি আবার আসবেন? খবর নে তো।"
ছেলেটি বলল, "খবর নিয়েছি, আসছেন না।"
"তাহলে তো যে কে সেই, কাজটা কে করবে? অ্যাঁ .."

কী যেন মনে হওয়ায় আচার্যিমশায় হঠাৎ শ্যামবাবুকে বললেন, "আচ্ছা, আপনার পড়াশুনো কদ্দুর – কলেজ পাশ করেছেন?
এবার শ্যামবাবু ভেতরে ভেতরে রেগে গেলেন। গলা এক পর্দা গম্ভীর করে বললেন "প্রেসিডেন্সি তারপর আই আই এম, ব্যাঙ্গালোর"
"ও। বিষয় কী ছিল?"
"বোটানি, জুলজি ..."
"ওতেই হবে। একটা কাজ করতে পারবেন?"
"কিন্তু আমি তো নিজের জন্য এসেছি, তার কী হবে?"
"সব হবে, সব হবে। আপনি আমাদের একটু উদ্ধার করে দিন।" আচার্যিবাবুর সুর হঠাৎ নরম হয়ে গেছে।
"তা কী করতে হবে?"
"ঘুঘু দেখতে হবে।"
"মানে?"
"বলছি। এখানে ওই দিঘিটার ধারে শালবনের কাছে গেলে দেখবেন একটা চাতাল মতো আছে, অনেক দিন আগে বাড়িটাড়ি ছিল – তার উঠোন হতে পারে। এখন সে ভিটেতে ঘুঘু চরে। এই ঘুঘুরা ঠিক সাধারণ ঘুঘু নয়, এরা বুটিদার ঘুঘু।"
শ্যামবাবুর মনে হতে লাগলো, এ কোথায় এলাম রে বাবা। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কেটে পড়তে হবে। টাকা আগাম দেওয়া হয়ে গেছে, সেটা কি আর ফেরৎ দেবে ...
"হ্যাঁ, সকালে বা বিকেলে বা দুবেলাই যাবেন। পাখিগুলো লক্ষ করবেন আর যত পারেন ছবি তুলবেন। না, না ফোনের ছবি চলবে না। একটা এস-এল-আর টেলি লেন্স লাগানো ক্যামেরা দেব। আসলে ওই যে ... প্রফেসর কী যেন ..."
একটি ছেলে ধরিয়ে দিল, "কার্লসন"
"হ্যাঁ, সুইডেন থেকে আসবেন। পক্ষী-বিশারদ। এখন তাঁর আগ্রহ ভারতীয় ঘুঘুদের ওপর।"
"কিন্তু এত ছবি তুলে কী হবে?"
"এই, চা আনা তো, বকে বকে আমার গলা শুকিয়ে গেল। সেই ভদ্রলোককে ব্যাপারটা অত করে বোঝালাম, তিনি তো অজুহাত দিয়ে কেটে পড়লেন।"
চা না আসা অবধি শ্যামবাবু ভাবতে লাগলেন কী করে এই পাগলের আড্ডা থেকে পালানো যাবে।
চা আসতে আচার্যিবাবু বললেন "ব্যাঙ্কের কাউন্টারের সামনে মুনিঋষিদের মতো 'সো অহম' অর্থাৎ আমিই ঈশ্বর, বলে হুঙ্কার দিলে কি ওরা আপনার অ্যাকাউন্ট খুলবে?
"বলবে আধার কার্ড এনেছেন? কেন বলবে জানেন – বলবে এই কারণে যে আধার কার্ডের ডেটাবেসে আপনার পাঁচ আঙুলের ছাপ আছে। আঙুলের ছাপ দুটো মানুষের কখনো এক হয় না। একটি মানুষের অভ্রান্ত পরিচয়।

“আর বুটিদার ঘুঘুদের পরিচয় সম্ভবত ওদের পাখায় আঁকা বুটির রকমফেরে। মানে ওই বিজ্ঞানী প্রমাণ করতে চাইছেন যে বুটিই ঘুঘুদের আধার কার্ড। কাজটা সহজ নয়, অনেক ছবি তুলতে হবে। তারপর তা বিশ্লেষণ করতে হবে। একটা পাখি তো একই জায়গায় অনেক বার আসতে পারে, তাই না।”
আজ বিকেল থেকে এই এতক্ষণে শ্যামাঞ্জনের একটু যেন আগ্রহ হলো। প্রাণীবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন তো এককালে, এখন অবশ্য কিস্যু মনে নেই।
বললেন, “ঠিক আছে, যখন বলছেন ...”
আচার্যিবাবু গদগদ স্বরে বললেন, “অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসলে আমরা আশ্রমের পক্ষ থেকে কথা দিয়ে ফেলেছিলাম তো ... হ্যাঁ, মনে হয় আপনি কাজটা পারবেন।”

আশ্রমের খাওয়া-দাওয়া বেশ। রাত্তিরে চিকেন স্টুটা বড় ভালো করেছিল। সকালে ব্রেকফাস্টও মন্দ হয়নি। দশটা নাগাদ শ্যাম মিত্র ক্যামেরার ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বেরোলেন। মাথায় হ্যাট, চোখে রোদ চশমা। একটা ছেলে জায়গাটা চিনিয়ে দেবার জন্য সঙ্গে এল, তার পিঠে একটা সরু গোল ফুট তিনেক লম্বা চেন লাগানো ব্যাগ ঝোলানো। ব্যাগে আছে একটি ভাঁজ করা চেয়ার। বেশ এভারেস্ট চড়ার মতো ভঙ্গীতে দুজনে উঁচুনিচু রাস্তা দিয়ে মাইল খানেক হেঁটে পৌঁছে গেলেন। শ্যামাঞ্জনের মনটা খুশি হয়ে উঠল – জায়গাটা দারুণ। হালকা জঙ্গল, এদিক-সেদিকে পলাশ আর শিমুলে অজস্র ফুল ফুটিয়ে ঋতুরাজ মনে হচ্ছে সশরীরে উপস্থিত।

বাঁধানো চাতালটা আগে কোনো একটা বাড়ির অংশ ছিল, সে বাড়ির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, জঙ্গলের ভেতরে ঢুকলে হয়তো হদিস পাওয়া যেতে পারে। আর নয়তো মহাকাল চাতালটা বাদ দিয়ে সবটাই হজম করে নিয়েছেন। ছেলেটা চলে গেল। এখন একটা-দেড়টা অবধি তাঁকে ঘুঘুর সন্ধানে থাকতে হবে। কিছুক্ষণ চেয়ারে বসে, পায়চারি করে, বেসুরো গলায় ‘বসন্ত জাগ্রত দ্বারে ...’ গেয়ে সময় কাটাচ্ছিলেন এমন সময় সাড়ে বারোটা নাগাদ এক জোড়া এসে বসল চাতালে। সন্তর্পণে ক্যামেরা তাক করলেন – দুটোই বুটিদার!

সেই শুরু। পরের দিন বিকেলেও রদ্দুর পড়লে আবার চললেন। কীরকম যেন একটা নেশা লেগে যাচ্ছে মনে হলো। বিকেলে দুজোড়া পাওয়া গেল, তবে ছবিটা জুতসই হলো না। পরের দিন তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোতে যাবেন এমন সময় একটা বুদ্ধি এল। ইস, এতক্ষণ কেন মাথায় আসেনি! আশ্রমের রান্নাঘর থেকে এক মুঠো গম চেয়ে নিলেন। চাতালে খানিকটা ছড়িয়ে দিয়ে সেই ভাঁজ-করা চেয়ারে বসে থাকলেন ক্যামেরা তাক করে।

নাঃ, তেমন কাজ হলো না। এক গাদা চড়ুই, শালিক, দু-তিনটে বুলবুলি এসে সব খুঁটে খেয়ে গেল। দেখতে বেশ লাগছিল কিন্তু বুটিদার ঘুঘুর দেখা নেই। ওরা অত চটপটে পাখি নয় যে তক্ষুণি খবর পেয়ে চলে আসবে।
এল সেই দুপুরের দিকটায়। প্রথমে দুটো তারপর আরেক জোড়া। আজ ছবি খুব ভালো উঠল, পাখিগুলো ধীরেসুস্থে চাতালে পায়চারি করছিল।
সন্ধেবেলা খাওয়ার টেবিলে আশ্রমের সেই ছেলেটি এসে বলল, “স্যার, আপনার ঘরে একটা কলর প্রিন্টার রেখে এলাম। ক্যামেরা থেকে সোজা প্রিন্ট করা যায় ... দেখিয়ে দিচ্ছি।

***

ইতিমধ্যে আশ্রমের হলঘরে দু-তিনটে ক্লাস হয়ে গেছে – ধ্যান এবং আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি, নিরামিষ খাওয়া এবং শিশু-সাহিত্য পাঠের উপকারিতা এইসব। তবে শ্যামবাবুর এতে মন লাগছে না। বুটিদার ঘুঘুর নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছে।

মাঝে একদিন সেই ছেলেটা তাঁর ঘরে এসেছিল। ঘরের দেয়ালে গোটা পঞ্চাশেক বুটিদার ঘুঘু সাঁটা রয়েছে। দেখে ছেলেটি বলল, "বাঃ, স্যার আপনি তো দারুণ ছবি তুলছেন। প্রফেসর সাহেব মনে হয় খুব খুশি হবেন। আচ্ছা, আপনি বুটির নকশাটা আলাদা করতে পারছেন?"

শ্যামবাবু সেই চেষ্টাই করছেন কদিন ধরে। পালকের বুটির নকশায় কিছু বিশেষত্ব বার করেছেন – 'প্যাটার্ন' আলাদা করার সফ্ট-ওয়্যার হলে ভালো হতো। মার্কার পেন দিয়ে ছবিগুলোতে নম্বর দিয়েছেন। একটা নতুন খাতায় পাখিদের বিবরণ কলেজের ল্যাবরেটরী খাতার মতো সুন্দর করে লিখে যাচ্ছেন। পাখি প্রাণিটি ভারি বিচিত্র - এদের সমাজ আছে, প্রেম এমনকি পরকীয়াও আছে।

এই করে বেশ কটা দিন দিব্যি কেটে গেল, এবার তো সেই প্রফেসর কার্লসনের আসার কথা। একদিন সন্ধের দিকে তাঁর খাতা আর কটা বিশেষ বিশেষ ছবি নিয়ে আচার্যিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর নিজের মেয়াদও শেষ হতে চলেছে। প্রথম দিনের মতো আচার্যিবাবাবু খুব ব্যস্ত। তবে আজ শ্যামবাবুকে অতটা তাচ্ছিল্য করলেন না। বললেন "বলুন মিত্রবাবু বলুন .."
"বলছিলাম, উনি কবে আসছেন? আমার তো সামনের সপ্তাহে ফেরার কথা .."
"কে, কার আসার কথা বলছেন?"
একটা ছেলে মনে করিয়ে দিল, "প্রফেসর কার্লসন, স্যার। উনি আরও তিন-চার সপ্তাহ পরে আসবেন মনে হয় ..."
আচার্যিবাবু বললেন, "কাজটা শেষ না করেই চলে যাবেন?"
"এ কাজের কি শেষ আছে, যত করছি ততই মনে হচ্ছে প্রকৃতির কী অদ্ভুত খেলা। এই সাত তারিখ ফিরব ঠিক করেছি।"
আসলে সাত তারিখ না ফিরলেই নয়। পাখি দেখতে চুপিচর যাবেন, এখান থেকেই ঠিক করা হয়ে গেছে। পাখির নেশা ধরেছে তাঁর।

ছ তারিখে শ্যামবাবু খাতা, দুটো বড় খামে ভরা শ-খানেক ছবি নিয়ে আচার্যিবাবুকে বললেন, "রাখুন – যতটুকু পেরেছি করে দিয়ে গেলাম"
"এতগুলো ঘুঘু নিয়ে আমি কী করব?" আচার্যিবাবু কেমন যেন দৃষ্টিতে তাকালেন।
"ওই কার্লসন সাহেবকে দেবেন"
"কাকে! ও নামে আমি কাউকে চিনি না"
"মানে?"
দুজনের জন্য ঠাণ্ডা বুড়বুড়ি কাটা নুন-লেবুর সরবৎ এল। তাতে চুমুক দিয়ে খানিকটা সময় নিয়ে আচার্যিবাবু বিনীত স্বরে বললেন, "খারাপ ব্যাবহার করেছি, মিথ্যে বলে ছবি তুলিয়েছি ... নিজগুণে আমাকে ..."
"মানে সব ভুয়ো! আমাকে ঠকালেন!!"
আচার্যিবাবাবু শান্ত ভাবে বললেন, "বলছি সব বলছি। আচ্ছা জীবনের মানে কী?"

“আমি অতশত বেদ-উপনিষদ পড়িনি” শ্যামবাবু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

“না, না, আমি আপনার নিজের কথা জানতে চাইছি”

“কী আবার। লোকে জন্মায়, কিছু একটা করে তারপর মরে যায়। ব্যাস হয়ে গেল জীবন”

“বাহ, সঠিক বলেছেন। একশো তে একশো। ‘কিছু একটা’ করাই জীবন। নইলে জীবন একটা বোঝা । আপনার ডিপ্রেশন কাটাতে এই ‘কিছু একটা’র ব্যবস্থা করেছিলাম। আপনার পড়াশুনো, ফটো তোলার ছেলেবেলার সখ – সব খবর নিয়ে অনেক ভেবে এই বুটিদার ঘুঘুর পরিকল্পনা। তবে কী জানেন, ওইটুকু তিরিক্ষে ব্যবহার আর নাটকীয়তা না আনলে আপনাকে বিশ্বাস করাতে পারতাম না। এখন দেখছি পাখি দেখার নেশা ধরেছে আপনার ... পাখিরা আপনার মন ভালো রাখবে।”

বাচ্চা ছেলেকে মা গল্প বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে দুধ খাইয়ে দিলে ছেলের যেমন পরে রাগ হয়, শ্যামবাবুও তেমনি মেজাজে বললেন “উফ, কী কাণ্ডটাই না করেছেন!”

“হ্যাঁ, ওই কার্লসন । আমাদের সখের কাজ দেখে বাহবা দিতে ‘কার্লসন’ মানে বিখ্যাত লোকজন বড় একটা আসে না। সে আশায় থাকলে সখের মজা কমে যায়। ‘কিছু একটা’র আনন্দ একান্তই নিজস্ব আনন্দ। এইটুকু যদি বোঝাতে পেরে থাকি তাহলে আমার মিথ্যে বলা সার্থক।”

এতক্ষণে শ্যামবাবুর মেজাজটা নরম হলো। পরপর তিন-চারবার সরবতে চুমুক দিয়ে বললেন, “তা আচার্যিবাবু, আপনি এরকম অদ্ভুত একটা আশ্রম চালাচ্ছেন কেন বলুন তো ...”

হাসতে হাসতে আচার্যিবাবু বললেন “আমাকেও তো ‘কিছু একটা’ করে যেতে হবে মিত্তির মশায়!”

অচিন্ত্য দাস:ছোটদের গল্প দিয়ে লেখালিখির শুরু। পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন ধরনের নিবন্ধ ও গল্প লিখে থাকেন। পঞ্চাশটি স্বল্পদৈর্ঘের ছোটগল্প নিয়ে “তিন পলকের গল্প” নামে একটি বই কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর লেখা নিবন্ধ সংকলন “কথার কথা” এবং একাধিক ছোটদের গল্পের বইও আছে। পেশাগত ভাবে ইস্পাত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং অবসর নেবার পরে জামশেদপুর শহরে বাস করেন।

তোতাপাখির ঐক্য

প্রবন্ধ

তন্ময় কবিরাজ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবিতকালে পরিবার পরিজনদের হারান তবু তাঁর শিল্পকর্ম থামেনি। শিল্পের মধ্যে দিয়ে কবি তাঁর জীবনবোধের কথা উল্লেখ করে গেছেন।

আমির খুসরু সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবিগুরুর কথাই মনে এলো। রবীন্দ্রনাথের মতই কম বয়সে কবিতার হাতেখড়ি। আমির খুসরুর বয়স তখন মাত্র আট বছর। ১২৭১সালে দিদা মারা যায়, ১২৯৮সালে হারান মা ভাইকে। জীবন যখন মোহহীন, মৃত্যু যখন একমাত্র গন্তব্য বলে মনে করছেন তখন গান কবিতাই তাঁকে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়। কবিতা তাই আমির খসরুর কাছে উইলিয়াম সিডনি পটারের শেষ পাতার মিরাকেল। দক্ষ প্রশাসকের পাশাপাশি সাহিত্য দর্শনে তাঁর আবেগ নাড়া দেয় কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীকে। তিনি লিখতে পারেন, যে দেশে ময়ূরের মত পাখি থাকে সে দেশ তো স্বর্গের প্রতিশব্দ। তিনি বলবানের সৈনিক ছিলেন। বলবনের পুত্র বুঘ্র খান তাঁর গান শুনে বুঁদ হয়ে থাকতেন। তাঁর প্রতিভায় তিনি জালালউদ্দিন খলজির কাছ থেকে অর্জন করেন আমারত উপাধি। উল্লেখ্য, গিয়াসউদ্দিন বলবান থেকে মোহাম্মদ বিন তুগলক মোট এগারো জন সুলতানের শাসন তিনি দেখেছেন। পাঁচ জন শাসকের আমলে তিনি ছিলেন সভা কবি।

সময় পরিস্থিতির পরিবর্তন আমির খসরুর চেতন চিন্তনের ভিতর বিবর্তন ঘটায়। মানবিক সত্তার উত্তরণে প্রকট হয় দার্শনিক ভাবনা।তিনি এক অস্থির সময়ে দিল্লী আসেন। এ বিষয়ে তিনি ও রাজা রামমোহন রায় একই সমস্যার সম্মুখীন হন। সতীদাহ প্রথা রোধ করতে গিয়ে বেন্টিংক যেমন বলেছিলেন,"দ্যা ফার্স্ট অবজেক্ট অফ মাই হার্ট ইস বেনিফিট অফ হিন্দুস ", তেমনি মোহাম্মদ হাবির লিখেছিলেন,"ঈশ্বরের প্রেরিত প্রতিষেধকের মত এসেছিলেন অসংখ্য সুফি ও ধর্মপ্রচারক, তাদের জন্যই রাজধানী নরকে পরিণত হয়নি।"

বাগরা খাঁ বাংলা আক্রমণ করলে তিনি তা পছন্দ করেননি।তিনি খাজায় যান শান্তির সন্ধানে। তিনি ছিলেন আরেফ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার ছাত্র।তিনি জীবনের প্রতি বাঁকে দাঁড়িয়েছেন, বুঝেছেন, সত্যের সন্ধান করে এগিয়ে গেছেন জীবনের বাকিটা পথ। তাঁর সাহিত্যে যেমন রাজমহিমা রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্রেমের বিরহ আবার ব্রিটিশ কবি স্পেন্সারের মত রাজ অনুরাগী হয়ে কলম ধরেছেন শুধু রাজার জন্য। আলাউদ্দিন খলজিকে নিয়ে তিনি বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন।

ভারতীয় সঙ্গীতে আরবের সুরের মিশ্রণ ঘটান আমির খসরু। যদিও পিটার হার্ডি, কাওয়েলরা তাঁর লেখার সমালোচনা করেছেন। পিটার হার্ডি মনে করেন, খসরু ইতিহাস বর্ণিত লেখায় আবেগ বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কাওয়েল বলেছেন, আমির খসরুর লেখায় অলংকার বেশি। আসলে,মেঘাস্থিনিসের মতো ভারতের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে খসরু আবেগে হারিয়ে গেছেন। তাই তথ্য অপেক্ষায় তত্ত্বই প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি লিখেছেন,"আমাকে তোমার মাঝে বিলীন করতে পেরেছি বলেই তো, রাজাধিরাজের শুভ আগমন হয়েছে।"

আমির খসরুর ধর্মের মধ্যে ছিল হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের বার্তা। ধর্মের সংকীর্ণতাকে তিনি প্রশয় দেননি, বরং জাতীয়তাবোধের গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন বারবার। তিনি মন্ত্রের মত বিশ্বাস করতেন,"দেশ মহান ধর্ম।"আকবর যে নীতি অনুসরণ করে ভারতকে এক সূত্রে বাঁধতে পেরেছিলেন, আমির খসরুর লেখাতেও সেই চিন্তাই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি নূহ সিপাহী বইতে লিখছেন,"ভারতে খুব বিদ্বান ব্রাহ্মণ রয়েছে তবে তাদের গভীর জ্ঞানের কেউ সুবিধা নেয়নি যে কারনে তারা অন্য দেশে খুব কম পরিচিত।যদিও তারা আমাদের ইসলাম ধর্মের অনুসরণ করে না তবু তাদের ধর্মের অনেক নীতি আমাদের ধর্মের অনুরূপ।"তিনি তাঁর সাহিত্যে উপলব্ধি করেন, সব ধর্মের ঠিকানা এক, পথ শুধু আলাদা। পরধর্মকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। তুলনামূলক গবেষণায় বস্তুনিষ্ট পর্যবেক্ষণে আমির খসরু মানবিক সত্যে উপনীত হন। তাঁর মতবাদে সুফি প্রভাব রয়েছে ব্যাপক। দেভাল রানী ও খিজির খান বইতে তিনি খিজির খান ও গুজরাটের রাজকন্যা দোভাল রানীর মর্মান্তিক প্রেম কাহিনী তুলে ধরেছেন। তিনিই ভারতের তোতা পাখি , তুতি ই হিন্দ।

আমির খসরু পাঁচটি দীর্ঘ কাব্যের মনসবি রচনা করেন _মাতলাউল আনোয়ার, শিরীন খসরু, মজনু লায়লা, আইন ই সিকান্দরি, হাসত বেহাসাত। উল্লেখ্য, এগুলোকে একসাথে পাঞ্জ গঞ্জ বলে।তিনি এসব দীর্ঘ রচনা নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে উৎসর্গ করেন।তিনি ভারতের গণিতের অবদানের কথা যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি তিনি ভাষার ক্ষেত্রেও যত্নবান ছিলেন। আমির খসরু দিল্লির সুলতানদের জন্য ভাষা তৈরি করেন। যার মধ্যে ছিল গান্ধারের মত ঐক্যের সুর। খসরুর ভাষার মিশ্রণে ছিল ফার্সি, আরবী, তুর্কি, সংস্কৃতের সমাহার। তাঁর হিন্ডবি আসলে ব্রজবুলির উপভাষা।

তিনি খুব সুন্দর করে ছন্দ তৈরি করতে পারতেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারণি তাঁর বই তারিখ ই ফিরোজাসাহিতে আমির খসরুর কাব্য প্রতিভার প্রশংসা করেছেন। আমির খসরু সাহিত্যকর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি লেখার প্রেক্ষাপটে দেশ, সমাজ,মানসিকতাকে স্থান দিয়েছেন। ফলে তাঁর লেখা সাহিত্যের পাশাপাশি হয়ে উঠেছে ইতিহাসের দলিল। খাজাই নুল ফুতুহতে তিনি আলাউদ্দিন খলজীর বিজয় গৌরবের কথা বলেছেন। আবেগ ভালবাসার গল্পে উঠে এসেছে ইতিহাস। সময় কথা বলেছে মানবিক রূপে। তাঁর কবিতা নূহ সী পিহরতেও ধরা পড়েছে অতীত। অন্যদিকে, রাজনৈতিক ও সম্পর্কের দ্বন্দ্বের কথা বুনেছেন তাঁর কিরাইন সাদাইন গল্পে, যা শাহাজান পরবর্তী সময়ের মুঘলযুগের পরিবর্তনকে মনে করিয়ে দেয়। লেখক বা কবি হিসেবে আমির খসরু কল্পনার সেভাবে আশ্রয় নেননি। বরং তাঁর সময় ও পরিবর্তনকেই তিনি বেশি যত্ন করে প্রশয় দিয়েছেন লেখায়। তিনি বুঝতে চেয়েছেন, এক ঘটনার অন্তরালে কত কারন লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই হয়তো সমালোচকদের কাছে তিনি অতিরঞ্জিত হয়ে ধরা পড়েছেন। আজিউদ্দিন আমির খসরু সম্পর্কে বলেছিলেন, কালের অন্যান্য কবিদের চেয়ে তোমার দ্বিগুণ জনপ্রিয়তা হবে।

আমির খসরুর সাহিত্যে প্রথম নিদর্শন ১২৭৩সালে তুফাতুস সিগার নামোক গ্রন্থ। বলা বাহুল্য, প্রথম লেখাতেই তিনি তাঁর জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যান। তাঁর দ্বিতীয় সৃষ্টি ওসতুল হায়াত। ১২৮৮সালে তাঁর কিরানুস সদাইন লেখার জন্য তিনি মুলকুস খেতাব অর্জন করেন। তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে উল্লখযোগ্য, খাজাইন আল ফুতুহ, তারিখ ই আলাই। তিনি তাঁর লেখার মধ্যে পেয়েছিলেন শান্তি, "এ কাম সো ডিপ"। এত সুখ, রাজ সম্মান থাকলেও সুফি ধর্মের ভেতর তিনি জানতে চেয়েছেন জীবনের রহস্য। তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কে এম আশরাফ বলেছিলেন, আমির খসরু জ্ঞানের দম্ভ নিয়ে থাকেননি কোনোদিন। বরং দেশ কালের সীমানা পেরিয়ে মানব ঐক্যের কথা বলেছেন, দেশকে আবিষ্কার করেছেন ইতিহাস দেশ থেকে। ইতিহাস তাঁর কাছে ওয়ার্দসওয়ার্থের লুসির মতো দেশকে চিনিয়েছে । তাই আমির খসরু নিজেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থেকে যাবেন চিরকাল।

তথ্যসুত্র : উইকিপিডিয়া, ইন্টারনেট, ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা

তন্ময় কবিরাজ: বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখালিখি করি। ইংরেজিতে গ্র্যাজুয়েট। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রি লাভ করে, বর্তনামে বর্ধমান জেলা আদালতে অ্যাডভোকেট।

অবসরের আড্ডায়

রম্য রচনা

অনুপ কুমার বসাক

অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারী কর্মী মন্ডলবাবু আজকাল বিশেষ কিছু মনে রাখতে পারেন না| অথচ একসময় তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সচিব মর্যাদার পদে থেকে দায়িত্ব সামলেছেন দীর্ঘদিন| চাকরী জীবনে সাক্ষী থেকেছেন রাজ্য রাজনীতিতে উত্থান-পতনের| উত্তরের সংকোশ থেকে দক্ষিণের মাতলা, বহু নদী দিয়ে বয়ে যেতে দেখেছেন পালা পরিবর্তনের জল| এখন আর এসব নিয়ে বিশেষ উৎসাহ পান না|

আজ সকালবেলা গিন্নি বলে উঠলেন ফর্দ লিখে দিয়েছি| যাও, বাজারটা করে নিয়ে এসো| খবরের কাগজের তিন নম্বর পাতায় চোখ রেখেছিলেন মন্ডলবাবু| কাগজটা ভাঁজ করে রেখে গিন্নিকে বললেন থলেটা দাও, বাজারে যাই| ফতুয়া আর পাজামা গলিয়ে মন্ডলবাবু চললেন বাজারের দিকে|

বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা এগোতেই কেউ যেন পেছন থেকে মন্ডলদা বলে ডাকলো মনে হলো| ঘুরে তাকাতেই দেখেন নন্দীবাবু| এই নন্দীবাবুও রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী| দুজনে মিলে চাকুরী জীবনের গল্প করতে করতে হেঁটে চলেছেন বাজারের দিকে|

বাজারের মুখে নেপালের চা দোকান| সকালবেলা যে সকল অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মীরা বাজার করতে আসেন, তাদের একটা গ্রুপ ঠেক তৈরী করেছে নেপালের চা দোকানের পাশেই| একটা সুন্দর নামও আছে এই ঠেকটার- "অবসরের আড্ডায়"|

আজ সকাল থেকে রক্ষিতদার মেজাজটা সপ্তমে| প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স্ক মানুষটা বেশ চড়া মেজাজেই বলে চলেছেন, এই দিনগুলোই বোধহয় দেখার বাকি ছিল| দেখেছিস মিত্র গতকালকের ঘটনা, কিভাবে ছেলে-মেয়েগুলোকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল পুলিশে| ওদের দোষটা কি ছিল? যোগ্য প্রার্থীদের নায্য চাকরীর দাবিতে ওরা অনশন করছিল, আর এটাই ওদের অপরাধ? এখন তো পুলিশ চোরেদেরও এমনভাবে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যায় না|

পাশে থেকে মিত্রদা বলে ওঠে ও দাদা এতো উত্তেজিত হবেন না| আপনার প্রেশার না এমনিতেই হাই| এরমধ্যেই আড্ডাবসরে প্রবেশ করে মন্ডলবাবু ও নন্দীবাবু| রসিক মানুষ নন্দীবাবু ভেতরে ঢুকেই বুঝতে পারেন আজকের আবহাওয়া বেশ গরম| মজা করে বলেন,কি ব্যাপার মিত্রদা মনে হচ্ছে যেন মেঘের আড়ালে থেকেও সূর্যদেব আজ পরিবেশ গরম করে তুলেছেন| রক্ষিতবাবু বলে ওঠেন-এই দেখ নন্দী, বিষয়টা সত্যিই ভীষণ অমানবিক| কেউ শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের সাথে অমন আচরণ করে? ওরা তো একটা ভ্যালিড ইস্যু নিয়ে লড়াই করছে, তাই না? ব্যাপারটা আঁচ করে নন্দীবাবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন সত্যিই দুর্ভাগ্য| এমনিতেই সরকারী অফিসগুলোতে স্থায়ী কর্মচারীদের তুলনায় চুক্তিভিত্তিক কর্মীর সংখ্যা বেশি এখন| এভাবে চললে থাকলে অর্থনীতি বেহাল হতে বাধ্য| পাশে থেকে মন্ডলবাবু বলে ওঠেন আমি ভাবছি অনেক কিছুই তো সময়ের সাথে বিলীন হয়ে গিয়েছে, এবার বোধহয় "অবসরের আড্ডায়"-এর মতো ঠেকগুলোর পালা| চাকরী নেই, অবসরকালীন জীবনও নেই|

এবার যাই আমি, বাজার করে ফিরতে হবে| নচেৎ গিন্নির বচন আছে কপালে| এই বলে তিনি ঠেক থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার আগে বুকপকেটে হাত ঢোকালেন বাজারের ফর্দটি হাতে নেবেন বলে| হঠাৎ বলে উঠলেন এই যা, কেলো করেছে| আমি তো বাজারের ফর্দটাই নিতে ভুলে গিয়েছি নন্দী|

লেখক একজন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বাংলা পত্রিকায় লিখে আসছেন শুধুমাত্র মাতৃভাষার প্রতি টান থেকে।

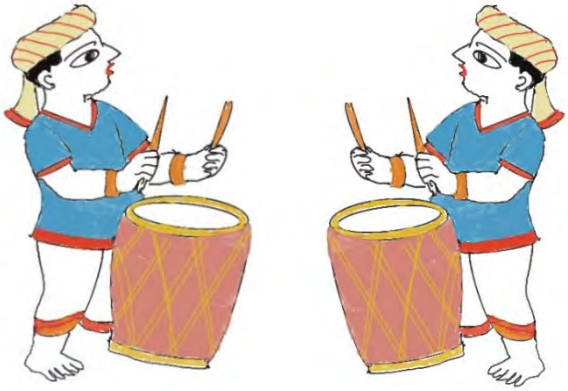

শিবানী ভট্টাচার্য দে

গল্প

ভবঘুরে

গঙ্গাসাগর যাচ্ছিলাম। কলকাতা থেকে কাকদ্বীপ পৌঁছে গাড়ি ছাড়তে হয়েছে। দুপুরে কাকদ্বীপে চারঘণ্টার বিরতি। অপেক্ষা করতে হবে জোয়ারের, জোয়ার এলেই গাঙ্গে বান আসে, তখন বার্জ আসবে, নিয়ে যাবে সাগরদ্বীপের কচুবেড়িয়া, সেখান থেকে লোকাল গাড়ি করে সাগরপারে।

নদীর ধারে বাঁধের উপর সরু পাকা রাস্তা। নদীর দিকে কংক্রিটের পিলার ও রেলিং দিয়ে মোটা তারের জালের বেড়া। বেড়ার ওপারে পাথরের ব্লক বিছানো জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে। একটু দূরেই নদীর পাড়, তারপর বিস্তৃত বালুচর, তারপর জল, তারপর আবার বালুচর, মাঝেমাঝে স্রোতধারা, নদীর ওপারে বাঁদিকে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে গাছপালা আঁকা দিগন্ত। অনেকখানি জায়গায় গাছপালা নেই, সেখানে আকাশ যেন এসে সোজা নদীতে নেমেছে, নদী বোধ হয় ওদিকেই বয়ে গেছে তার ইচ্ছেমত। তারপর ডানদিকে আবার বহুদূরে গাছপালার কালচে সবুজ সীমারেখা নদী ও আকাশকে আলাদা করেছে। জোয়ার এলে এই বালুচর জলের নিচে চলে যাবে, তখন দিকদিগন্ত পর্যন্ত দেখা যাবে জল আর জল। এখন যেহেতু জোয়ার নেই, বালি আর টলটলে জল এই দুপুরের রোদের ভালোবাসায় চিকচিক করছে। দেরি আছে, তাই সঙ্গে আনা একটা ছোট মাদুর পেতে বসে পড়লাম। এরই মধ্যে বেশ লাইন পড়েছে।

রাস্তার দিকে ফিরলাম আমাদের লাইনের লোকেদের দেখতে। আমাদের আগে যারা তারা বেশিরভাগই অবাঙ্গালি, প্রত্যেকের সঙ্গেই বেশ বড় ব্যাগ, স্ট্রলি, বোচকা ইত্যাদি, তাতে রাত্রিবাসের উপকরণ ও শুকনো খাবার, এরা সোজা দূরপাল্লার ট্রেন থেকে নেমে এসে গেছে। আমাদের পরে যে পনেরোজনের দল তারা বারাসত থেকে এসেছে, ট্রেনে শিয়ালদা নেমে সেখান থেকে আবার এদিকের ট্রেন ধরে কাকদ্বীপ নেমেছে। এরাও সাগরে আজ রাতটা থাকবে, কিছু একটা পুণ্য যোগ আছে কাল সকালে, তখন স্নান করে যাবে। বেশির ভাগই মহিলা, অনেকের কপালে বৈষ্ণবীয় তিলক। তাদের তিলক কাটা দাঁড়িওলা দলপতি ‘গোঁসাই’ । এদের সকলের সঙ্গেও বাড়তি লাগেজ, যদিও বেশি বড় নয়। দুপুরবেলা, তাই এদের সঙ্গে নিয়ে আসা দুপুরের খাবার কেন্দ্রীয়ভাবে বিতরণ হবে, তাই সবাই রাস্তার ধারে কাগজ বিছিয়ে বসে পড়েছে। দলের মধ্যে বলাবলি হচ্ছে, এই দলের এক ভদ্রমহিলার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল হারিয়েছে শিয়ালদাতে। উনি ইউটিউবে কীর্তন শুনছিলেন সারা রাস্তা, ভগবানের নাম নিচ্ছিলেন এবং শোনাচ্ছিলেন সবাইকে, তবুও তার এই ক্ষতি হল বলে আফশোস করছিলেন।

এই দলের সঙ্গে একটা ছেলে, রোগামত, বড়জোর এগারো বছরের, পরনে পুরোনো জিন্সের প্যান্ট ও জিন্সের জ্যাকেট। তাকে কেউ কেউ ‘শিব’ বলে ডাকছিল। ছোটখাট প্রশ্ন, টুকরোটুকরো কথোপকথন শুনে মনে হচ্ছিল ছেলেটা এদের কারো নয়। দলের এক মহিলা ছেলেটাকে জিগ্যাস করলেন, তোর বাড়ি কোথায়? সত্যি করে বলতো?
সে বলল, জানিনা। আমি তো স্টেশনে থাকি।
তোর মা-বাবা নেই ?

মা-বাবা আমাকে ছোটবেলায় স্টেশনে ছেড়ে চলে গেছে। সেইথেকে আমি স্টেশনে।
আহা রে বেচারা।
আরেকজন জিগ্যেস করল, খাস কি স্টেশনে? ভিক্ষা করিস ?
হিজড়েদের সঙ্গে নাচি। ওরা আমাকে খাবার দেয়, আরো কত কিছু দেয়। দেখবে?
হিজড়েরা আবার ভাল! আরেকজন মহিলা বলল।

ছেলেটার কাছে একটা ব্যাগ ছিল, ছোট সাইড ব্যাগ । সেটা খুলে সে দুটো কৌটো বের করে আনল, খুলে কয়েকটা চুড়ি বালা হার ইত্যাদি বের করে দেখাল, "দেখ, আমার সোনার গয়না।"

মোবাইল হারানো মহিলা মোবাইলের শোক ক্ষণেকের জন্য ভুলে বললেন, এগুলো সোনা নয়। সোনা হল এগুলো---বলে সোয়েটারের হাতার আড়াল থেকে নিজের হাতের সোনার বালা চুড়ি দেখালেন,---এই যে, এগুলো হল আসল সোনা। তোর ওগুলো গিল্টির ।

ছেলেটা কথাগুলো গায়ে না মেখে শুধু বলল, জানি।

তারপর দেখাল একসেট সস্তা জরির কাজ করা লাল সিন্থেটিক ঘাগরা চোলি ওড়না। এগুলো পরে সে নাচে।

তারপর নিচে থেকে বের করল কয়েকটা ছিদ্রওলা পাতলা কম্বল। বেশ রোদ উঠেছে, মহিলারা কেউ কেউ হাত দিয়ে বা ব্যাগ দিয়ে রোদ আড়াল করছিলেন, তাই কোত্থেকে দুটো কাঠি নিয়ে বেড়ার রেলিঙ্-এর খাঁজে আটকে দিয়ে বেশ একটা ছাউনি করে দিল।

বসবার জন্য ও একটা প্লাস্টিকের শিট বের করেছিল, কিন্তু সেটাতে বোটকা গন্ধ ছাড়ছিল বলে সবাই ওটাকে সরাতে বলল। বেচারা একটু নিরুৎসাহ হয়ে আবার সেটা ভাঁজ করে ব্যাগে ফেরত রাখল। বলল, প্ল্যাটফর্মে ওটাই পেতে সে ঘুমোয়।

এর মধ্যে দলের কেউ একজন এসে এদের খাবার দিয়ে গেল, রুটি আর আলুর শুকনো তরকারি, কাগজের প্লেটে। মোবাইল খোয়ানো মহিলাটি নিজের একটা খালি বোতল ছেলেটার হাতে দিয়ে তাকে অল্পদূরে থাকা নলকূপে পাঠালেন হাত ধোবার জল আনতে।

ছেলেটা বেশ বাধ্য ছেলের মত চলে গেল জল আনতে, সেখানে বেশ ভিড়। যতক্ষণ না ছেলেটা আসছে, নিজের হাতে তার ব্যাগ খুলে একটা একটা করে জিনিষ তুলে দেখলেন, যদি ছেলেটা মোবাইলটা চুরি করে থাকে। কিন্তু না, সেটা পাওয়া গেল না।

ছেলেটা জল নিয়ে চলে এল। যে মহিলা ছেলেটার পরিচয় জিগ্যেস করছিলেন, তিনি তাকে নিজের ভাগ থেকে খাবার দিলেন। ছেলেটা নিজে খেয়ে সবার এঁটো প্লেট নিয়ে ফেলে এল।

ছেলেটা একটু দূরে গেলে আমি এই মহিলাটকে ছেলেটাকে পরিচয় জিগ্যেস করলাম। তিনি বললেন যে ছেলেটি শিয়ালদা থেকে তাঁদের সঙ্গ ধরেছে, তাঁদের কেউ নয়। তিনিই তাকে 'শিব' নাম দিয়েছেন এই একঘণ্টা আগে, কারণ তার নাকি

কোনো নাম নেই, লোকে যা খুশি ডাকে। মহিলাটি তাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। তাঁর কোনো এক বোন, যে বিধবা এবং সন্তানহীন, একা থাকে, সে একটি ছোট ছেলে চাইছে, নিজের ছেলের মত রাখবে। তার কাছে মহিলাটি এই ছেলেটিকে রাখবেন বলে ভাবছেন। কিন্তু ছেলেটা কোনো বাড়িতে থাকতে রাজি নয়।

ছেলেটি ফিরে এলে তাকে আবার বললেন, গঙ্গাসাগর থেকে ফিরে কোথায় যাবি?

কেন, শিয়ালদা।

আমার সঙ্গে যাবি না? এত করে বলছি।

না, আমি যদি যাইও পরের দিনই পালিয়ে আসব। আমার বাড়িতে থাকতে ভাল লাগেনা।

একটু পরে আবার বলল, আমি তোমাদের মত কত লোকেদের সঙ্গ ধরে কোথায় কোথায় গেছি, জানো? কামাখ্যা গেছি, পুরী গেছি, নবদ্বীপ গেছি। আরো কত জায়গায় ঘুরে এসেছি।

লোকে তোকে নিয়ে যায়?

নিয়ে যাবে কেন? আমিই সঙ্গে সঙ্গে যাই। গান গাই, শুনে কেউ পয়সা দেয়, কেউ খাবার দেয়।

তোকে টিটি ধরে না?

না, আমি তো বাথরুমের ধারে শুয়ে থাকি। নামিয়ে দেয়নি। আমি তো গাননাচ করি, ওরা আমাকে চেনে।

ছেলেটা উঠল। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কোমর দুলিয়ে নাচের ভঙ্গীতে হাঁটতে লাগল, এদিক থেকে ওদিকে, আবার ওদিক থেকে এদিকে।

ছেলেটা যাবে না তাহলে তোমার সঙ্গে। দলের আরেকজন মহিলা বললেন।

যেতে চাইছে না। কি খারাপ লাগে বলো, এইটুকু একটা ছেলে, তার মা-বাপ ছেড়ে গেছে, খাবার দেবার কেউ নেই।

খানিক বাদে আবার ছেলেটা এসে দলের কাছে বসল। মোবাইল-হারানো মহিলাটির সন্দেহ যাচ্ছে না। তিনি আবার তাকে বললেন, তোর জানাশোনা তো কত দাদা স্টেশনে থাকে। তাদের কেউ পিছু লেগে মোবাইলটা নিয়ে যায় নি তো?

ছেলেটা একটু হাসল। বলল, সে আমি কি করে বলব? ওরা কি আমাকে বলে চুরি করবে?

না, তুই হয়তো মোবাইলটা দেখিয়ে দিয়েছিস, তারপর সে পিছুপিছু এসে নিয়ে গেছে।

অন্য মহিলাটির বোধ হয় ছেলেটাকে সন্দেহ করে সোজাসুজি এইসব কথা বলাতে একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। বলল, দেখলেই তো, ওর ব্যাগে মোবাইল নেই।

নিলে কি আর সামনে রাখবে। তুমি ওকে বাড়ি নিয়ে যাবে বলছ, এরকম উটকো ছেলে নিয়ে কতজন বিপদে ঠেকেছে, ডাকাত বাড়ি লুট করে পালিয়েছে।

না, ও তো যেতেই চাইছে না, সেরকম হলে যেতে চাইত।

ছেলেটা এখন চুপ করে শুনছিল। মহিলাটি তার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছেন

তিনটা বেজে গেছে। জোয়ার এসে গেছে। বালুচর ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। একটু পর দূরে বার্জ দেখা দিল। টিকিট দেওয়া শুরু হল লাইনেই, আমরা উঠে আস্তে আস্তে নিজেদের জিনিষপত্র সামলে সামনে এগোতে থাকলাম।

পেছনে ফিরে দেখলাম, লাইনের শেষ দেখা যাচ্ছে না। তবে দেখতে পেলাম ছেলেটিকে, তাকে যে মহিলাটি ‘শিব’ নাম দিয়েছে, তার পাশে দলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, সকলের মত কচুবেড়িয়ায় নামবে নিশ্চয়। কয়েক মিনিট পর আবার পেছনে তাকালাম, ভিড় বেড়ে গেছে, কিছুটা বিশৃঙ্খল, এখন অবশ্য তাকে দেখা গেল না। এবার কোনোদিকে না তাকিয়ে সামনে চলতে হবে। এই ভিড়ে যে কেউ ছিটকে যেতে পারে। তারপর কে জানে ছেলেটা কোথায় যাবে, না কি আরো কোনো দলের সাথি হবে, সেখান থেকে আর কোথাও, কাঁধে তার ছোট সাইডব্যাগ, বন্ধনহীন ভবঘুরে, অনাদরের অবিশ্বাসের তিলক কপালে এগারো বছর।

শিবানী ভট্টাচার্য দে: আসামের বরাক উপত্যকায় জন্ম। ইংরাজিতে এম এ। বহুবছর অরুণাচল প্রদেশে শিক্ষকতা করেছেন। বর্তমানে কলকাতায় বাস করেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কবিতা, গল্প, রম্যরচনা, প্রবন্ধ লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থ দুটো, একটি উপন্যাসিকা 'ভাটি গাঙের নাইয়া', অনূদিত উপন্যাস 'আয়স কাল'।

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার শোভাযাত্রার ইতিকথা

প্রবন্ধ

অনির্বাণ সাহা

ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার সরস্বতী নদীর পূর্বে ও ভাগীরথী নদীর পশ্চিমে অর্থাৎ সরস্বতী ভাগীরথীর মধ্যভাগে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী ও ইতিহাস সমৃদ্ধ এক শহর । যার নাম চন্দননগর । মনে করা হয় ভাগীরথী বা গঙ্গার চাঁদের মত বাঁক দেখেই ফরাসিরা এই শহরের নাম রাখেন চন্দননগর । এই শহরের ইতিহাস বহু প্রাচীনকাল থেকেই যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল । বহু শক্তি এই শহরে তাদের শাসনকালে আধিপত্য চালিয়েছে । শেষ পর্যন্ত এই শহর ফরাসিদের অধীনে ছিল দীর্ঘ বছর । শুধু তাই নয় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এই শহরের ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য্য । নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরণধন্য এই শহরের সুসন্তান ছিলেন মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু, শহীদ কানাইলাল দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ । ফরাসিদের অধীনে থাকাকালিন সময়ে ফরাসিদের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির মধ্যেও চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা ছিল বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ও উল্লেখ্য ।

চন্দননগর শহরে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলনের বা প্রবক্তার সঠিক তথ্য আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে পাওয়া যায় না । বিভিন্ন জায়গায় বা লেখায় যা পাওয়া যায় তা কিছুটা গৃহীত সত্য এবং কিছুটা লোকমুখে প্রচলিত কাহিনী । এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জগদ্ধাত্রী পূজার তিথি এবং প্রচলনের পুঁথিগত প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নলিখিত বেশ কিছু গ্রন্থে

১) চতুর্দশ শতকে মহোমহোপাধ্যায় শূলপাণি লিখিত "ব্রতকালবিবেক" গ্রন্থে,
২) পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বৃহস্পতি রায় মুকুটের লিখিত "স্মৃতিরত্ন হার" গ্রন্থে,
৩) শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি কর্তৃক রচিত "কৃত্যন্তত্ত্বার্নব" গ্রন্থে ।
এই সকল তথ্য পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণনগরের রাজা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭২৮-১৭৮১) সময়কালের প্রায় ৪০০ বছর আগেও বাংলার বুকে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন ছিল । অন্তরা মুখার্জি কর্তৃক সংকলিত "Chandernagore mon amour : The Citadel of the Moon" নামক বইটিতে প্রকাশিত পূর্বা চ্যাটার্জীর লেখা "জগদ্ধাত্রী পূজা : ঔপনিবেশিক পুরাণকথা" শীর্ষক প্রবন্ধটি থেকে জানা যায়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্চম উত্তরপুরুষ মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের (১৮১৯-১৮৫৭) সময়কার কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির দেওয়ান তথা বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় (১৮২০-১৮৮৫) কর্তৃক রচিত "ক্ষিতিশ বংশাবলী চরিত" (১৮৭৫) গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন : "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পূজা প্রচলন করেন" । এখান থেকেই ভুল সূত্রপাত ঘটে বোঝাবুঝির ।

কারণ পূর্বের তথ্যগুলি পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পূজার পুনঃপ্রচলন ঘটানো হয় ১৭৬২ সালে । প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী চন্দননগরে শহরের জগদ্ধাত্রী পূজার প্রবক্তা হলেন তৎকালীন ফরাসিদের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী । কিন্তু কিছু তথ্য বিচার বিবেচনা করলে এই কাহিনীর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায় । কারণ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মারা যান ১৭৫৬ সালে । ড: বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত "জগদ্ধাত্রী পূজা ও চন্দননগর প্রসঙ্গ" বইটি থেকে ও ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর দাদা রাজারাম চৌধুরীর বংশের বর্তমান

পুত্রবধূ শ্রীমতি মাধুরী চৌধুরীর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই শহরে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন 1762 সালে । তাহলে একজন মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুর 6 বছর পর কি করে একটি শহরের পূজার প্রচলন করতে পারেন ? এই প্রশ্নটা আজও রয়ে গেছে । আবার ড: বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত "জগদ্ধাত্রী পূজা ও চন্দননগর প্রসঙ্গ" বইটি থেকে জানা যায়, কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এক দেওয়ান দাতারাম সুর চন্দননগরের অন্তর্গত গৌরহাটি অঞ্চলে তার বিধবা কন্যার বাড়িতে প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজার আয়োজন করেন 1762 সালে । যা ছিল চন্দননগরের প্রথম পারিবারিক জগদ্ধাত্রী পূজা । আবার চন্দননগরের চাউল পট্টি অঞ্চলে প্রচলিত তথ্য অনুযায়ী জানতে পারা যায় যে, এই অঞ্চলের তৎকালীন চালের ব্যবসায়ীরাই (কিছুজনের মতে কৃষ্ণনগরের চাল ব্যবসায়ীরা একবার জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় কৃষ্ণনগরে ফিরতে না পেরে এখানকার ফরাসি সরকারের অনুমতি নিয়ে চাউলপট্টিতে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেন) এখানে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেন । আবার চন্দননগরের "আদি মা" হিসেবে খ্যাত চাউলপট্টি জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি তাদের পূজার বর্ষ 300 বছর বলে উল্লেখ করেন, যার অর্থ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর অনেক আগেই চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন হয়েছে । যে তথ্যটিও সঠিক নয় । তাহলে উপরিউক্ত আলোচনাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার প্রবক্তা ইন্দ্রনারায়ন চৌধুরী নয় । বরং কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এক দেওয়ান দাতারাম সুর এবং চন্দননগর শহরের জগদ্ধাত্রী পূজার বয়স ২৫৯ বছর ।

চন্দননগর শহরের এক ইতিহাস অনুসন্ধানী অভিজিৎ সিংহ রায়ের মহাশয়ের লেখা একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, James Darmesteter নামক এক ফরাসি লেখক তাঁর বইতে আঠারো শতকের আশির দশকে উল্লেখ করেন যে, এই শহরে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তৈরি করতে মোট 11 টাকা এবং এই বিশাল আকার মূর্তিকে অলংকার দিয়ে সুসজ্জিত করতে মোট 110 টাকা খরচ হতো । যা তৎকালীন সময়ে যথেষ্ট ব্যয়বহুল বলেই মনে করা হতো । বর্তমানে এই খরচ প্রায় সহস্রাধিক ।

এই শহরে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন নিয়ে যতই বিতর্ক থাকুক না কেন এই শহরের জগদ্ধাত্রী পূজার শোভাযাত্রা আজ বিশ্ববন্দিত ও সারা বিশ্বের কাছে এক আলোচিত ঘটনা । এই শোভা যাত্রার ইতিহাসও যথেষ্ট সমৃদ্ধ । অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান যে, চন্দননগর শহরের জগদ্ধাত্রী পূজার নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা শুরু হয় মোটামুটি ১৮ শতকের মধ্যভাগে বা তার কিছু আগে । ১৮৫৪ সালে রেলপথ চালু হওয়ার পর এই শহরের জগদ্ধাত্রী পূজা এবং নিরঞ্জন শোভাযাত্রা দেখতে বাইরে থেকে বহু মানুষ আসতো । ফলস্বরূপ এই শহরের জগদ্ধাত্রী পূজার সমৃদ্ধি ও জৌলুস অনেক বেড়ে যায় । জনসমাগম বেশি হওয়ার সাথে সাথে পূজাকে কেন্দ্র করে শহরের বিভিন্ন স্থানে ওই চার দিনের জন্য গড়ে উঠতে থাকে ছোট-বড় বিভিন্ন স্টল । অর্থনৈতিকভাবে শহরের পূজা কমিটিগুলি কিছুটা হলেও লাভবান হতে থাকে । যার প্রভাব ধীরে ধীরে প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রাতেও প্রতিফলিত হতে শুরু করে ।

"চন্দননগর হেরিটেজের" ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত কল্যাণ চক্রবর্তী মহাশয়ের থেকে জানা যায় যে, এই শহরে জগদ্ধাত্রীর শোভাযাত্রা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কিছু আগে, যার অর্থ ১৯০০-১৯০৫ সালের তার জৌলুস বিশেষভাবে প্রতিফলিত করে । তৎকালীন সময়ে সারা শহরে পুজোর সংখ্যাও ছিল সীমিত তার মধ্যে আরও সীমিত সংখ্যক পূজা কমিটি এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করত । সেই সময় জগদ্ধাত্রী মায়ের মৃন্ময়ী প্রতিমাকে কাঁধে করে সারা শহর ঘোরানো হত । জগদ্ধাত্রী মায়ের মৃন্ময়ী প্রতিমাকে কাঁধে বহন করার জন্য বাহকরা আসত গঙ্গার ওপার থেকে । এই বাহকরা মূলত জুটমিল বা ইটভাটার শ্রমিক বা মুন্ডা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ হতো । তবে দিন অতিবাহিত হবার সাথে সাথে সরাসরি কাঁধে নেওয়ার

পরিবর্তে আসে বাঁশের খাঁচা । এই সময় পর্যন্ত এই শোভাযাত্রার দিন প্রতিমা নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করার সময় রাস্তার দু'ধারে বা বাড়ির ছাদে মহিলারা ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো । "চন্দননগর হেরিটেজের" ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত কল্যাণ চক্রবর্তী মহাশয়ের থেকে জানা গেল তৎকালীন সময়ে কাঁধে করে বা বাঁশের খাঁচা করে প্রতিমাকে শহর প্রদক্ষিণ করানোর সময় বাহকরা "ভেলে লেগে যা ... ভেলে লেগে যা ..." বলে আওয়াজ করত । আর সেই আওয়াজ শোনা মাত্র ফুল ছড়িয়ে মাকে বরণ করা হতো । সেই ফুল ছড়িয়ে পড়ে রাস্তাগুলো হয়ে উঠত পুষ্পরঞ্জিত ।

সে দৃশ্য এক নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আবির্ভাব ঘটাত । আবার অনেকে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়া ফুল মায়ের আশীর্বাদ স্বরূপ নিজেরা সংগ্রহ করে সারা বছর বাড়িতে রেখে দিত । তারও পরবর্তী সময় ট্রলি এবং বর্তমানে বড় বড় লরি করে জগদ্ধাত্রী মায়ের মৃন্ময়ী প্রতিমা সারারাত ধরে শহর প্রদক্ষিণ করেন ।

শোভাযাত্রার প্রাথমিক পর্বে রাতের এই শোভাযাত্রায় আলোর অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে পিতলের গামলায় ঘুঁটের আগুন জ্বালিয়ে সেগুলি মাথায় বা হাতে করে প্রতিমার সামনে সামনে সারিবদ্ধ ভাবে যাওয়া হতো । দিন পরিবর্তনের সাথে সাথে বাঁশের মাথায় কাপড় লাগিয়ে কেরোসিনে ভিজিয়ে মশালের মত করে জ্বালিয়ে শোভাযাত্রায় আলোর ব্যবহার করা হতো । এই মশাল মূলত তৎকালীন জমিদারদের পাইকদের হাতে ও কাঁধে থাকতো, তারাই সারারাত প্রতিমার সাথে শহর প্রদক্ষিণ করত এই মশাল হাতে ও কাঁধে নিয়ে । মশালের আলোর পরে শোভাযাত্রায় আলোর অভাব পূরণ করতে ব্যবহার করা হতো পেট্রোম্যাক্স আর তার পরবর্তী সময়ে অ্যাসিটিলিন গ্যাস ও ডেলাইটের আলো ।

তবে এই শোভাযাত্রায় এই দুই ধরনের আলোর ব্যবহার খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি । অ্যাসিটিলিন ও ডেলাইটের আলো ম্রিয়মান হয়ে এলে শোভাযাত্রার আলোকসজ্জায় প্রচলন ঘটে হ্যাজাকের । এই হ্যাজাক বাহকরাও শুধুমাত্র এই অনুষ্ঠানের জন্য উড়িষ্যা থেকে আসতো কিছু পয়সা উপার্জনের জন্য । সেই যুগের শোভাযাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার মিত্র লিখেছেন : "সন্ধ্যার পর গ্যাসের আলোয় সজ্জিত হইয়া প্রতিমাগুলি স্ট্র্যান্ড রোডের বারদোয়ারীতলায় সমবেত হইত এবং বাহকেরা নিজ নিজ প্রতিমাগুলি ঘুরাইত এবং নাচাইত" ।

সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে এই শহরের জগদ্ধাত্রী পূজার শোভাযাত্রার আলোকসজ্জাও পরিবর্তিত হতে শুরু করে । চন্দননগর শহরে বিদ্যুতের প্রচলন হয় ১৯২৪ সালে । আর জগদ্ধাত্রী পুজোর মন্ডপে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার শুরু হয় ১৯৩৯ সালে । তারই সূত্র ধরে ১৯৪৮ সালের জগদ্ধাত্রী পূজার শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত হয় বৈদ্যুতিক টিউবের আলো । এই টিউবগুলো মূলত হত হল্যান্ড ফিলিপসের টিউব যা তৎকালীন সময় যথেষ্ট মূল্যবান । প্রাথমিক পর্বে টিউবগুলিকে হাতে বা কাঁধে বহন করা হলেও খুব অল্পদিনের মধ্যেই বাঁশের খাঁচা করে শোভাযাত্রায় ব্যবহার করা হতো । সেই সময় শোভাযাত্রায় প্রতিমাকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো ২০০ওয়াটের ল্যাম্প । তাতে জড়ানো থাকতো রঙিন কাগজ । এই রঙিন আলো শোভাযাত্রায় মাতৃ প্রতিমাকে করে তুলত অপরূপা ।

অনেক সময় শুধু প্রতিমাই নয় শোভাযাত্রায় আলোকসজ্জার জন্য বাহকদের হাতে থাকতো এই ল্যাম্প । তৎকালীন সময়ে এই টিউব এবং ল্যাম্পের বৈদ্যুতিক সংযোগ ঘটাতেন শহরের আলোক শিল্পীরা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রভাষ কুন্ডু, দেবেন সরকার, শ্রীধর দাস, বাবু পাল প্রমূখ । কয়েক দশক কেটে যাওয়ার পর ১৯৭৮-৮০ থেকে শুরু হয় 6.2 টুনি বাল্বের কাজ । চন্দননগরের চারমন্দিরতলা জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি শহরের বুকে প্রথম 6.2টুনি বাল্বের কাজ শোভাযাত্রায় প্রচলন করে । তখন ট্রলিতে বা লরিতে বাঁশের খাঁচা করে 6.2 টুনি বাল্ব দিয়ে সাজানো হতো । এছাড়াও নির্দিষ্ট স্ট্রাকচারে টুনি বাল্বগুলো সারিবদ্ধ ভাবে লাগিয়ে শোভাযাত্রায় প্রতিমার সামনে নিয়ে যাওয়া হতো । এই টুনি বাল্বের

আলো হতো সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল । যা বহু মানুষকে শোভাযাত্রার প্রতি আরও বেশি করে আকর্ষিত করেছে । কিন্তু এই টুনি বাল্ব জ্বলার সময় খুব বেশি উত্তপ্ত হত ও তাপ বিকিরিত করত ফলস্বরুপ এই বাল্বের খুব কাছাকাছি যাওয়া যেত না । ঠিক দুই দশক পর ২০০৩ সালে ব্যাটারি চালিত এল.ই.ডি. আলো পুনরায় সেই চারমন্দিরতলা জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি কর্তৃক জগদ্ধাত্রী পূজার শোভাযাত্রা প্রথম ব্যবহৃত হয় । আলোকসজ্জার এই মিনিয়েচার কলাকৌশল এই শহরের নিজস্ব সম্পদ । বর্তমানে এল.ই.ডি.-এর মাধ্যমে জগদ্ধাত্রী পূজার চারদিনের আলোকসজ্জায় এবং শোভাযাত্রায় সারাবছরের দেশী-বিদেশী বেশকিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীকে প্রদর্শন করা হয় ।

চন্দননগর ও পার্শ্ববর্তী চুঁচুড়া শহর বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিল । তারই সূত্র ধরে এই সংস্কৃতির বেশ কিছুটা প্রভাব জগদ্ধাত্রী পুজোর নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় পড়েছিল । শুধুমাত্র আলোকসজ্জায় নয় এই শোভাযাত্রায় বিভিন্ন রকমের সঙও থাকতো মানুষের মনোরঞ্জন ও শোভাযাত্রার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য । তৎকালীন সময়ে সঙশিল্পীরা বিভিন্ন সাজে নিজেদের সজ্জিত করে সারারাত প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় তাদের কলাকৌশল প্রদর্শন করত । এইসময়ে এই সঙ-এর মাধ্যমে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী, আঞ্চলিক কাহিনী, সাময়িক কিছু ঘটনা উঠে আসত মানুষের সামনে যা তৎকালীন সময়ে শোভাযাত্রার এক নিরবিচ্ছিন্ন অংশ ছিল । এই সঙশিল্প তৎকালীন সময়ে চুঁচুড়া শহরের বিখ্যাত ছিল । মূলত এই শহর থেকে সঙশিল্পীরা তাদের কলা-কৌশল প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রতিমা নিরঞ্জনের সময়ে আসত । দিন পরিবর্তনের সাথে সাথে এই সঙশিল্প এবং শোভাযাত্রায় এই সঙ প্রদর্শন ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে, অবশেষে প্রায় বিলুপ্ত হয় ।

জগদ্ধাত্রী পূজার শোভাযাত্রায় আলোকসজ্জা এবং সঙশিল্পের সাথে থাকতো ঢাকের বাদ্যি, কীর্তন ও ধুনুচি নাচ । ঢাকের গগন বিদারী তীব্র আওয়াজে সারা শহর সারারাত জাগত প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রার উদ্দেশ্যে । সারারাত জাগত মাকে শেষ বারের জন্য বিদায় জানানোর জন্য । নিজ নিজ প্রতিমার সামনে সারিবদ্ধ ভাবে প্রতিটি দল থাকত এবং নিজেদের কলা-কৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে শোভাযাত্রাকে এক আলাদা উচ্চতায় তুলে নিয়ে যেত । পুরনো সৌন্দর্যকে ও রীতিনীতিকে ফিরিয়ে এনে বর্তমানেও বেশকিছু পুজো কমিটি তাদের জগদ্ধাত্রী পূজার নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় সঙ এবং কীর্তনের ব্যবহার করেন । জগদ্ধাত্রী পূজা বারোয়ারিগুলি বর্তমানেও শোভাযাত্রায় ঢাকের ব্যবহার করে থাকে, এছাড়াও অনেকে ক্লাবব্যান্ডের ব্যবহার করে থাকে ।

আরো একটি তথ্য না বললে শোভাযাত্রার ইতিকথা অসম্পূর্ণ থেকে যায় । সেটি হল প্রাথমিক পর্বে চন্দননগর শহরের গুটিকয়েক বারোয়ারিই এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করত । চন্দননগর শহরের ক্ষেত্রসমীক্ষক এবং শান্তিনিকেতনের আদলে এই শহরের বুকে "বসন্ত উৎসবের" প্রণেতা শ্রীযুক্ত অজিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের থেকে জানা যায় যে, সেই সময়কার শোভাযাত্রা তালডাঙ্গা অঞ্চল থেকে জি টি রোড দিয়ে বর্তমানের লিচুতলা অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । কিন্তু জি টি রোড থেকে লিচুতলা ও বেশোহাটা মুখের মোড়টি খুবই সংকীর্ণ হওয়ায়, আলো এবং প্রতিমা নিয়ে ঘুরতে খুবই অসুবিধা হতো । সেই কারণে আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর পূর্বে "চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পূজা কেন্দ্রীয় কমিটির" সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে এই শোভাযাত্রার পথ কিছুটা দীর্ঘায়িত হয় । লিচুতলার পরিবর্তে বারোয়ারীগুলি তাদের আলোকসজ্জা ও প্রতিমা নিয়ে জি টি রোড থেকে জ্যোতির মোড় দিয়ে ঘুরে কবি ভারতচন্দ্র রাস্তা দিয়ে তালডাঙ্গার দিকে এগোতে থাকে ।

এই শহরের বুকে প্রথমে বারোয়ারি পুজো গড়ে উঠেছে তার নিজস্ব ছন্দে । প্রথমে চন্দননগরের চাউলপটি ও তার অনেক পরে ভদ্রেশ্বরের তেঁতুলতলা ইত্যাদি পুজোগুলিকে কেন্দ্র করে বড় বড় মূর্তির প্রচলন শুরু হয়, পরবর্তীতে

সুসজ্জিত প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হয় । তৎকালীন সময়ে এই শোভাযাত্রা ছিল বিচ্ছিন্ন । রেললাইন চালু হওয়ার পর বাইরে থেকে আগত দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । তেমনি শোভাযাত্রায় এক সক্রিয় অংশ বাইরে থেকে আসতে শুরু করে কিছু রোজগারের আশায় । অনেকে আবার আসেন তাদের বিভিন্ন প্রসার ও প্রচারের জন্য । ফলস্বরূপ বারোয়ারীগুলির মধ্যেও ধীরে ধীরে একটা প্রতিযোগীতার ভাব লক্ষ্য করা যায় । যা শোভাযাত্রার জৌলুসকে প্রভাবিত করে । জগদ্ধাত্রীর শহর চন্দননগরের এই শোভাযাত্রা একটা চলমান মেলার রূপ নেয় । শোভাযাত্রার আলোর বিবর্তন হয় । অন্যান্য বিষয়বস্তুর মধ্যে বাজনা, সঙ সহ বেশকিছু রীতিনীতিরও পরিবর্তন ঘটে । ফলস্বরূপ শোভাযাত্রার রূপ পালটে যায়, বদলে যায় বিষয় । ঐতিহ্যের সাথে মেলবন্ধন ঘটে আধুনিকতার ।

চন্দননগরের এই ঐতিহ্যমণ্ডিত জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯৫৬ সালে গড়ে ওঠে "চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পূজা কেন্দ্রীয় কমিটি" । চন্দননগর স্বাধীন হবার পর বারোয়ারি পুজোর সঙ্গে শোভাযাত্রাও একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আসে কেন্দ্রীয় কমিটির সমবেত উদ্যোগের ফলে। প্রারম্ভিক পর্বে চন্দননগর থেকে ১৮টি এবং পার্শ্ববর্তী ভদ্রেশ্বর থেকে ৪টি পূজা কমিটি এই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিল । বর্তমানে ১৭১টি পূজা কমিটি সদস্যপদ গ্রহণ করেছে । বর্তমানে এই কেন্দ্রীয় কমিটির সুপরিকল্পনায় ও পরিচালনায় চারদিন ধরে শহরের বুকে দেবী হৈমন্তীকার আরাধনা ও নিরঞ্জন শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় ।

অনির্বাণ সাহা : ক্ষেত্র সমীক্ষক ও প্রাবন্ধিক

তথ্যসূত্র :

-- জগদ্ধাত্রী পূজা ও চন্দননগর প্রসঙ্গ - অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

-- চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী - কল্যাণ চক্রবর্তী ও লিপিকা ঘোষ ।

-- Chandernagore mon amour : The Citadel of the Moon" - Edited by Antara Mukherjee.

-- চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির ৬৬-তম বর্ষের একটি ক্রোড়পত্র ।

-- চন্দননগর শহরের এক ইতিহাস অনুসন্ধানী শ্রীযুক্ত অভিজিৎ সিংহ রায় মহাশয়ের একটি প্রতিবেদন ।

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা

গল্প

সংযুক্তা মহলানবীশ

১ দুপুরবেলা, জানালার ধারে চুপটি করে বসেছিল ছোট্ট রাই। বসে বসে বাইরেটা দেখছিল মন দিয়ে। ওদের বাড়ির সামনে খানিকটা খোলা জমি, ঘাসে ছাওয়া। ওপারে রাস্তা। দুপুরের রোদ চিকচিক করছে ল্যাম্পপোস্টের মাথায়। তারে বসে চেরা- লেজ কালো ফিঙে লেজ নাচাচ্ছে মনের সুখে। দেখে মনটা উদাস হয়ে গেল ওর। বেশি তো নয়, তিন মাস আগের কথা, স্কুল থেকে একা একা বাড়ি ফেরার পথে একটা গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গিয়েছিল ও। জ্ঞান যখন ফিরলো, তখন ও হাসপাতালের বেডে। ওর পা দুটো সেই থেকেই অবশ। পায়ে কোনো সাড়ই নেই। ডাক্তারকাকা অবশ্য বলেছে, ফিজিওথেরাপি করালে সেরে যেতে পারে । কিন্তু মায়ের অত টাকা নেই তো! তাই এখন আর ও স্কুলে যেতে পারে না। বাড়িতে অনলাইনে পড়াশোনা করে। পড়াশোনায় পিউ বরাবর ভালো। স্কুলে থাকলে আগামী মাস থেকে ও ক্লাস সিক্সের রুমে গিয়ে বসতে পারতো! অনলাইনে পড়াশোনা যতোই ভালো হোক, আনন্দ তেমন হয় না। বড় একা লাগে, বন্ধুদের সঙ্গে একসঙ্গে আনন্দ করে পড়াশোনার মজাই আলাদা।

ও থাকে ওর মা আর দীপালি মাসির সঙ্গে, বাবা নেই ওর। ওর জন্যই এখন মা কষ্ট করে হলেও মাসিকে রেখেছে। বাড়িতে ও এখন একাই জেগে আছে। দীপালি মাসি ঘুমিয়ে আছে। মাসি কোনোদিনই দুপুরে জেগে থাকে না ; বরং এই সময়ে মাসির ঘুম আরো গভীর হয়। এই সময়টাতে জানালার বাইরের ঐ দুপুরটাকেও নিজের মতোই একা বলে মনে হয়। মনে মনে বেশ কল্পনা করে রাই, দুপুরটাও ওর মতো, কোথাও যেতে পারে না, কেবল জানালার বাইরে চুপটি করে বসে থাকে রোজ। বড্ড একা, আর হু হু করা দুপুর। আরে, তিতলিদের আমগাছের ডালে একটা বুলবুলি এসে বসেছে ! বুলবুলি পাখি রাইয়ের খুব ভালো লাগে। রবি ঠাকুরের লেখায় ও পড়েছে, রবি ঠাকুরও নিজের ছোটবেলায় এমনি করে দুপুর দেখতেন জানালার ধারে বসে!

হঠাৎ দেখলো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে এক ফেরিওয়ালা দাদু বসে পড়ল রাস্তার ধারে। কেমন যেন অস্থির চোখমুখ। ঝোলা থেকে একটা প্লাস্টিকের বোতল বের করল দাদু এবার। ও, দাদুর জলতেষ্টা পেয়েছে! কিন্তু, বোতলে তো জল নেই, একেবারেই খালি। এবার দাদু আশেপাশে তাকাচ্ছে, বোধহয় টাইম কল খুঁজছে। কিন্তু, রাই জানে, এই পাড়ায় মাত্র তিনটে টাইম কল আছে, তাও একটা বহুদিন ধরে খারাপ। বাকি দুটোই এখান থেকে অনেক দূরে। তাও কর্পোরেশনের টাইম কলে জল বিকেল চারটের আগে আসে না। এখন তো সবে তিনটে বাজে। দাদু কলে জল না পেয়ে হতাশ হয়ে গেছে দেখে রাই হাতছানি দিয়ে ডাকলো দাদুকে, চাপা গলায় বলল, "দাদু ! " যদিও মা বলেছে, "অপরিচিত লোকের সঙ্গে একদম কথা বলবে না, ওদের সঙ্গে কখনো কোথাও যাবে না।" কিন্তু ও তো জানালার এপারে বসে আছে, আর দাদুটার মুখ দেখে মোটেই দুষ্টু লোক বলে মনে হয় না, বরং বেশ মায়া হয়।

দাদু মুখ ফিরিয়ে এদিকে তাকিয়ে ওকে দেখে অবাক হয়ে গেল, রাই আবার হাতছানি দিয়ে ডাকতে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। রাই হাতের পাশে টেবিলে রাখা জলের বোতলটা জানালার গরাদ গলে দাদুর হাতে দিল। বলল, "খাও দাদু ।" তারপর কী মনে পড়তে বললো, " একটু দাঁড়াও।" ফ্রকের পকেট থেকে একটা ছোট্ট পালস্ লজেন্স বের করে দাদুর হাতে দিল ও। মা গতকাল অফিস থেকে ফেরার পথে নিয়ে এসেছিল ওর জন্য। দাদু বললো, "তুমি লজেন্স খাবে না?"

"আমার আছে দাদু, এই যে। " হাতের মুঠো খুলে দেখায় ও।

"ও", বলে লজেন্স, জল সব খেয়ে নিল দাদু লক্ষ্মী ছেলের মতো। খুব মিষ্টি একটা হাসিতে ভরে গেল দাদুর মুখ। বোঝাই যাচ্ছে, লজেন্সটা বড়োই ভালো লেগেছে, বোতলের জলটায় গ্লুকোজও মেশানো ছিল। দুজনের মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। দাদু সানশেডের তলায় ছায়ায় বসে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করলো ওর সঙ্গে।

" দাদু, তুমি এই রোদে একা বেরিয়েছ কেন? এই রোদে কেউ বেরোয়? রাস্তায় দেখছো না কেউ নেই? একটু তো বাড়িতে বিশ্রাম নিতে পারো দুপুরে, না হয় বিকেলে বেরোতে! "

উত্তরে দাদু বলল যে তার বাড়ি অনেক দূরে, তার উপর আজ সারাদিনে বউনি হয়নি। তাই.....

ঘন্টাখানেক ধরে গল্প করে দাদু চলে গেল।

২ পরের দিনও দাদু আবার এল, গল্প করতে। এমনি করে রোজই দাদু দুপুরে একবার করে ওর সঙ্গে দেখা করে একটু গল্প করে যেত। আস্তে আস্তে ওদের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গেল। এক একদিন ঘরের ছবি আঁকতো, দেখিয়ে দাদুকে ও জিজ্ঞেস করত ," কেমন হয়েছে দাদু?"

দাদু বলত, "সুন্দর হয়েছে দিদিভাই। তবে, ঘর কি ইট কাঠ পাথর দিয়ে তৈরি হয় দিদিভাই? বাড়ি, ঘর হয় আপনজন নিয়ে। মানুষকে আপন করে নিতে জানতে হয় দিদিভাই, তোমার মতো করে। তার মন বুঝতে হয়। মনে রেখো, ভালোবাসায় সবাই বশ হয়। গায়ের জোরে মানুষের মনে জায়গা করে নেওয়া যায় না কখনো। বাড়ি তৈরি হয় আপনজনদের ভালোবাসা দিয়ে, তাদের আগলে রাখতেই। বাড়ি যতোই ছোট হোক, মনটা বড় রেখো। তাতেই সবার জায়গা কুলিয়ে যাবে। "

"তোমার বাড়িতে কে কে আছে, দাদু? "

"সবাই আছে দিদি। ছেলে, বৌমা, আর ঠিক তোমার বয়সী একটা নাতনি।"

রোজ দাদুর কাছে তার নাতনি নতুন কী দুষ্টুমি করেছে সেদিন সকালে, সেই গল্প শোনে রাই মন দিয়ে। শুনতে শুনতে বলে,

"তোমার বাড়ি কত বড়, দাদু? তোমার বাড়িতে পুকুর আছে? "

"সব আছে দিদি। পুকুর আছে বড়, ছোট ধানিজমি, তাতে খাটে আমার ছেলে। জানো দিদিভাই, আমার বাড়িতে আম, জাম, কাঁঠাল গাছ আছে। খুব বড় বড় আম হয়। দেখো, তোমার জন্য আনবো।"

"তাহলে তুমি ঐ বাড়িতে না থেকে দুপুর রোদে ঘুরে বেড়াও কেন? তোমার ঝোলায় করে কী বিক্রি করো?"

দাদু তখন খুব উদাস গলায় বলত, "আমি যে স্বপ্ন ফেরি করি দিদিভাই! ছোট ছোট স্বপ্ন । যারা জীবনের কঠিন আঘাতে স্বপ্ন দেখতে ভুলে যায়, তাদের নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শেখানোই যে আমার কাজ । স্বপ্ন দেখতে না শিখলে, মন বড় হয় না, মানুষ মনে জোর পায় না যে! জীবনের যুদ্ধে হেরে যায় তারা।"

" এ কাজের ভার তোমাকে কে দিয়েছে দাদু?"

" আমার ঠাকুর দিয়েছেন দিদি। এমনি করে সবাইকে স্বপ্ন দেখা শেখাতে শেখাতে, একদিন আমার স্বপ্নটাও সত্যি হয়ে যাবে হয়ত। তুমি কিন্তু শিখো দিদিভাই, তোমায় স্বপ্ন দেখা শিখতে হবে। তবেই তো তুমি স্বপ্ন দেখা শেখাতে পারবে। "

দাদুর কাছে শুনে শুনে রাই রোজ কল্পনা করে করে একটা আঁকা এঁকেই ফেলেছে। দাদুর বাড়ির ছবি। তাতে সবকিছু আছে, দাদুর ছেলে, বৌমা, নাতনি, আম, জাম, কাঁঠাল গাছ, পুকুর, ধানিজমি, স-অ-ব। কি সুন্দর হয়েছে দেখতে ! মায়ের খুব পছন্দ হয়েছে। রাই দাদুর কথা মাকে বলেনি যদিও, বললে খুব বকবে মা। কিন্তু মনে মনে ঠিক করে রেখেছে দাদুর

জন্মদিনে এটা দাদুকে গিফট দেবে। দাদু নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। দাদু বলেছে, "তুমি যেদিন স্বপ্ন দেখতে শিখে যাবে, সেদিন তোমার কাছে আমার ঝুলি আমি দিয়ে যাব। যেসব স্বপ্ন কেউ দেখতে জানে না, তেমন স্বপ্ন তৈরি কোরো তুমি। সবাইকে দেখতে শিখিও সেইসব স্বপ্ন। কেমন?"

" কিন্তু, আমি যে হাঁটতেই পারি না দাদু, তোমার মতো স্বপ্ন ফেরি করব আমি কীভাবে? " করুণ হয়ে আসে রাইয়ের মুখটা। দাদু গলায় জোর এনে বলে, "তুমি আবার হাঁটতে পারবে। মনে মনে স্বপ্ন দ্যাখো। খুব মন দিয়ে ভাবো, তুমি হাঁটছো। স্বপ্ন সত্যি হবে। আমি জানি, তুমি পারবে দিদিভাই। তোমাকে যে পারতেই হবে দিদিভাই। জীবনের যুদ্ধে হেরে গেলে চলবে না তোমার....." বলতে বলতে দাদুর চোখদুটো চিকচিক করে ওঠে।
"আমি পারবো দাদু, তোমার মতো করে স্বপ্ন দেখতে। পারবো।" সান্ত্বনা দিতে দিতে দৃঢ় গলায় বলল রাই।

মনে যে কোথা থেকে এত জোর পেল রাই, তা ওর মাও বুঝে পেলেন না। অনলাইনে কোডিং শিখছিল, পরীক্ষা দিয়ে মাসিক স্কলারশিপ জুটিয়ে ফেললো একটা। সুডোকু মেলানোর শখ ছিল বরাবর। অনলাইনে তার প্রতিযোগিতাতেও নাম দিয়ে ফার্স্ট প্রাইজ পেল। এসব ওকে জোগালো আরো আত্মবিশ্বাস। মাও অফিসে প্রত্যাশিত প্রোমোশনটা পেয়ে যেতেই ফিজিওথেরাপিস্ট এর ট্রিটমেন্ট শুরু করলেন মেয়ের জন্য। ডক্টর বললেন, "মিসেস গাঙ্গুলি, আপনার মেয়ের মনের জোর অসাধারণ! এটাই ওকে শীঘ্র সেরে উঠতে সাহায্য করবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ছয়মাসের মধ্যে ওকে পুরোপুরি সুস্থ করে তুলবো। কথা দিলাম। "

৩ আটমাস পরের কথা। সকালবেলা স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল রাই। দুইমাস হল ও সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে, অতীত ভুলতে, পথের ভয় কাটাতে, কাউন্সেলিং ও চলেছে এতদিন ধরে। এতদিন পর আজ ও স্কুলে যাবে আজ। দুপুরের সময়টা স্কুলেই থাকবে, তাই দাদুর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ নেই। তবে গত এক সপ্তাহ ধরে দাদু আর আসছে না। কী হল দাদুর! শরীর খারাপ? দাদুর বাড়িটা যদি ওদের পাড়ায় হত, তাহলে দেখা করা যেত! পরক্ষণেই আবার ভাবলো, ওদের পাড়ায় তো সব ফ্ল্যাট। দাদুর অত বড় বাড়ি, পুকুর এসবের জায়গা হত কোথায়?

স্কুল ছুটির পর, রাই বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। রাস্তা পেরোতে ভয় করছিল, কিন্তু উপায় নেই যে! দীপালি মাসি কাজ ছেড়ে চলে গেছে। মা অফিসে। তার উপর আজ আবার হঠাৎ করেই এক্স হেডমিসট্রেস এর মৃত্যুর খবরে দুপুর দুটো নাগাদ ছুটি হয়ে গেল! এখন রাই করে কী! অগত্যা একজন পুলিশকাকুর হাত ধরে রাস্তাটা পার হল ও। বস্তিটার ভিতর দিয়ে গেলে, বড় রাস্তায় আর পড়তেই হবে না। ঐ যে পিন্টুদার চায়ের দোকান আছে বস্তির শেষ মাথায়, তার পাশ দিয়ে বাড়ি যাওয়ার গলি। কিন্তু বস্তির ভিতর দিয়ে কিছু দূর যাওয়ার পরেই ওর পা দুটো যেন মাটিতেই আটকে গেল। একটা ঝুপড়ির সামনে দড়ি ছেঁড়া খাটিয়ায় বসে তোবড়ানো বাটিতে করে ভাত খাচ্ছে দাদু! এ কী! দাদু তবে যা যা বলেছিলো বাড়ি, পুকুর, নাতনি সবকিছু তাহলে মিথ্যা! কিন্তু কেন? কেন এমন ডাহা মিথ্যা কথা বলেছিল দাদু? কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল রাই। দেখলো ঘরের ভিতর থেকে কেউ বেরিয়ে আসে কিনা। কিন্তু না, দাদু নিজেই উঠে বাটি ধুয়ে রাখলো।

রাই এবার আর আটকাতে পারলো না নিজেকে। এগিয়ে গেল সোজা। দাদুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, দাদু খুব খুশি হয়ে তাকালো। কিন্তু রাই রেগে গিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকলো, " তুমি এইখানে থাকো? এইটা তোমার ঘর? তবে আমায় কেন এতদিন ধরে এত এত মিথ্যা কথা বলে ছিলে? তোমার ছেলে, বৌমা, নাতনি, আম, জাম, কাঁঠাল গাছ, পুকুর, ধানিজমি স-অ-ব বানানো গল্প? তোমার তো নিজের কোনো বাড়িই নেই! কেন তবে এমন মিথ্যা বানিয়েছিলে, বলো? আমি

চলাফেরা করতে পারব না বলে, বোকা বানিয়েছিলে আমায়! ভেবেছিলে সত্যিটা আমি কখনো জানতে পারবো না, না? " এই বলে ব্যাগ থেকে দাদুর বাড়ি আঁকা ছবিটা বের করে রাগে ফরফর করে ছিঁড়ে ফেললো ও। হাঁফাচ্ছে, থামলো কিছুক্ষণের জন্য। এইবার একজন জেঠু এসে দাদুর হাত ধরলেন। বললেন, "তুমিই কি রাই?" ততক্ষণে চারিদিকে বস্তির সব লোক জড়ো হয়ে গেছে।

৪ তারপর ঐ জেঠু বলতে শুরু করল, " তুমি দাদুর বাড়ির কথা জানতে চাইছিলে না? তোমার দাদুর সত্যিই একসময় একটা বড় বাড়ি , পুকুর, বাগান সব ছিল, নাতনি ছেলে বৌমা নিয়ে সুখী পরিবার ছিল। কিন্তু বানে সব ভেসে গিয়েছিল এক রাতে, হঠাৎ। বাকিদের মৃতদেহ কষ্ট করে হলেও খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু নাতনির কোনো চিহ্ন মেলে নি। সেই থেকে উনি আজ অবধি বিশ্বাস করে এসেছেন, ওর নাতনি বেঁচে আছে, একদিন তাকে ঠিক ফিরিয়ে দেবে ভগবান! এই বিশ্বাসই আজ অব্দি খাড়া করে রেখেছে মানুষটাকে। মনে মনে আজো কল্পনা করে, সবকিছু তেমনি আছে আগের মতো, তাই রোজ নতুন গল্প বানায়। যেন কিছুই হয়নি, সব ঠিকঠাক আছে, এমনি ভাবে। ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, সবাইকে মনের লুকোনো ব্যথা ভুলে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শেখায়, নিজের কষ্ট তোমার সঙ্গে গল্প করে লাঘব করত। উনি কাউকে ঠকায় নি। তোমার কথা রোজ বলত সবাইকে। একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে পা ভেঙে গিয়েছিল বলে এতদিন তোমার কাছে যেতে পারে নি। "

শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলে দাদুর পা দুটো জড়িয়ে ধরলো রাই। দাদু ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো অঝোরে। রাইয়ের মনে হল, আজ তাদের দুজনের এতমাসের স্বপ্ন দেখা সার্থক হল।

সংযুক্তা মহলানবীশ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন ২০২০ সালে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন সারাজীবন — অধ্যাপনা, শিক্ষকতা ; ভালোবাসেন লিখতে, পড়তে, আঁকতে। প্রিয় লেখক শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কম্বোডিয়া, হিন্দু আর বৌদ্ধধর্মের মিলনক্ষেত্র ভ্রমণ

অঞ্জনা মজুমদার

ইতিহাসের বইয়ের আঙ্কোরভাট মন্দিরের কথা পড়ে দেখার সুপ্ত ইচ্ছে ছিল। একদিন ঠিক হলো, যাবো। টিকিট কেটে অনলাইন হোটেল বুক করা হল। আমি চেষ্টা করছি ভ্রমণের কিছু কথা বলার।

১৬/০১/২০২৪

দমদম থেকে কম্বোডিয়ার কোনও ডাইরেক্ট ফ্লাইট নেই। ব্যাঙ্ককে চেঞ্জ করতে হয়। ব্যাঙ্কক থেকে কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেন। এখানে অন অ্যারাইভাল ভিসা খুবই সহজ। ক্যালকুলেটরে দুজনের জন্য ৭০ লিখে মুখে ডলার বললেন। ডলার জমা হলেই ভিসার স্ট্যাম্প দিয়ে ভিসা হয়ে গেল।

এয়ারপোর্টের বাইরে এসে সিম নেওয়া হলো। তারপর হোটেলে যাবার জন্য টুকটুক ড্রাইভাররা ছেঁকে ধরলো। ৯ ডলার চাইছিল। তখন একটা বিদেশি গাড়ি ৮ ডলারে নিয়ে যাবে বলায় আমরা রাজি। এখানে ড্রাইভার বাঁ দিকে বসে। ইউরোপ এর মতো রাস্তায় চলার নিয়ম।

রিভারসাইড বুলেভার্ড এর পরের বুলেভার্ডে আমাদের হোটেল। বেলা ২ টোয় চেক ইন থাকলেও ১১ টায় আমাদের হোটেলের ঘর দিয়ে দিল। আমাদের হোটেলের বারান্দা থেকে নমপেনের রয়্যাল প্যালেস দেখা যায়।

ব্রেকফাস্ট ৫ ডলার। স্নান করে বেরিয়ে পড়লাম। টুকটুক ড্রাইভার যারা সারাক্ষণ ঘুরছে তাদের এড়িয়ে পায়ে হেঁটে যাবো ঠিক করলাম। টুকটুক হল একটা মোটরসাইকেল এর সাথে গাড়ি জিনিসপত্র না থাকলে ৬ জনও বসে যাওয়া যায়। ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়ার বদলে মোটরসাইকেল।

একটু দূরেই একটা ওয়াট নম। বিদেশিদের প্রবেশমূল্য ১ ডলার। এর ভেতরে একটা সেকেন্ডের কাঁটা ওয়ালা সূর্য ঘড়ি আছে। কম্বোডিয়ার সব মন্দির হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মের মিলনস্থল।

রোডসাইড রেস্টুরেন্টে ৩ ডলার দিয়ে এগ ফ্রায়েড রাইস লাঞ্চ। লাঞ্চ এর সাথে একটা জগে করে চা দেয়। আলাদা করে ভালো খারাপ কিছু না। তবে জল তেষ্টা মেটায়।

মেকং নদীতে লঞ্চে করে ঘোরার জন্য ৫ ডলার করে লাগে। লঞ্চে ওঠার আগে জলের বোতল ফ্রি। মেকং নদীর তীরে শহর। সূর্যাস্তের সময়ে পৌঁছে গেলাম মেকং আর টোনলেস্যাপ নদীর সঙ্গম। এখানে লঞ্চে করে প্রায়শঃই গাড়ি পারাপার করা হয়।

বাংলায় লেখা এবং বাংলা কথা বলা রেস্তোরাঁতে ডিনার সেরে হোটেল।

১৭/০১/২০২৪

এদিন টুকটুক ভাড়া করে নমপেনের গোল্ডেন বোট, মানে জাহাজের আকারের মন্দির, গোল্ডেন প্যাগোডা দেখে সিল্ক আইল্যান্ড গেলাম নদী পার হয়ে। ভেসেলে অনেক গাড়ি, মানুষ একসাথে পার হয়।

সিল্ক আইল্যান্ডে মার্লবেরি গাছ দেখলাম। সিল্কমথের মেটিং টাইম ১২ ঘন্টা। সিল্ক তৈরির পুরো প্রক্রিয়া দেখলাম। তারপর আউডং মনাস্টেরি। পথে অলিম্পিক স্টেডিয়াম। যদিও কখনো সেখানে অলিম্পিক হয়নি। আউডং যেতে ৫০০ সিঁড়ি উঠতে হয়। ওপরে তিনটি মন্দির। ১০০০ বছর, ৫০০ বছর, ১০০ বছর আগে তৈরি। এখানে কোনও মন্দিরে পূজার জন্য কোনও জোর নেই। অনেক জায়গায় কোনও পূজা হয় না। কেবল পুরোনো আর সুন্দর এটাই দর্শনীয়। এরপর বাটামব্যাং।

১৮/০১/২০১৪

বাটামব্যাং যাবার ১৪ ডলার টিকিট। বাস কিন্তু এসি আরামদায়ক।প্রথম দিন হেঁটে বাজারের মধ্যে দিয়ে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে ডিনার।

১৯/০১/২০২৪

এখানের প্রধান আকর্ষণ বাম্বু ট্রেন। বাঁশের ঠেলাগাড়িতে ইঞ্জিন লাগানো। ট্রেন লাইনে চলে। একটাই লাইন। উল্টোদিকে ট্রেন এলে দুই ড্রাইভার একটি ট্রেন ধরে পাশে নামিয়ে দিয়ে অন্য ট্রেন চলে গেলে আবার লাইনে উঠিয়ে দেয়। আরো তিনটি ট্রেন দেখলাম। দুটো ইউরোপীয় পর্যটকদের আর একটি এক কলেজের ছাত্রছাত্রী নিয়ে শিক্ষিকা। সবার সাথে আলাপ হলো।

তারপর বাম্বু রাইস তৈরি দেখা আর খাওয়া হলো। বাঁশের মধ্যে চাল, কিছু ফল দিয়ে তৈরি। আমাদের কোনও একরকম পিঠের মতো খেতে, সামান্য মিষ্টি।

এরপর জেনোসাইড মিউজিয়াম ও কিলিং ফিল্ড।কম্বোডিয়ার প্রতিজনপদে এক বা একাধিক আছে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ পল পটের নেতৃত্বে সব পরিবারের কেউ না কেউ সেই গণহত্যার শিকার।আমাদের ড্রাইভারের মিস্টার কের বাবা কাকা গণহত্যার শিকার। কিলিং ফিল্ডে একটা কাচের ঘরে অনেক হাড়গোড় রাখা আছে।

এরপর অন্য গাড়ি ভাড়া করে পাহাড়ের মাথায় সূর্যাস্ত দেখতে গেলাম। গাড়ি ফেরার তাড়া দিয়ে সূর্যাস্ত হবার আগেই ব্যাট কেভ দেখতে গেলাম। পাহাড়ের গায়ে এক বড় শায়িত বুদ্ধমূর্তির পায়ের কাছে এক গুহা থেকে হাজার হাজার বাদুড় প্রায় আধঘন্টার বেশি সময় ধরে উড়ে গেল।মিস্টার কে বললো, এখন বাদুড়েরা ৯০ কিমি উড়বে। ১৫ গ্রাম মতো মশা খেয়ে রাত থাকতে থাকতেই ফিরে আসবে। এটা রোজকার ব্যাপার। ঝাঁক বেঁধে বাদুড়ের ওড়া দর্শনীয়।

২০/০১/২০২৪

এবার সিয়েম রীপে যাবো। সকাল ৭ টায় বাস। সাড়ে নটায় ব্রেকফাস্ট ব্রেক সাড়ে এগারোটায় হোটেল।

২ টোয় ক্রুজে টোনলে স্যাপ নদীতে গ্রামে ঘুরতে গিয়ে একটা দ্বীপে গেলাম। দ্বীপে স্কুল, মন্দির আর স্থানীয় মানুষের ঘর। নদীতে মাছ ধরা আর ছাড়ার একটা অভিনব যন্ত্র দেখতে পেলাম।

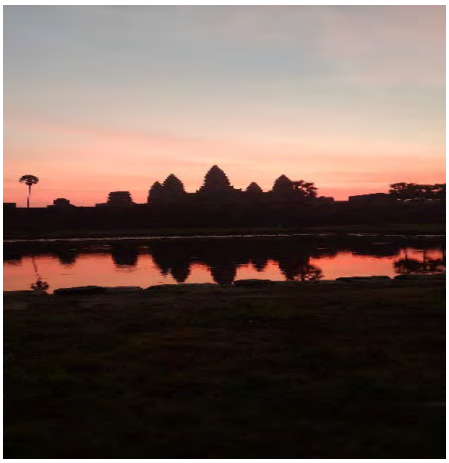

২১/০১/২০২৪

আজ সেই আঙ্করওয়াট দর্শন।

৪ টে ৫০ বেরিয়ে প্রথমে টিকিট কাটলাম। ৩৭,৬২,৭২ ডলার একদিন, ৩ দিন, ৭ দিনের টিকিট। আমরা তিনদিনের কাটলাম। আঙ্করভাট এবং সিয়েম রিপের অনেক মন্দির এই টিকিটেই দেখা যাবে। টিকিটে ইন্সট্যান্ট ছবি তুলে তার প্রিন্ট দিয়ে প্রত্যেকের টিকিট। খুব সুন্দর। সেটা আমি আমার পার্শে রেখে দিয়েছি।

আঙ্কর ওয়াটের সূর্যোদয় অসাধারণ একটা দৃশ্য। আমরা দুদিন ধরে দেখেছি।প্রথম দিন গাইড নিয়ে, পরের দিন নিজেরা। এবার মন্দির। অনেক সিঁড়ি উঠতে হয়। রেলিং আছে। সাবধানে নাহলে মাথা ঘোরে।

কোনও পুজোপাট নেই। প্রচুর শিবলিঙ্গ আছে। মাথা ভাঙা। দস্যুরা ধন-রত্নের লোভে ভেঙেছে। বুদ্ধ একই মন্দিরে। শৈব বৌদ্ধের মিলনমন্দির। আমার পুরোনো মন্দির দেখতে ভালো লাগে কারণ অতদিন আগে কি কৌশলে অমন কারুকার্যময় সুউচ্চ মন্দির কিভাবে তৈরি করেছে সেটাই বিস্ময়কর।

মন্দিরের চারপাশে পরিখা। একটা ভাসমান সেতু দিয়ে পার হতে হয়। সেই জলে সূর্যোদয়ের পূর্বের মায়াবী আলোয় মন্দিরের পাঁচ চূড়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, সরস্বতী আর উমা পার্বতীর মাথার ছায়া অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য সৃষ্টি করে।এককথায় সুন্দর।

সিয়েম রীপে অনেক মন্দির। গঠনশৈলী প্রায় একরকম। তবে সিঁড়ি উঠতে হয়। রেলিং নেই যেখানে সেখানে রিস্কি। একটা মন্দিরে উঠে তো গেছি। নামতে পারছি না। একজন সাহেব সাজেশন দিলেন ধরে ধরে পিছনে ফিরে নামতে। তবে অতিকষ্টে নামতে পারলাম। নার্ভ ঠিক রাখা আর পা পিছলে না যায় এটাই লক্ষ্য করতে হয়.।

এরপরে বায়ন টেম্পল, /আঙ্কর থম।

এরপর থমমাথন টেম্পল আঙ্করওয়াটের আগে তৈরি।হিন্দু মন্দির, শিবলিঙ্গ কিছু অন্য মূর্তিও আছে। এর উল্টো দিকে চাও সে ডেভোডা। এখানেও শিব, বিষ্ণু, বুদ্ধ। সহাবস্থানে। টা কেও মন্দিরের রেস্টোরেশন কাজ করছে চিন। কিছু কিছু মন্দিরের সংস্কারের কাজ ভারতও করছে।

অল্প দূরে প্রেহা কান।রাজা জয়বর্ধন সেভেন বাবার নামে এটি বানিয়েছিলেন। খুব উঁচু ধাপ। গাইড কম্বোডিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাসের কথা বোঝাচ্ছে।

এরপর টা প্রহম। বড় মন্দির। এখানে একটা টেবিলে একদল গান করে গৃহযুদ্ধের কিছুটা শারিরীক ক্ষতি নিয়ে। এই অর্থ দিয়ে জীবন ধারণ করে। এটা জয়বর্ধন সেভেনের মায়ের নামে। মন্দিরের গা বেয়ে বড় বড় গাছের গুঁড়ি শিকড়।

বেন্টি কেডাই ভাঙাচোরা বড় মন্দির। এখানে দু সেট বিয়ে হচ্ছিল।

সানসেট দেখার জন্য বাখেং নামে মন্দিরের ওপরে উঠতে হবে। পথে জলের মধ্যে স্রা স্রাং মন্দির। বেন্টি কেডাই মন্দিরের ওপরে সান সেট দেখার ভীড়ে স্থানীয় এক তরুণীর সাথে আলাপ হলো। এটা স্মল ট্যুর।

পারদিন বিগ ট্যুর নিক পিয়ান নামে হিন্দু মন্দির দিয়ে শুরু।একটা মস্ত দিঘির মাঝে দ্বীপে মন্দির। দ্বীপে যেতে হয় ৩০০ মি লম্বা কাঠের সেতু দিয়ে। পরেরটা টা সোম বৌদ্ধ মন্দির। তারপর ইস্ট মেবং আঙ্করের ২০০ বছর আগে তৈরি। এরপর ২৫ কিমি দূরে বেন্টি স্রাই। ছোট হিন্দু মন্দির। বড় এরিয়া। মন্দিরে সুন্দর কাঠের কাজ। সব ছবিতে রামায়ণের গল্প। ১০ - ১২ কিমি দূরে ব্যান্টি সামারাই। হিন্দু মন্দির। প্রে -রূপ, দশম শতাব্দীর শিব মন্দির। এখানে বিয়ে এবং এনগেজমেন্ট হচ্ছিল।

২৩/০১/২৪

কুলেন মাউন্টেন যাবার বাসে আমরা ছাড়া ইংল্যান্ড এর এক কাপল আর মালদ্বীপের দুটি মেয়ে। সবার কমন ভাষা ইংরেজি। দেখলাম সহস্র লিঙ্গ। হাল্কা জলস্রোতের মধ্যে হাজারের বেশি শিবলিঙ্গ।

এরপর একটা মন্দিরে শিব আর বুদ্ধ মিলিতভাবে পুজো পাচ্ছেন।কুলেন জলপ্রপাত দুটি ধাপ। একটা ২০ - ৩০ ফুট অন্যটি ২০- ৩০ মিটার। অনেকে স্নান করছেন। আমাদের চার সঙ্গী জলে স্নান করতে নামলেন।

২৪/০১/২৪

এবার সিয়েম রীপ থেকে নমপেনের বাসে। বাস সেই আরামদায়ক।.

নমপেনে ওয়াট না লাম মনাস্টেরির। ইন্ডিপেনডেন্স মনুমেন্ট ১৯৫৩ সালে ফরাসি থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের সাক্ষী।

২৫/০১/২৪

হোটেলের কাছেই রয়্যাল প্যালেস। আজ সকাল ৮ টা থেকে ১০ টা রয়্যাল প্যালেস দেখার পালা। টিকিটের সাথে একটা ম্যাপ দিয়ে দিল। ম্যাপ দেখে কোন বাড়িটা কিসের স্পষ্ট বোঝা গেল। রাজবাড়ি যেমন হয়। নানারকম স্মৃতি সৌথ। একটা সুন্দর বিশাল পান্নার বুদ্ধমূর্তি আছে। ছোট ছোট অনেক এমারেল্ডের মূর্তিও আছে। ছবি তোলা নিষেধ। আর আছে সিলভার প্যাগোডা। গোটা প্রাসাদের মিউজিয়ামে রামায়ণের চিত্র চিত্রিত। খুব সুন্দর রক্ষণাবেক্ষণ। ভালো করে দেখে পুরোনো রাজাদের বেশবাস, মুকুট সিংহাসন দেখে ফ্রি জল নিয়ে প্যালেস ত্যাগ করলাম।

১২ টা র জায়গায় ২ টোয় চেক আউট করে অটো করে এয়ারপোর্টে। ৩.৫ ডলার। ফেরার ভাড়া সস্তা পড়ল।

কম্বোডিয়ায় আমরা আম কাঁঠাল খেয়েছি রোজ। ওখানকার কারেন্সি রিয়েল। ১ ডলার = ৪০০০ রিয়েল। ওরা ডলার নিতে বেশি পছন্দ করে। একজন টুকটুক ড্রাইভার আমাদের ৫০০ টাকা নিয়েছিল, তার বিভিন্ন দেশের কারেন্সি জমানোর হবি। পুরোনো মন্দিরের দেশ কম্বোডিয়া। প্রাচীন ইতিহাস দেখতে পেলাম এখানে। আর দেখলাম হিন্দু আর বৌদ্ধদের মিলনমেলা। আমার মন ভরে গেল

অঞ্জনা মজুমদার অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা। পদার্থবিদ্যা পড়াতাম। এখন কলকাতায় থাকি

এক দুষ্টু পাত্রীর গল্প

গল্প

উত্তম চক্রবর্তী

অপূর্ব বাধ্য হয়ে শেষে বাবা আর মাসী মেসোর সাথে পাত্রী দেখতে যেতে রাজি হল। মাত্র দুই বছর আগে ও সল্ট লেকের এই আই টি কোম্পানিতে চাকরিতে ঢুকেছে। বয়সতো মাত্র আটাশ বছর ,এখনই বিয়ে করবার কোন ইচ্ছাই নেই ওর। অপূর্বর যুক্তি হল বিয়ের আগের জীবনটাতে প্রত্যেক ছেলে মেয়ের চুটিয়ে ব্যাচেলর লাইফটা এঞ্জয় করে নেওয়া উচিত। গাছের বেল পাকতে যেমন সময় লাগে তেমনই পাত্র বা পাত্রীর বিয়ের সঠিক সময় আসতেও সময় লাগে। অপূর্ব চায় তিরিশের আগে ও বিয়ে করবে না । আর বাবা আর মাসী কিছুতেই সেটা মানবে না। ওঁদের সেই একই কথা, 'তোর মা বেঁচে থাকলে এতদিনে তোকে বিয়ে দিয়ে দিতেন।'

পাত্রীর বাবা অনিল বাবু মেসোর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, একই অফিসে উঁচু পোস্টে চাকরি করেন দুজনেই। ভদ্রলোকের এই একটাই মেয়ে। অপূর্বর সম্পর্কে সব শুনেই উনি এই পাত্রের সাথে মেয়ের সম্বন্ধের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। মেসো তার বন্ধুকে কথা দিয়ে দিয়েছেন যে আজ রবিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ওরা পাত্র এবং তার বাবাকে নিয়ে শোভাবাজারে পাত্রী দেখতে আসবেন। সেই মত মাসীরা সকালেই ভবানিপুর থেকে অপূর্ব দের বউবাজারের বাড়িতে চলে এসেছেন। অপূর্ব আজ আর পালিয়ে যাবার কোন সুযোগই পেলো না। বাধ্য হয়ে বিকেলে সবার সাথে মেসোর গাড়িতে উঠে বসল অপূর্ব।

এদিকে আরেক কাণ্ড। পাত্রী মাম্পি কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি নয়। মাম্পি এম এ পাশ করা শিক্ষিতা সুন্দরী স্মার্ট মেয়ে। অনিল বাবু যতই সম্বন্ধ আনেন মাম্পি কোন না কোন ছুতোয় সেগুলি ভেঙ্গে দেয় আর বলে এই পাত্র ওর জন্য একদম বেমানান। দুবার তো পাত্রর সাথে ছাদে গিয়ে আলাদা করে কথা বলে তাদের দিয়েই সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েছে। ওদের বলেছে ওর নাকি আরেকজনের সাথে প্রেম ভালোবাসা আছে। সুতরাং ও চায়না তিন তিন খানা জীবন নষ্ট হোক। এই কথা শুনেই ওরা পিছিয়ে গেছিল।

মাম্পি সবচেয়ে বেশি শয়তানি করেছিল বেহালার এক ডাক্তারের সাথে। একই রকম ভবে সেই পাত্রকেও মাম্পি কথা বলবার নাম করে ছাদে নিয়ে যায় আর ওকে জানায় ওর একটা বয় ফ্রেন্ড আছে। ওকে ছাড়া মাম্পি আর কাউকেই বিয়ে করে সুখী হতে পারবে না। সেই ডাক্তার নিচে নেমে বাবা মাকে নিয়ে ফিরে গিয়েছিল আর পরে ফোন করে জানিয়ে দেয় যে ওদের মেয়ে পছন্দ হয়নি।

আরেক বার একজন প্রফেসর দিলীপ বসুকে মাম্পি ধোঁকা দেয় আরেক মিথ্যা কাণ্ড ঘটিয়ে। পাত্রর বাড়ির লোকেরা এলে মাম্পি এমন একটা হাসি খুশী ভাব দেখায় যে সবাই ধরে নেয় যে মাম্পির পাত্র পছন্দ হয়েছে। মাম্পির বাবা পাত্রর অনুরোধে শ্যাম বাজারের এক রেস্তোরাঁয় মেয়েকে ওর সাথে দেখা করে কথা বলবার অনুমতি দেন । মাম্পিও রাজি হয়ে যাওয়াতে অনিল বাবু খুব খুশী হয়েছিলেন যে এবার বোধ হয়ে মেয়ের সাথে এই পাত্ররই বিয়ে লাগবে । কিন্তু তাঁর বহুরূপী মেয়ে যে কী মতলব করে বসে আছে সেটা তো অনিল বাবু কল্পনাও করতে পারেন নি তখনো।

নির্দিষ্ট দিনে বিকেল পাঁচটার সময় দিলীপ গিয়ে হাজির হয় সেই রেস্টুরেন্টে। রাস্তার ধারের একটা টেবিলে বসে কাঁচের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে থাকে, মাম্পির আসবার পথের দিকে তাকিয়ে। দিলীপের প্রায় সব বন্ধুর বিয়ে হয়ে গেছে। এই মাম্পি মেয়েটাকে দিলীপের বেশ পছন্দ হয়ে গেছিল। মনে মনে ভেবে রেখেছিল আজ ওর সাথে কথা বলেই বাড়িতে গিয়ে ওর মেয়ে পছন্দ হয়েছে জানিয়ে দেবে। কিন্তু মিনিট দশেক বাদেই দিলীপ কাঁচের ভিতর থেকে অবাক হয়ে দেখে রাস্তার উল্টো দিক থেকে মাম্পি রাস্তা পার হয়ে এই রেস্তোরাঁর দিকে এগিয়ে আসছে সিগারেটে টান দিতে দিতে। দিলীপ অবাক হয়ে যায় ওর হবু বৌ সিগারেট খায় দেখে। চুপ করে দেখতে থাকে মাম্পিকে। মাম্পি যেন ওকে না দেখেই সিগারেটটা রাস্তার পাশে ছুঁড়ে দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে এসে ঢোকে কাঁচের দরজা ঠেলে রেস্তোরাঁর ভিতর। তাকিয়ে দেখে ডান দিকে একটা টেবিলে বসে দিলীপ অবাক হয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

দিলীপ মাম্পি এসে সামনের সোফায় বসতেই একটা তীব্র সিগারেটের গন্ধ পেল। দিলীপ নিজে কোন নেশা করে না। আর সেই কারণেই সিগারেটের বা মদের গন্ধ ওর একদমই সহ্য হয় না। মাম্পি হেসে বলে, 'সরি, আমার বোধ হয় একটু লেট হয়ে গেল তাই না। আপনি কতক্ষণ আগে এসেছেন ?' দিলীপ নীল জিনস আর আকাশি রঙের টপ পরে আসা মাম্পির দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে জবাব দিল, 'বেশিক্ষণ না। এই প্রায় মিনিট পনের হবে।'

দিলীপ ততক্ষণে ঠিকই করে নিয়েছিল আর যাই হোক এই সিগারেট খাওয়া মেয়েকে ও কিছুতেই ওর জীবন সঙ্গিনী করতে পারবে না। দুজনে একটু গল্প করে কফি শেষ করে একটু বাদেই উঠে পরেছিল। মাম্পি কিন্তু খুব স্বাভাবিক ভাবেই ওর হবু বরের সাথে কথা বলছিল, যেন কিছুই হয় নি। কিন্তু দিলীপ বাড়ি ফিরেই এই সম্বন্ধ নাকচ করে দেয়।

এদিকে এই দিলীপ আর অপূর্ব হল ছোটবেলার বন্ধু। ওরা আগে অপূর্বদের পাশের বাড়িতে বউ বাজারেই থাকত আর দুজন একই স্কুল থেকে হাইস্কুল পাশ করেছিল। পরে দিলীপ এম এস সি করে, ডক্টরেট করে প্রফেসারিতে জয়েন করে আর অপূর্ব ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আই টি সেক্টরে ঢুকে যায়। দিলীপরা এখন কাছেই একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে উঠে গেলেও দুই বন্ধুর মধ্যে কিন্তু দেখা সাক্ষাৎ মেলামেশা এখনো একই আছে।

আজই সকালে বাজার করতে গিয়ে দুই বন্ধুর দেখা হয়েছে। কথায় কথায় অপূর্ব জানায় ও আজ বাবা মাসীদের সাথে ওর বিয়ের পাত্রী দেখতে শোভাবাজার যাচ্ছে। শোভাবাজার শুনতেই দিলীপ পাত্রীর ব্যাপারে সব জানতে চায় আর সেই একই মেয়েকে ওর বন্ধু অপূর্ব দেখতে যাচ্ছে শুনে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর অবস্থা দেখে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে, তোর আবার কী হল ? মাথায় হাত দিয়েছিস কেন ?'

দিলীপ অপূর্বকে অবাক করে দিয়ে বলে, 'আরে সর্বনাশ, তুই ঐ মেয়েটাকে দেখতে যাচ্ছিস অপু ? আরে সেদিন আমিও তো ঐ পাত্রীকেই দেখতে গেছিলাম রে। ও মাই গড। বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যাবে না। কিন্তু মেয়েটা লুকিয়ে সিগারেট খায় জানিস ? আমি নিজে ওকে সিগারেট খেতে দেখেছি সেদিন যখন আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল শ্যাম বাজারের রেস্টুরেন্টে। তুই ওকে দেখতে যাচ্ছিস অপু ?'

অপূর্ব আকাশ থেকে পড়ল। মাম্পি নামের মেয়েটা সিগারেট খায় সেটা কি মাসীরা জানে না ? কী করে জেনে শুনে এখন ও এই পাত্রীকে বিয়ে করবে ? অপূর্ব চিন্তায় পড়ে যায়। হেসে বলে, 'আসলে কী হয়েছে

বলতো, মেসোমশাইয়ের বন্ধুর মেয়ে। আজ আমরা যাবো মেসো কথা দিয়ে দিয়েছে।

আমার তো এমনিতেই এখন বিয়ে করবার কোন ইচ্ছাই নেই। দেখনা আমিও কিছু না কিছু বাহানা করে এই সম্বন্ধটা নাকচ করে দেব। সিগারেট খাওয়া মেয়েকে কে বিয়ে করবে, মাথা খারাপ ?'

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার একটু আগেই ওরা পৌঁছে গেল শোভা বাজার। রাস্তায় মেসোমশাই অনেক ভালো ভালো কথা বললেন মাম্পির ব্যাপারে। উনি নিজে যদিও মেয়েটাকে দেখেন নি, কিন্তু ওর বাবার কাছে শুনেছেন মেয়েটি খুব সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং খুব সভ্য ঘরোয়া মেয়ে। মেসোর কথা শুনে অপূর্ব মনে মনে হাসতে থাকে যে মেসো বোধ হয় জানেও না যে মেয়ে একজন সিগারেট খাওয়া নেশাখোর মেয়ে।

মাম্পির এক বয়স্কা পিসি বসবার ঘরে মাম্পিকে ধরে ধরে নিয়ে এলেন। মাম্পির পরনে একটা ডীপ সবুজ রঙের সিল্কের শাড়ি আর ম্যাচ করা ব্লাউজ। মাথার চুল উঁচু করে স্টাইল করে বাঁধা। মাম্পির বাবা মা একবার অপূর্বর মুখের দিকে তাকালেন। আর অপূর্ব মাম্পিকে দেখে একেবারে বোল্ড আউট হয়ে যায়। কী দারুণ সুন্দর দেখতে মেয়েটা। কী বড় বড় টানা চোখ। গায়ের রং যেন দুধে আলতা, লম্বা আর মাথা ভর্তি ঘন কালো চুলে মাম্পিকে একটা রাজকন্যার মত লাগছে তখন। অপূর্ব অবাক হয়ে ভাবছিল এই এতো সুন্দর মেয়েটা সিগারেট খায় ? ওর কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না ব্যাপারটা।

মাম্পির কিন্তু ছেলেটাকে এবার সত্যি সত্যি ভালো লাগল। কিন্তু অপূর্বর সাথে চোখা চোখি হতেই মাম্পি মুচকি হেসে চোখ নামিয়ে নেয়। কাজের লোক এসে চা মিষ্টি দিয়ে যাবার পর অনিল বাবু অপূর্বর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা বাবা, তোমরা দু'জন যদি আলাদা করে কথা বলতে চাও তবে যাও আমাদের ছাদে গিয়ে একটু ঘুরে এসো।

শান্ত শিষ্ট একটি ভদ্র মেয়ের মত ঘাড় নেড়ে মাম্পি উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল অপূর্বর দিকে। অপূর্ব মাসীর দিকে একবার তাকিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। মাম্পির পিছন পিছন ছাদে এসে এক পাশে দাঁড়ায়। প্রথম কথা বলে মাম্পি। ও ঠিক করেই এসেছে এবার এই ছেলেটা কতোটা স্মার্ট তার একটা পরীক্ষা না নিয়ে ও এই বিয়েতে মত দেবেনা। মাম্পি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কোন গার্ল ফ্রেন্ড নেই ?'

অপূর্ব সতর্ক হয়ে যায়। বুঝতে পারে মেয়েটা এবার ওকে বাজিয়ে দেখতে চায়। হেসে উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, কেন থাকবে না ? অনেক আছে। আর আপনার কোন বয় ফ্রেন্ড নেই মাম্পি দেবী ?'

মাম্পি বুঝতে পারে অপূর্ব ওর চালাকি ধরে ফেলেছে। মাথা নিচু করে বলে, 'আমার একটা বয় ফ্রেন্ড আছে জানেন। কিন্তু বাবা তাকে কিছুতেই মানবে না। আমি জানি আমাকে একদম জোর করেই এই আপনার সাথে বিয়েতে বসতে বলবে।'

অপূর্ব জবাব দেয়, 'আরে বিয়ের আগে এরকম অনেকেরই বয় ফ্রেন্ড বা গার্ল ফ্রেন্ড থাকে। ওসব ছাড়ুন তো। বিয়ের পর দেখবেন তখন এই আমি একজনই থাকব আপনার নট আউট বয় ফ্রেন্ড।'

মাম্পি চিন্তা করে, আরে এ তো নাছোড় বান্দা লোক।

অপূর্ব হাসতে থাকে। মাম্পি ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাতেই অপূর্ব বলে,'আপনি আমাকে ওর ফোন নম্বর দিন। আমি নিজে ওর সাথে কথা বলে বোঝাব। আপনি একদম টেনশন নেবেন না।

এখন তো আপনি আমার গার্ল ফ্রেন্ড তাই না।' বলতে বলতেই অপূর্ব পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে খুলে ধরে মাম্পির সামনে আর বলে, 'নিন, আপনার তো সিগারেট চলে। নিন ধরুন একটা। নিচে যাবার আগে দুটো সুখ টান দিয়ে নিন। ধরুন ধরুন' বলে খোলা সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দেয় অপূর্ব। মাম্পি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। ফিস ফিস করে বলে, 'আমি তো সিগারেট খাই না। কে বলল আপনাকে যে আমি সিগারেট খাই ?'

অপূর্ব সোজাসুজি বলে ফেলে, 'কেন সেদিন প্রফেসর দিলীপের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন না সিগারেট খেয়ে মুখে সিগারেটের গন্ধ নিয়ে। দিলীপ আমার বন্ধু তো। আজ আমি আপনাকে দেখতে আসছি শুনেই বলল ও নিজে সিগারেট খায় না বলেই আপনার মত সুন্দরীর সাথেও বিয়েতে অমত জানিয়েছিল। নিন নিন ধরুন, আমি সব জানি, আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খান। কী আছে ? আজকাল অনেক মেয়েরাই তো খায়। আপনি বিয়ের পরেও খেতে পারবেন। আর আমার এই ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই।'

মাম্পি অপূর্বর কথায় একেবারে বোল্ড আউট হয়ে যায়। আবার ওর মনে ভয়ও ঢুকে যায়, অপূর্বকে যদি ও আজ নাকচ করে দেয় তাহলে যদি অপূর্ব ওর বাবাকে জানিয়ে দেয় যে ও সিগারেট খায়। আসলে শুধু সেদিন দিলীপের সাথে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেবার জন্যই মাম্পি ঐ নাটকটা করেছিল, আসলে ও তো সিগারেট ছোঁয়ও না। উদ্দেশ্য ছিল দিলীপের সামনে ওই সিগারেট খাওয়ার নাটক করে এই বিয়েটাও ভেঙ্গে দেওয়া। মাম্পি চাকরি করবে, জীবনটাকে আরও এঞ্জয় করবে, এখন ও কিছুতেই বিয়ে করবে না।

মাম্পি চুপ করে মাথা নিচু দাঁড়িয়ে আছে দেখে অপূর্ব এগিয়ে এসে মাম্পির হাত ধরে খুব শান্ত গলায় বলল, 'তুমি এতো সুন্দর এতো ভালো একটা শিক্ষিতা মেয়ে। কেন তুমি লোকের কাছে মিথ্যা কথা বল মাম্পি ? আমি জানি তুমি বিয়ে করতে চাওনা বলেই এসব করে সব সম্বন্ধ ভেঙ্গে দাও। দিলীপের কথা শুনেও আমার বিশ্বাস হয় নি। আর আজ এখন তোমাকে দেখেই আমি একশ ভাগ শিওর হয়ে গেছি তুমি এসব কর শয়তানি করে মাম্পি। কিন্তু আমি যে তোমার প্রেমে পড়ে গেছি মাম্পি। তুমি যাই হও না কেন, আমি এই তোমাকেই বিয়ে করব। আমিও এতোদিন বিয়ে করবনা করবনা বলে কাটাচ্ছিলাম। কিন্তু আজ তোমাকে দেখেই মনে হয়েছে না, আমাকে এবার টোপর পরতেই হবে। আর সেটা শুধু তোমার জন্যই মাম্পি। তুমি বিয়ে করবে তো আমাকে মাম্পি ? আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারব না। সারা জীবন তোমাকেই আমি পাশে পেতে চাই।'

মাম্পি এবার ছলছল চোখে তাকায় আর বলে, 'আমি এতো খারাপ মেয়ে জেনেও তুমি আমাকে ভালবাসবে অপূর্ব ? তুমি কেন এতো ভালো গো ? আমি আর পারলাম না। আমি তোমার কাছে হেরে গেছি অপূর্ব। বিশ্বাস কর আমিও তোমাকে দেখেই তোমার প্রেমে পড়ে গেছি।' ঠিক তখনই পাশের বাড়ি থেকে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি ভেসে এলো। স্বয়ং ভগবান যেন ওদের আশীর্বাদ করলেন ঐ খোলা ছাদের মণ্ডপে।

উত্তম চক্রবর্তী - একজন অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী। অবসর সময়ে কেবল লেখা ও গান নিয়ে সময় কাটে। এখন অবধি মোট বারো খানা বই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আমার লেখা গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

শিকড় থেকেই যায়

গল্প

মিলি ঘোষ

শোবার ঘর থেকে পিছনের বাগানের দিকের জানলাটা দিয়ে তাকালে পাঞ্চেত পাহাড়টা দেখা যায়। ঠিক স্পষ্ট নয়। অবয়বটা পরিষ্কার। বাগানের এদিকটায় আম, পেয়ারা, পেঁপে সব রকম গাছ রয়েছে। কিন্তু উদ্ভবের চোখ যায় সব ছাড়িয়ে ওই ছয় মাইল দূরের পাহাড়ের দিকে। জানলার ঠিক নিচে ঠাকুরের সিংহাসন পাতা রয়েছে। তাই একটু পিছিয়ে দাঁড়িয়েই পাহাড়টাকে দেখতে হয়।

প্রথম যখন ডিভিসি'তে চাকরি নিয়ে উদ্ভব মাইথনে এলো, খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগত। কলকাতার শোভাবাজারের মতো জনবহুল এলাকায় বড় হওয়া উদ্ভব, নিজের শহরের বাইরে থাকার কথা ভাবতেই পারত না। সেই উদ্ভব ধীরে ধীরে সুন্দরী মাইথনের প্রেমে পড়ল। জায়গাটার নাম রাঁচি কলোনি। ভোরে উঠে উদ্ভব হাঁটতে বেরোনো শুরু করল রাঁচি কলোনির আনাচ কানাচ ঘুরে দেখতে। দু'পাশে ছবির মতো কোয়ার্টার। মধ্যে ঝকঝকে রাস্তা কখনও সোজা কখনও বাঁক নিয়েছে। পথের দু'ধারে কৃষ্ণচূড়ার মাথা নব-বিবাহিতার সিঁদুরে রোমাঞ্চিত। গাছের নিচেও রাঙা মখমলের কার্পেট পাতা। যেন পথিকের বিশ্রামের আয়োজন। কোনও কোলাহল নেই। শুধু পাখির ডাক। তাও একটানা নয়। মাঝেমাঝে অচেনা অজানা পাখিদের সুর ভেসে এসে মনে অদ্ভুত একটা আনন্দের সৃষ্টি করে। কানের আরাম হয়। যা শহুরে হট্টগোলে পাওয়া যায় না। দু'একজন লোককে দেখা যাচ্ছে দুধের ক্যান হাতে নিয়ে বেরিয়েছে কোনও গোয়ালার থেকে টাটকা দুধ নেবার আশায়।

আজ তিন দিন হলো ঠাকুরের সিংহাসনটায় হাত পড়েনি। ফুলগুলো শুকিয়ে করুণ চোখে দেখছে উদ্ভবকে। লোকে যে বলে, কারোর জন্য কিছু আটকে থাকে না! আটকাচ্ছে তো। এই যে তিনদিন ধরে গাছে জল দেওয়া হয়নি। সিংহাসনে ধুলো। এমন তো ছিল না।

উদ্ভব নিজের মনেই বলে, "জীবনে কোনও কিছুই স্থায়ী নয়। শুধু ওই দূরের পাহাড়টা অবিচল, স্থির।"

"দাদা খাবেন না? অফিসের দেরি হয়ে যাবে তো।"

চমকে ঘুরে তাকাল উদ্ভব। কে বলল কথাটা? দিবানাথ না?

এই চলছে ক'দিন ধরে। দিবানাথ থেকেও নেই। আবার না থেকেও আছে।

খেতে বসে ভাবছিল উদ্ভব, "আমি তো কোনওদিন পুজো-পাঠ কিছু করিনি। তাহলে আজ সিংহাসনে পড়ে থাকা শুকনো ফুল দেখে কেন বিচলিত হচ্ছি?"

উদ্ভবের মা এসে ছেলের জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনিই বারবার ব'লে ছেলেকে দিয়ে একটা ঠাকুরের সিংহাসন কিনিয়েছিলেন। অনেক অনুরোধেও ছেলে বিয়ে করতে চায়নি। কিন্তু মা মারা যাবার পর শোক পাথরের মতো চেপে বসেছিল। ধীরে ধীরে সেই পাথরেও শ্যাওলা জমেছে। শ্যাওলা পরিষ্কার করার চেষ্টাও খুব একটা করেনি উদ্ভব। ও জানে, এতে কষ্ট বাড়বে ছাড়া কমবে না।

সেই থেকে দিবানাথ দায়িত্ব নিয়েছে। দিবানাথ বাগানে মালির কাজ করত। এ অঞ্চলে অনেকের বাগানের ভারই ওর ওপর। কোন্ সময়ের কোন্ গাছ, সব ওর নখদর্পণে। সময় মতো মাটি কোপানো, চারা বসানো, জল দেওয়া, সার দেওয়া দিবানাথ নিজের দায়িত্বে করেছে এতকাল।

বলেছিল দিবানাথ, "আপনি তো ঠাকুরের সামনে বসেন না দাদা। কিন্তু মাসিমা যে রেখে গেলো সব। যদি অনুমতি দেন, আমি স্নান করে এসে আপনার বাগানের ফুল দিয়েই পুজো দিয়ে যাব।"

উদ্ভব না করেনি। কিন্তু ওদিকে ফিরেও তাকায়নি কোনওদিন। দিবানাথ নিজের মনে বকবক করে। উদ্ভব শোনে, আবার শোনেও না। কিন্তু ওর উপস্থিতি উদ্ভবের ভালো লাগে। দিবানাথ যেন কংক্রিটের দেওয়ালে মুখ বার করা কচি পাতা। সারল্যই ওর একমাত্র মূলধন।

সেই দিবানাথ কিছু না বলে চলে গেল। আজ আর কারোর প্রতি কোনও অভিযোগ নেই উদ্ভবের। জীবনের অনেকটা পথ পার করে সত্যকে উপলব্ধি করতে শিখেছে উদ্ভব। মানতে শিখেছে। তিন দিন আগে এসেও বাগানের পরিচর্যা, পুজো দেওয়া সব কাজ করে গেছে দিবানাথ। তারপর রাতে হার্ট অ্যাটাক। খবর পেয়ে ছুটে গেছিল উদ্ভব। অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই সব শেষ।

মেনে নিয়েছে উদ্ভব। কোনও হাহাকার নেই। বিচলিত হবার প্রশ্নও নেই। যেন এমনটি হবে, উদ্ভব আগে থেকেই জানত।

অফিসের শেষে আজ বহু দিন পর মাইথন ড্যামের ওপর গিয়ে দাঁড়াল উদ্ভব। বরাকর নদী বয়ে চলেছে তার আপন খেয়ালে। সূর্যাস্তের সিঁদুর রঙা আকাশটা বরাকরের জলে উপুড় হয়ে পড়েছে। আগেও উদ্ভব মাঝেমাঝে এখানে এসে দাঁড়াত। নদীর চলার মধ্যে জীবনের মানে খুঁজত। তবে, আজ উদ্ভব মনের সকল ব্যথা বরাকরের জলে বিসর্জন দিয়ে মুক্তি পেতে চাইল।

কিন্তু দিবানাথ যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না।

উদ্ভব নিজের মনেই ভাবে, "দিবানাথ কি নিজেকে আমার গার্জিয়ান মনে করত? সব সময় খেয়ে নাও, স্নান করে নাও, বিশ্রাম নাও। আশ্চর্য তো!"

বসন্ত আসি আসি করলেও শীত এখনও বিছানা ছাড়েনি। অলস ভঙ্গিমায় থেকে যাওয়ার আবদার জানায় যখন তখন। নদীর হাওয়ায় হালকা কাঁপন ধরানো ভালোবাসা মিশে রয়েছে। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়ালে এ ভালোবাসাও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠতে পারে। এখন তো আর দিবানাথ নেই যে, ওষুধ এনে দেবে। আবার দিবানাথ। কিছুতেই ওকে সরাতে পারছে না উদ্ভব।

কোয়ার্টারের সামনে আসতেই দেখল রাস্তাটা ভিজে ভিজে। বৃষ্টি হলো নাকি? অকাল বর্ষণ? কিন্তু ওদিকের রাস্তা তো শুকনোই ছিল। গেট খুলে লনে পা দিয়েই থমকে গেল উদ্ভব। গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা আনন্দে মেতেছে। নিজেদের মধ্যে গল্পে একেবারে মশগুল। প্রতিটি গাছের গোড়ায় জল। যেন সদ্য দিঘি থেকে স্নান করে ওঠা যুবতী। উদ্ভব যে ঢুকল, সে দিকে খেয়ালই নেই ওদের!

উদ্ভব জোরে জোরেই বলল, "সব দিবানাথের কারসাজি। দু'দিন ছুটি আছে পরপর। এর মধ্যেই সব গাছ আমি কেটে সাফ করে ফেলব। সিংহাসনটাকেও বাগানের পেছনে এক কোনায় ফেলে রেখে আসব। থাকো তেত্রিশ কোটি দেবতা। রোদে জলে ওখানেই তুষ্ট হও।"

সিদ্ধান্ত নিতে পেরে মনটা বেশ ফুরফুরে লাগছে আজ উদ্ভবের। বাগানটাকে পরিষ্কার করে ফেলার জন্য একটা লোক খুঁজতে হবে। সে যদি চায়, সিংহাসন তাকেই দিয়ে দেবে। রাতে আজ জমিয়ে খিচুড়ি রান্না করল উদ্ভব। ঘুমটাও বেশ জাঁকিয়ে এল।

সকালে উঠে চা জলখাবার খেয়ে নিয়ে উদ্ভব বাগানে গেল গাছ তুলে ফেলতে। পূর্ণ উদ্যমে বেলা পর্যন্ত কাজ করল। ফুল সমেত সব গাছগুলোকে উপড়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলল। জড়ো করে রাখল বাগানের এক পাশে।

হাসতে হাসতে সেদিকে তাকিয়ে বলল, "কী, কেমন লাগছে এখন? কাল তো খুব হাসছিলে। আমাকে তো দেখেও দেখলে না। এখন বোঝো।"

উদ্ভব কি পাগল হয়ে গেল? না, পাগল তো ও নয়। মনের গহনে এক বিশাল জায়গা জুড়ে বসেছিল দিবানাথ। ওকে ভুলতেই কি পাগলের খোলস গায় চড়িয়েছে উদ্ভব?

শীলা বহুদিন থেকে উদ্ভবের কোয়ার্টারে ঠিকে কাজ করে। ওকে বলতেই রাজি হয়ে গেলো। পরদিন ওর বরকে নিয়ে এসে গাছপালা সরিয়ে বাগানের জমি পরিষ্কার করে ফেলল। বিকেলের দিকে ভ্যান নিয়ে এসে সিংহাসনটাও নিয়ে গেলো।

যাবার সময় শীলা দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, "ভালো মানুষের বাড়ি থেকে ঠাকুর তুলে নিয়ে গেলাম। তুমি আমার দোষ দেখো না, ঠাকুর। আমি দাদার নাম করে রোজ পুজো করব।"

অফিসের কাজে উদ্ভবকে ইতিমধ্যে চন্দ্রপুরা পাঠানো হয়েছে কয়েক মাসের জন্য। এরকম এর আগেও ওকে যেতে হয়েছে। চন্দ্রপুরা, চন্দ্রপুরাই। সে মায়াবী মাইথন নয়। থাকার ব্যবস্থাও যেরকম, সে উদ্ভব একা, তাই চলে যায়। নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসটুকু নিয়েই ও রওনা দিল। শীলাকে তিন মাসের টাকা দিয়ে গেছে। বাকিটা ফিরে এসে দেবে। শীলার এ নিয়ে চিন্তা নেই। ও জানে দাদা ওকে ঠকাবে না।

চন্দ্রপুরা থেকে ফিরতে উদ্ভবের জুলাই মাস হয়ে গেল। বাইরে থেকেই দেখতে পেল লনের দুপাশের জমি গাছে গাছে ভরে গেছে। ডালে ডালে কচি পাতাদের উৎসব। বর্ষার জল পেয়ে বেল ফুল, দোপাটি স্বমহিমায় ঘাড় দোলাচ্ছে। টগর, গন্ধরাজ গাছগুলো শৈশব বাল্য পার করে কিশোর বেলায় দাঁড়িয়ে। দু'পাশের বাগান দু'হাত প্রসারিত করে উদ্ভবকে আহ্বান জানাল। এ আহ্বানে সাড়া না দিয়ে উপায় কী! বারান্দার এক পাশে ছোট্ট রক তখন বৃষ্টির জলে স্নাত। উদ্ভব এসে ওখানেই বসে পড়ল। দু'চোখ ভরে দেখতে লাগল অনাদরে অবহেলায় বেড়ে ওঠা তার বাগানটিকে।

এতদিন চন্দ্রপুরায় থেকে প্রায় ভুলেই গেছিল উদ্ভব তার মাইথনের কোয়ার্টার, বাগানের কথা। আজ আবার সব কিছু চোখের সামনে ভেসে উঠছে। কিন্তু উদ্ভব তো গাছ উপড়ে ফেলেছিল। লোক দিয়ে বাগান পরিষ্কার করিয়েছিল। তাহলে? এ কী করে সম্ভব!

কিছুক্ষণ এভাবে বসে থেকে উদ্ভব তালা খুলে ঘরে গেলো। দরজা বন্ধ থাকলেও পাঁচ মাসের ধুলোয় মেঝের উচ্চতা বেড়েছে। শোবার ঘরে পিছনের বাগান লাগোয়া জানলাটা খুলতেই পাঞ্চেত পাহাড়। আহ্, চোখের শান্তি! প্রাণের আরাম! তখনই নিচের দিকে চোখ গেল। ঠাকুরের সিংহাসনটা নেই। মা! অনেক শখ করে আনিয়েছিল মা সিংহাসনটা। নাহ্, আর কিছু ভাবতে চাইল না।

শীলাকে বলাই ছিল। ও এসে ঘর ঝাঁট দিয়ে ভালো করে মুছতে লাগল। উদ্ভব স্নান করে শোবার ঘরে ঢুকতেই দেখে যেখানে সিংহাসন ছিল, শীলা তার সামনে হাঁটু ভেঙে বসে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করছে।

উদ্ভবকে দেখে বলল, "দাদা, এই জায়গাটায় পা দেবেন না।"

উদ্ভব এমন ভাব করল, যেন শুনতেই পায়নি।

তারপর বলল, "আচ্ছা শীলা, বাগান তো আমি পরিষ্কার করিয়ে গেলাম। তাহলে, এত গাছ, এত ফুল এলো কী করে?"

শীলা হাসল।

বলল, "শিকড় কি অত সহজে উপড়ে ফেলা যায় দাদা? শিকড় থেকেই যায়। আপনি না চাইলেও।"

শীলা কাজ করে চলে গেছে অনেকক্ষণ।

যাবার সময় বলে গেছে, "দাদা, দরজা আটকে দিন।"

এসব কিছুই শোনেনি উদ্ভব। অথবা শুনতে চায়নি। ওর কানে তখন শীলার আগের কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সত্যিই তো। শিকড় তো থেকেই যায়। জোর করে কোনও কিছুই উপড়ে ফেলা যায় না। মা থেকে গেছে। দিবানাথও থেকে গেছে।

মিলি ঘোষ : পড়াশুনা উত্তর কলকাতায়। বিজ্ঞানের ছাত্রী, তবে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ কিছুটা ছিলই। যদিও জীবনের নানান ঝড় ঝাঁপটায় অনেক দেরিতে এই জগতে প্রবেশ। বছর দুই আড়াই লেখালেখি চলছে, পুজো সংখ্যা ও বিভিন্ন পত্রিকায়।

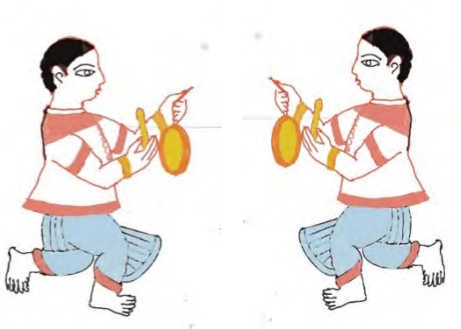

মনে মনে

গল্প

সুদীপ সরকার

চাদরে মাথা মুখ ঢেকে নিয়ে ব্যাঙ্কনিতে এসে দাঁড়াল প্রাঞ্জল। ঘন কুয়াশায় চারদিক ঢেকে আছে, সামনের বড় রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে খুব সন্তর্পণে, ফগ লাইট জ্বালিয়ে। সকাল সাড়ে সাতটার পরেও এত কুয়াশা অনেক দিন দেখেনি কোলকাতা। জলাশয় থাকলে সেই সব জায়গায় কুয়াশা বেশি হয় বলে জানে প্রাঞ্জল, কোলকাতায় আর জলাশয় আছে কটা; যেটুকু যা ছিল প্রমোটার দের সৌজন্যে সবই বুজিয়ে গিয়ে বহুতল উঠেছে। ইদানিং কোলকাতায় দূষণের মাত্রা অনেকটা বেড়েছে, বোধহয় সেই কারনেই এত কুয়াশা! খদ্দরের চাদরটা ভালো করে টেনে মাথা ঢেকে নিল প্রাঞ্জল, আজকাল এই সব জিনিস বাজারে পাওয়া যায়না। সেই কবে কার কথা, চাকরির শুরুতে গুরগাও যাওয়ার সময় বাবা দিয়েছিলেন, সেই থেকেই এই জিনিসটি ওর সঙ্গে আছে, বাবা গায় দিতেন এই চাদরটা। গত বাইশ বছরে কত কিছুই তো ছেড়ে গেছে বা ছেড়ে দিতে হয়েছে, এমনকি বাবাও ছেড়ে গেছেন বেশ কয়েক বছর হোল কিন্তু এই চাদরটা ছাড়ে নি প্রাঞ্জল, প্রতি বার শীতের সময় আলমারি থেকে সেটা বেরোয় নিয়ম করে। সত্যি বলতে কি, সোমলতা বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছে এটি বাতিল করার, "এতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই, এবারে পাল্টাও, অনেক দিন তো গায় দিলে।" প্রাঞ্জল শোনেনি, "তোমার ভাবনা তোমার, এটা আমার কাছে শুধু চাদর নয়, আরও বেশি কিছু, শুধু কম্ফোরট লেভেলের ব্যাপার বা স্মৃতি মেদুরতা ই নয়, ঠিক ব্যাখ্যা করা যাবে না।" সোমলতা জানে, প্রাঞ্জল এসব ব্যাপারে খুব একগুয়ে, কিছু শুনতে চায় না।

কুয়াশা আস্তে আস্তে কাটছে, পূব দিকে দেবদারু গাছের ফাঁকে ফাঁকে হাল্কা আলোর ঝিলিক। সোমলতা আর চিকু এখনো দিব্যি ঘুমোচ্ছে, মিনুর মা আসে আটটার দিকে, তখন উঠবে সোমলতা, তারপর ছেলেকে তুলে রেডি করবে স্কুলের জন্য। আজ আবার চিকুর স্কুলে প্যারেন্ট টিচার মিটিং আছে, প্রাঞ্জল ফার্স্ট হাফটা ছুটি নিয়ে রেখেছে মিটিঙয়ে যাবে বলে। সোমলতা বারবার বলেছে, "সবার বাবারা আসে, শুধু মা গেলে হয়না, মিস গড়গড় করে ইংলিশে বলে যায়, তুমি গেলে সুবিধে হয়।" অন্যদিন সাড়ে নটার দিকে প্রাঞ্জল বেরিয়ে পড়ে অফিসে, সোমলতা চিকুকে নিয়ে বেরোয় একটু পরে, দশটার সময়। চিকুর স্কুল সাড়ে দশটা থেকে, সোমলতা ছেলেকে স্কুলে নামিয়ে ঘণ্টা দেড়েক সময় কাটিয়ে ফেরে। চিকুর বন্ধুদের মায়েরা কয়েকজন মিলে একটা ছোট ঘর নিয়েছে স্কুলের সামনে, মাসে হাজার দেড়েক লাগে, দুশো করে দিতে হয় সবাইকে। খানিক আড্ডা আর খানিক বাচ্চাদের পড়াশুনা নিয়ে চর্চাতে সময়টা ভালোই কেটে যায়। সোমলতা অবশ্য অন্যদের মত পুরো সময়টা থাকে না ওখানে, ফেরার সময় পুল কারে ফেরে চিকু। চিকু এখন সবে ক্লাস থ্রি, মিস কি পড়াচ্ছে, কি টাস্ক দিচ্ছে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারে না সবসময়, আর ছেলের প্রোজেক্ট নিয়ে সোমলতা রীতিমত ব্যাতিব্যাস্ত। মায়েদের ক্লাবে বসে ক্লাস নোটস তুলে আনে সোমলতা, বুঝে নেয় প্রোজেক্টে কি কি করতে হবে।

চিকুর পড়াশোনার ব্যাপারে নাক গলায় না প্রাঞ্জল, সেই সময়ও নেই ওর; তবে ছেলের ইংরেজি শেখার ব্যাপারে খানিকটা উৎকণ্ঠা আছে। সোমলতা নিজে বাংলা মিডিয়ামে পড়েছে, গড়পড়তা বাকি পাঁচটা মেয়ের মতই ইংরেজি শিখেছে সিলেবাসের গণ্ডির মধ্যে থেকে, টিনার মা, শ্রেয়ার মায়ের মত ফটফট করে ইংরেজি বলতে পারেনা স্বাভাবিক কারণেই। প্রাঞ্জল বাংলা মিডিয়ামে পড়লেও পরবর্তীতে নিজেকে তৈরি করেছে তিল তিল করে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় থেকেই ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যাস করতে থাকে নানা ভাবে। কর্পোরেট সেক্টারে কাজ করার সুবাদে প্রাঞ্জল জানে, ইংরেজি বলতে না পারলে, এই সব জায়গায় টিকে থাকা কতটা কঠিন। ইঞ্জিনিয়ারিং এর সব থেকে ভালো ছাত্রও স্রেফ ইংরেজি বলতে না পারার কারণে কর্পোরেটে মানিয়ে নিতে পারেনি, এমন ঘটনা প্রাঞ্জল বহু দেখেছে। তাই, ছেলেকে ইংরেজি শেখানোর জন্য যা যা করার সব কিছু করতে রাজি আছে ও। প্রথম ধাপ হিসেবে স্কুলে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে বাংলার পরিবর্তে হিন্দি নিয়েছে চিকু। সোমলতার আপত্তি থাকলেও প্রাঞ্জল শোনেনি, "বাংলা পড়লে, শুনলে কিছুতেই ইংরেজি

শিখতে পারবে না। যুক্তি পাল্টা যুক্তি থাকবে কিন্তু এছাড়া কোন উপায় নেই।" তবে যত সমস্যা চিকুকে নিয়ে। একে তো ছেলে ভীষণচঞ্চল তার ওপর সে একেবারেই ইংরেজি শিখতে আগ্রহি নয়। এই নিয়ে গত কাল বেশ খানিকটা কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে সোমলতার সঙ্গে। চিকুকেও বকা ঝকা করেছে প্রাঞ্জল, ছেলেটা একদম ইংরেজি শিখছে না, ছোট থেকে ভিত না তৈরি হলে পরে আর শেখা যায়না অথবা সেটা খুব কষ্ট সাধ্য হয়, নিজেকে দিয়ে বুঝেছে প্রাঞ্জল।

অনেক বলেও লাভ হচ্ছে না দেখে মাথা গরম করে গলা তুলে কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিয়েছে সোমলতা কে, " বাচ্চাদের সঙ্গে ঘরে ইংরেজিতে কথা বলতে হয়, তুমি সেটা পারলে ছেলেটা এত দিনে দিব্যি তৈরি হয়ে যেত। তুমি যদি ভাব ছেলে শরৎচন্দ্র বা বিভূতিভূষণ পরে আতেল হবে তাহলে মূর্খের স্বর্গে বাস করছ, মনে রেখো, আরও তিনশো বছর আমাদের দেশে কলোনিয়াল কালচার রেলিভেন্ট থাকবে।" সোমলতাও মেজাজ ধরে রাখতে পারেনি, পাল্টা বলতে দুবার ভাবেনি, "বাবা হিসেবে কতটুকু কর্তব্য কর তুমি? ছেলের পড়াশোনা নিয়ে কোনদিন খোঁজ নাও? আমি না হয় পারিনা, তুমি কেন ইংরেজিতে কথা বলনা চিকুর সঙ্গে? অবশ্য, ঘরে থাকো ও বা কতটুকু সময়; অফিস অফিস করেই তো গেলে।" প্রাঞ্জল আর কথা বাড়ায় নি, শুধু সোমলতা কে দোষ দিলেও ঠিক হবে না, স্কুল গুলো ও হয়েছে তেমন, ক্লাস থ্রি র বাচ্চার মাইনে মাস গেলে সাড়ে পাঁচ হাজার, সঙ্গে দুদিন পরে পরে এই দাও সেই দাও অথচ বাচ্চারা স্কুলে বাংলাতে না হিন্দিতে কথা বলছে সেটা দেখার তাগিদ নেই তাদের। আরে বাচ্চারা মাতৃ ভাষায় কথা বললে জীবনেও ইংরেজি শিখতে পারবে না, ভুল ঠিক যাই বলুক, তাদের ইংরেজিতে বলতে হবে, আর এই ব্যাপারে স্কুলের নজরদারি একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্কুল বা টিচার, দুই তরফেই দিব্যি উদাসীন ভাব, বাচ্চারা ইংরেজি শিখল কি না শিখল সেটা নিয়ে ভাবার ফুরসৎ নেই কারো।

নামি স্কুলের ই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে মানুষ কোথায় যাবে! এদিকে দিল্লী বা মুম্বাই এই ব্যাপারে অনেক এগিয়ে। মাস খানেক আগে দিন চারেকের জন্য দিল্লী যেতে হয়েছিল প্রাঞ্জল কে; পার্টনার কোম্পানির এমডি মিঃ দত্তর নয়ডার বাড়িতে একদিন গিয়েছিল তখন, ভদ্রলোকের মেয়ে ক্লাস ফোর না ফাইভে পরে, কি সুন্দর পটর পটর করে ইংরেজিতে কথা বলল ওর সঙ্গে। অথচ চিকু সেদিক থেকে একেবারে গোল্লা, এই বয়েস থেকে ধরতে না পারলে কিছুতেই শিখতে পারবে না। প্রাঞ্জলের মনে হয়, প্রবাসি বাঙালীরা অনেক ব্যাপারেই এগিয়ে আছে কোলকাতার বাঙালীদের থেকে। বাড়ির সমস্যা না থাকলে, মা বাবাকে দেখার কেউ থাকলে কোলকাতায় হয়ত ফিরত না ও। এখন যদিও কোলকাতায় পাকাপাকি ভাবে মন বসে গেছে, সব হিসেব নিকেশ বাদ দিলেও কোথাও গিয়ে যেন মনে হয় ভালোই হয়েছে ফিরে এসে, তবু তো নিজের জায়গা, নিজের শহর! তবে চিকুর ভবিষ্যৎ নিয়ে মাঝে মাঝে চিন্তিত হয়ে পরে প্রাঞ্জল, এত ছেলে মেয়ে, এত কম্পিটিশান, চিকু কি পারবে এই ইঁদুর দৌড়ে টিকে থাকতে! আগের পিটিএম গুলোতে যায়নি প্রাঞ্জল, আজ যাবে, দরকার পড়লে ধুইয়ে দেবে ক্লাস টিচার কে, দেখা যাবে তারপর কি হয়!

একে একে বাবা মায়েরা ক্লাস রুমে ঢুকছেন আর টিচার তাদের বাচ্চার ব্যাপারে বিশদে কথা বলছেন ওয়ান টু ওয়ান। বাচ্চা কোন সাবজেক্টে ভালো করছে, কোন সাবজেক্টে বাড়িতে স্পেশাল কেয়ার নিতে হবে সেই নিয়ে খোলামেলা আলোচনা। সোমলতা জানে অয়নের মা, টিয়ার মা, শ্রেয়ার মা অকারণে মিস মিস করবে, অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মিসের সাথে বকবক করবে, এদের জন্য সময় বেশি লাগে! এসব আদিখ্যেতা না করলে চলে না এমন মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়, মায়েদের আড্ডাতে এই নিয়ে কম কথা হয়না। অন্য বারে ওকে একা ফেস করতে হয় মিস কে, এবারে প্রাঞ্জল থাকায় সোমলতা কিছুটা ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে। বাচ্চারা প্লে গ্রাউন্ডে খেলছে, বাবা মায়ের সঙ্গে তারা থাকবে না, ক্লাস টিচার সাব্রিনা মিস বাচ্চাদের সামনে কথা বলবেন না। প্রায় পচিশ মিনিট পর প্রাঞ্জল সোমলতার সুযোগ এলো। প্রাঞ্জল কি বলবে আগে থেকে ভেবে রেখেছিল কিন্তু মিস সাব্রিনা বলতে শুরু করলেন, "সি, পরম হ্যাস সো ফার বিন ওকে বাট সিন্স দা লাস্ট ফিউ ডেস, হি ইস বিহেভিং ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে। " সোমলতা বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি বলছেন ম্যাম, বাড়িতে তো সেভাবে কিছু দেখিনি, এমনিতে সব কিছুই নর্মাল আছে, একটু পরিস্কার করে বলুন প্লিস? "

"নিশ্চই বলব," সোজা হয়ে বসলেন সাব্রিনা মিস, "দেখুন, কিছুদিন থেকেই নোটিস করছি, ও কারুর সাথে কথা বলছে না, কিছু জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দিতে চাইছে না। দিস সিমস টু বি আ বিট সারপ্রাইসিং। এন্ড হোয়াট ইস মোর স্ট্রেঞ্জ ইস দ্যাট, হি হ্যাস স্টারটেড এবিউসিং আদারস। আজকাল ও সবাইকে শুধু রাস্কেল, স্টুপিড এই সব বলছে, এমনকি কাল দুজনের খাতায় পর্যন্ত বড় বড় করে রাস্কেল লিখে দিয়েছে। ডোন্ট ইউ থিঙ্ক দিস টু বি স্ট্রেঞ্জ? " প্রাঞ্জল কিছু বলার চেষ্টা করল, এমন ধরনের কিছু শুনবে সেটা ওর ভাবনার বাইরে ছিল। চিকুকে বাংলায় কথা বলতে বারণ করেছে বটে কিন্তু তার জন্য বাচ্চাটা সম্পূর্ণ কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে, এটা দূর কল্পনাতেও ভাবতে পারেনি ও। দিন কয়েক আগে বকাবকি করার সময় বার কয়েক রাস্কেল স্টুপিড ইত্যাদি বলেছিল রাগের মাথায়, সেটাও খুব তীব্র ভাবে ওর ভিতর প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে, বুঝল প্রাঞ্জল। মিস সাব্রিনা বললেন, "দেখুন মিঃ রায়, চাইল্ড সাইকোলজি ইস নট দ্যাট ইসি, ওদের মনের ভিতর কি চলছে সেটা বোঝার জন্য ওদের সঙ্গে মিশতে হবে ওদের মত করে।"

"আসলে আমরা ওর ইংরেজি শেখার ব্যাপারটা নিয়ে একটু ওয়ারিড থাকি, ও সেভাবে ভাষাটা শিখতে পারছে না বলেই মনে হয়, তাই....." প্রাঞ্জল কে থামিয়ে মিস সাব্রিনা বললেন, "বাট মিঃ রায়, ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, লার্নিং ইস আ প্রসেস, ওয়ান ক্যান্ট লার্ন আ ল্যাঙ্গুয়েজ ওভারনাইট, ইট টেকস টাইম। বাচ্চারা নিজের মত করে বেড়ে উঠবে, বুঝবে, শিখবে, আমরা সেটাই চাই। হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। এস প্যারেন্টস, ইউ হ্যাভ টু বি মোর ইন্টিমেট উইথ হিম এন্ড বি হিস ফ্রেন্ড টু। " ক্লাস রুম থেকে বেরিয়ে প্রাঞ্জল আর সোমলতা প্লে গ্রাউন্ডে চলে এলো চিকু কে নিতে। বাচ্চারা হুটোপুটি করে খেলছে মাঠ জুরে। চিকু প্লে গ্রাউন্ডের এক কোনে বেঞ্চে বসেছিল চুপ করে। পিছন দিক থেকে এসে প্রাঞ্জল চিকুর মাথায় হাত রাখল, আদর করে ডাকল, "চিকু, তুমি খেলছ না? "চিকু কোন উত্তর দিল না, মাথা নিচু করে বসে রইল। সোমলতা কিছু বলতে পারছিল না, গলার কাছটা ভারি হয়ে এসেছে। চিকুর কাছে ঝুঁকে এসে প্রাঞ্জল বলল, "চিকু, তুমি জানো, মিস কত ভালো বলেছেন তোমার কথা! চল, আজকে আমরা শুধু খেলব আর গল্প করব, আজকে সব ছুটি।"

সুদীপ সরকার,যুগ্ম সচিব,পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
সেন্ট জেভিয়ারস স্কুল এবং রহরা রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াশোনা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, সরকারি চাকরিতে (রাজ্য সরকারি সিভিল সারভেন্ট) আসার পরে লেখালিখির শুরু। আনন্দবাজার রবিবাসরীয়, সানন্দা ওয়েব মাগ্যাজিন, পরবাস ওয়েবজিন, নবকল্লোল এবং নানা পত্র প্ত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

ত্রিভুবন কাপ

রম্য রচনা

অদিতি ঘটক

--এই হচ্ছে তোর বাবার মুস্কিল। কত করে বললাম, পাঁচ দিকে মাথা, চোখ দেবে না। তা শুনলে তো! নাম থাকলেই কি তার ব্যবহার যখন তখন করত হবে!

আমারও তো আছে। দুমদাম ব্যবহার করি ! এমন তে চোখা লোক দুটো দেখিনি। তাও যদি পুরো খুলতো ! সারা জীবন ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই গেল।

----- হ্যাঁরে, লকু

--------ওহ মম, কল মি ল্যাক্স। ওই সব মান্ধাতা আমলের নামে আমায় ডাকবে না। একটু মড হতে শেখ। আফটার অল আমার একটা ফ্যান বেস আছে। এই সব নাম শুনে ফেললে রেপুটেশনের কি হবে বলো তো!

--ধুত্তোর, কথাটা শোন না। তোর ওই বাহন তো রাতে দেখতে টেকতে পায়। ও যদি হেড দেয় বা ডানা দিয়ে দিলেও তো আর হ্যান্ড বল হবে না। কি বলিস--

---ও মম, আমার আউল ফাউল করবে যে। পেনাল্টি বক্সের সামনে করলে, তখন! অপনেন্ট সুবিধা পেয়ে যাবে না! ও তো হ্যালজেন আলোয় একেবারে ব্লাইন্ড। সকালের মতো আলো কিনা। না না ও মাঝ মাঠেই দৌড়াক। মানে উড়ুক।

এখানে ডাল গলল না দেখে উনি এগিয়ে গেলেন।----সরো, এই সরো....

লক্ষ্মী এতক্ষন আয়নার সামনে বসে আবার একপ্রস্থ মেকআপ লাগাচ্ছে। মায়ের কথায় একটু থেমেছিল। আয়নায় ঘুরেফিরে নিজেকে দেখছিল। হাতে ধরা লিপস্টিকটা এতক্ষন কথা বলার জন্য ঠিক করে দিতে পারছিল না। মা, দিদির দিকে মন দেওয়াতে ও প্রসাধনে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারল। ভালো মেকআপ না হলে ক্যামেরায় ছবি ভালো আসবে না। গোটা স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিলোক জোড়া খেলা। নিজেকে একটু ভালো না দেখলে হয়! মাঠে নামার আগে টুকস করে একটা স্টোরি আপলোড করতে হবে। কতটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। লাইক, কমেন্ট কম হয়ে যাবে।

ধীরে সুস্থে সরস্বতী এলো। কিন্তু তার দৃষ্টি উদাস। সে কিছু ভাবছে। মুখটা শুকিয়ে আমশি। লেখা পড়া নিয়ে চারিদিকে যা চলছে তাতে আর মুখ দেখাবার জো নেই। কিন্তু এখন অত দেখলে হবে না। আগে এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে।

-----সরো, কি করি বলতো, হাফ টাইম শেষ হতে চলল। তোর বাবা যে কোনো কম্মের নয়। জানিসই তো। তিন গোল খেয়ে বসে আছে। বলে কিনা উর্দ্ধ নয়নটা আধ বোজা তো তাই বলটা মাথার উপর দিয়ে যাওয়ার সময় ঠাহর করতে পারিনি। আগের গোল দুটো শুধু আরও চারটে মুখ বার করে চতুর্দিকের গ্যালারির সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে দেখতে গিয়ে বার পোস্টের একবার পুবদিকে আর একবার পশ্চিমদিকে বল সেঁধিয়ে গিয়ে গোল খেলো। সম্মুখ বাগে আর দেখতে পেলো না। এরা সবাই সমান। মেয়ে দেখলেই হলো। হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। যেন জম্মে ও জিনিস দেখেনি! আর এখানে তো ত্রিভুবনের সমাবেশ। কত রকমের, কত ধরনের সুন্দরীদের সমাহার তার ইয়ত্তা নেই।

আমি কত করে পাখি পড়ার মতো বোঝালাম। তুমি শুধু বল গোলে আসছে কিনা, সেই দিকে নজর দেবে। তা না! আমার বাবার যজ্ঞের সময় তোর বাবার নিন্দে শুনতে না পেরে শুধুমুধু প্রাণ ত্যাগ করে খুব ভুল করেছি। আমার বডি কাঁধে নিয়ে ঘুরে লোকটা

এত যুগ ধরে কেমন পত্নীব্রত'র ফুটেজ খেয়ে গেল। মরন বাঁচান ম্যাচ। কোনও কমিটমেন্ট আছে! আমার তো দশটা হাত আছে। আমি বার করছি! হ্যান্ড বল হয়ে যাবে না। হ্যাঁরে, তাহলে কি 'হ্যান্ড অফ গড' থুড়ি গডেস দেবে!

তোর হাঁসটাও তো তথই বচ! নড়তে চড়তে ছ মাস। মরালি চলন দিয়ে কি এট্যাকে যাওয়া যায়! আর ওকে ফরোয়ার্ড এ দেওয়া যাবে না। ও ওই থপ থপ করে ব্যাকেই খেলুক। অন্তত বিপক্ষের প্লেয়ার এলে যেন একটু তেড়ে টেড়ে যায়। দেখিস, ডিফেন্সটা যেন ঠিকঠাক করে। নাহলে মহিষাসুরের দল গো হারান হারিয়ে দেবে।

মনে মনে ভাবেন, যত ভাবনা সব তাঁর। আর সবাই মোচ্ছবে এসছে। ব্র্যান্ডেড জামা জুতো পরে ঘুরছে ফিরছে। রিল বানাচ্ছে, ইন্সটা স্টোরি করছে। এমনকি ম্যাচ না থাকলে ভুজুংভাজুং বুঝিয়ে প্র্যাকটিস ফাঁকি দিয়ে ক্রুজে জল বিহার পর্যন্ত করছে। হায়, সবই তাঁর পোড়া কপাল!

সরস্বতী মাথা নাড়ায় যত ধীরে, দেহ নাড়ায় তার থেকেও আস্তে। মা দুগ্গা, মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হন্তদন্ত হয়ে পা বাড়ান।

এগিয়ে গিয়ে দেখেন ময়ূর নানা ভঙ্গিমায় হাজার হাজার টিভি ক্যামেরার সামনে পোজ দিচ্ছে। আকাশে মেঘের ছিটে ফোঁটা না থাকলেও ফ্ল্যাশের ঝলকানিতে পেখম মেলে এধার ওধার করে ভালোই ঝলকাচ্ছে। মাঠ জুড়ে দৌড়নোর বেলায় অষ্টরম্ভা। দু পা গিয়েই হাঁপিয়ে যায় নয়তো পোকা মাকড়ের খোঁজে ব্যস্ত হয়ে যায়। বিপক্ষের বলশালী অসুরেরা যে পা থেকে বল নিয়ে ডজ করে এগিয়ে চলেছে সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। ভাবেন কি দল নিয়ে তিনি মাঠে নেমেছেন ! আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখেন একজায়গায় মৌমাছির মত একগাদা মেয়ে ভনভন করছে। কলতলার কলকল শব্দ হচ্ছে। তাদের ফোকাস পাওয়া নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। মা দুগ্গা বুঝতে পেরে ওইখান থেকেই হাঁক পাড়েন----- কেতো.., ও বাবা কেতো.., শোন না, বিশ্বসুন্দরী ফ্যানেদের সঙ্গে সেলফি তোলাটা একটু মুলতুবি রাখ। তিন গোল শুধে জিতব কি করে সে দিকে একটু ফোকাস কর।

কেতো একটু পাশ কেটে কাত হয়ে মুখে হাসির রেখা টেনে হাত নাড়তে নাড়তে চাপা গলায় মায়ের কানে কানে বলে--- ডোন্ট ওরি, নন্দিদাকে ট্রেনিং দেওয়া আছে। চারপায়ে পুরো মাঠ কেমন দৌড়াচ্ছে দেখছো না। ও ঠিক ম্যানেজ করে নেবে। না হলে বাবার প্রেতগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।

মা দুগ্গা বড় বড় চোখ করে কার্তিকের দিকে তাকান। চাপা গলায় ধমকে ওঠেন, ----একদম ওইসব ফাউল প্লে নয়। রেফারি নারদ কাকু সব রাষ্ট্র করে দেবে। আমরা খেলা থেকে একেবারে ব্যান। চিরতরে নির্বাসন যাকে বলে। আর ত্রিলোকে বেইজ্জতির চূড়ান্ত। মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। এমনিতেই কি কম অসম্মানের জায়গায় আছি। সরো দিদির দিকে তাকানো যাচ্ছে না। যদিও এতে ওর কোনও দোষ নেই। তার ওপর আবার ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তোর মাথায় এ সব বুদ্ধি আসে কোত্থেকে ? মাঠ জোড়া কত ক্যামেরা, মাথার ওপর ড্রোন, এত দর্শক, অসুরদের মতো শক্তিশালী অপনেন্ট এত চোখ ফাঁকি দেওয়া যাবে?

ফার্স্ট হাফে চন্ডর হেড লেগে গণেশের পেটে আর শুঁড়ে চোট লাগে। মেডিক্যাল টিম সেবা শুশ্রসা করেও তাকে আর মাঠে নামতে পারেনি। সে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে ডাগ আউট এ বসে খেলা দেখবে। যদিও বা শুড় দিয়ে গোলের একটা চান্স ছিল তাও ওই হতচ্ছাড়া মহিষাসুরের দল বরবাদ করে দিল। উঁহু, বাবা, শুড় দিয়ে গোল হলে তো আর হ্যান্ডবল বলে দাগিয়ে দিতে পারতে না। সান্ত্বনা একটাই যাওয়ার সময় গণেশ ওর ভুঁড়ি দিয়ে এমন ঠেলা দিয়েছে যে মুন্ড একেবারে মাঠের বাইরে।

গণেশের বাহন ইঁদুর পুরো মাঠ এধার ওধার অনেক দৌড়েছে। কিন্তু মাঠের ঘাস কুট কুট করে কাটার জন্য। জাল কাটারও তাল করছিল। যদিও বকে ঝকে তাকে নিরস্ত করা হয়েছে। শরীর আর ওজনে ছোট বলে দুপক্ষের বিশেষ করে মহিষাসুরের দলের ওই বিশাল কেলো পাহাড় প্রমান পায়ের তলায় পিষে যাবার সম্ভাবনা বেশি। যদিও বিপক্ষের গোল পোস্টের কাছে সেই সর্ব প্রথম পৌঁছেছে। একটা গোল প্রায় সে করেই ফেলেছিল তবে কচি বিদেশি ঘাস দেখে একটু সরে গিয়ে আর মহিষাসুরের দলের লোক ওদের দিকে থাকায় বিশ্ব ফুটবলের নতুন নিয়মে, কম্পিউটারের সব জটিল হিসেব নিকেশে অফ সাইড হয়ে যায়। যাও বা একটা গোল হল তাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। জয়া, বিজয়াকে এই সেকেন্ড হাফে নামবেন ঠিক করে রেখেছেন। ভাই মৈনাককে ডাকবেন কিনা ভাবছেন। যদি মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে ! এই রকম একটা হাই টেনশনের ম্যাচ ওই চেহারা নিয়ে দাঁড়ালে এডভেন্টেজ ডিসএডভেন্টেজ দুটোই আছে। বল ট্যাকল করতে গিয়ে ধাক্কা লাগলে হাড়গোড় ভেঙে যেতে পারে। সরে যা, সর বলতে বলতে সময় পেরিয়ে যাবে। মাঠ জুড়ে দৌড়নো ওর দ্বারা হবে না। কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। মহাদেব যদি কোনো নিদান দেন।

---" তোদের বাবা কোথায়, প্রভু কোথায়" খুঁজতে খুঁজতে দেখেন ড্রেসিং রুমের একদম ভেতর দিকে কোণ ঘেষে প্রচুর ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠেছ। মা গিয়ে ধাক্কা দেন। প্রথমবারে কোনো কাজই হয়না। বাবা একদম তুরীয় অবস্থায় অবস্থান করছেন। এবার সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে ঠেলা দেন সাথে অভিমানী কান্না মেশানো গলার টনিক-- "তুমি কি একটু আমার প্রেস্টিজের কথা ভাববে না। আমারা এই ভাবে অসুরদের কাছে হেরে যাবো? স্বর্গে মান সম্মান বলে আর কিছু থাকবে ? এমনিতেই শুনছি দেবতা অসুরদের মধ্যে গোলমাল শুরু হবো হবো পর্যায়ে। সাধারণ অসুরেরা আমাদের নামে ছড়া কেটে ব্যাঙ্গ করছে। ঢাক, ঢোল বাজাচ্ছে। শিঙ্গা ফুঁকছে। হেরে গেলে কি হবে বলোতো ? আমরা তো স্বর্গ ছাড়া হবো। কি গো আমাদের সম্মানের কথাটা একটু ভাবো ! ভোকাল টনিকে মন্ত্রের মতো কাজ হয়। মহাদেব তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ান কিন্তু পা বাড়াতে গিয়ে সামান্য টলে যান। মা দুগ্গা একটু মুখ বেঁকিয়ে টলে যাওয়াটা উপেক্ষা করেন। বলেন এইবার কিন্তু বলের থেকে চোখ সরাবে না। তুমি তো ত্রিকালদর্শী আগে থেকে একটু আঁচ করে নিও। কেমন। বললেন বটে তবে ভরসা ওনার খুব কমই হচ্ছে। ভাবছেন সিংহকে মাঠে নামবেন কিনা। কিন্তু কোন পজিশনে। গোল কিপার হলে যদি ইঁদুর আবার জাল কাটতে বসে যায় ! মাঝ মাঠে হলে আবার কোনো সমর্থক 'আমাদের সিম্বল' বলে যদি তুলে নিয়ে যায় ! ত্রিভুবনে কতজনেরই তো সিংহ চিহ্ন দেখলেন। প্রেতকূলকে একবার খবর পাঠাবেন ! ওরা একটু আভাস পেলেই হইহই করে চলে আসবে। কিন্তু যদি দক্ষযজ্ঞর মতো সব লন্ডভন্ড করে ! সাংঘাতিক কনফিউশন।

মা দুগ্গা ভাবছেন দশটা হাতের বদলে রাবণের মতো দশটা মাথা হলে নিজেই কতগুলো হেড দিতে পারতেন ! সেই সময়ই মাঠে নামার বাঁশি বেজে গেলো।

----'বাঁশি বেজে গেছে। এই টুপুল পেনাল্টি কিকগুলো দেখ। ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি। কি হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। দারুন টেশশন হচ্ছে।

একটা করে শটের পরই ঠাম্মা মাথায় হাত ঠেকিয়ে দুগ্গা দুগ্গা করে উঠছে।

অদিতি ঘটক: গৃহবধু তবে ভালোবাসা লেখালেখি। সাপ্তাহিক বতর্মান ও আনন্দ মেলাতে লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক পত্রিকা ও ই ম্যাগাজিনে ও লেখা প্রকাশিত হয়।

পুজোর স্মৃতি -- স্মৃতির পুজো

তমেকা ঘোষ

সময়টা ১৯৯০। দিন গুলো ছিল বড্ড প্রিয়, একেবারে রসগোল্লার মত মিষ্টি ও পুষ্টিকর | বাড়ির পাশেই পুজো হত পাড়ার বারোয়ারী দুর্গা মণ্ডপে। প্রত্যেক বছর একজনই কুমোর জেঠু ঠাকুর তৈরি করতো ।খড় সুন্দর করে বেঁধে যখন থেকে শুরু হত ঠাকুর তৈরি, আমাদের মনের ঢাকে কাঠি পড়ে যেত | স্কুল থেকে ফিরেই চলে যেতাম মণ্ডপে , জেঠুর মনের মাধুরী মিশিয়ে দুর্গা তৈরি দেখবো আর বলবো "ও জেঠু কবে শেষ করবে পুজো তো বেশি দেরি নেই গো।"

পুজো মণ্ডপের সামনের মাঠটাতে সারা বছর আমরা খেলতাম কিন্তু এই সময় খেলাতেও মন বসতো না কারোর | খড় দিয়ে বাঁধার পরে মাটির প্রলেপ শুরু হত | আস্তে আস্তে রূপ পেতেন মা দুর্গা | তখন সনৎ সিংহের সেই গানটা খুব মনে বাজত -- " এতক্ষণে হয়ত মায়ের কেশর দিলো জুড়ে / অসুর বুঝি বেরিয়ে গেছে মোষের পেটটি ফুঁড়ে / মন বসে কি আর ?" সত্যি তো , ঠাকুর ,নতুন জামা , জুতো, পাড়ার পুজো , ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখা -- কত প্ল্যান প্রোগ্রাম -- পড়ায় কি মন বসানো যায় ? কে আর বোঝে মনের কথা ! বাড়িতে মা , স্কুলে স্যার ম্যাডাম , অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য বকুনিও দিতো খুব । কিন্তু তাই বলে আনন্দে ভাটা ফেলতে পারেনি কোন শাসনের ছড়িই । স্কুল ছুটির পরে মাঝে মাঝে বাড়ি না গিয়ে সোজা ঠাকুরতলায় চলে যেতাম , ছোটকাকা এসে কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেত । মন খারাপ করে চলে যেতাম ঠিকই কিন্তু পুজো যত এগিয়ে আসতো , ওই ভুল বারবার হতে থাকত | জেঠুর মাটি লাগানো শেষে কিছুদিনের জন্য শুকাতে দেওয়া হত | তারও কিছু দিন পর চুন লাগানো আর ঠাকুরের মুখ তৈরি । " ও জেঠু, রং শুকোবে তো ? বৃষ্টি হলে? ও জেঠু মহিষাসুরকে খারাপ করে তৈরি করবে ও কিন্তু ভীষণ পাজি। "জেঠু মনে মনে হাসত | তখন থেকে খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ | মা চার পাঁচবার ডাকতে আসবে তবু বাড়ি যাওয়া হবে না। রং লাগানো শেষে শাড়ি পরানোর পালা । মৃন্ময়ী মা যেন এবার চিন্ময়ী রূপ পাচ্ছে। মহালয়ার দিন পরিবারের সবাই মিলে দাদুর ঘরে বসে রেডিওতে মহালয়া শুনতাম | ষষ্ঠীতে বোধন দিয়ে শুরু হত পুজো। নতুন জামা , নতুন জুতো ও তার সাথে ফ্রি গিফট পায়ে ফোস্কা --- ওই কটা দিন বাঁধনহারা , আমরা সবাই রাজা | দিনগুলো এখনো যেন সোনার অক্ষরে লেখা আছে স্মৃতির পাতায় |

শৈশব থেকে কৈশোরে গেলাম | পুজো নিয়ে উদ্দীপনা , উত্তেজনা একই রইল কিন্তু তার প্রকাশ গেল বদলে | " আমি তখন নবম শ্রেণী , আমি তখন শাড়ি "| দুগ্গা মায়ের দিকে আর সবটুকু মনোযোগ নেই , মন ঘুরছে , কিছুটা উড়ছেও | মনে পড়ে সেই ক্লাস নাইনএ পড়তেই বন্ধুদের সাথে প্রথমবার ঠাকুর দেখার পারমিশন পেয়েছিলাম | সে কি মজা , কি খুশি | বন্ধুরা কে কি শাড়ি পড়ব , কিভাবে চুল বাঁধব , সব নিয়ে কত আলোচনা , গোল টেবিল বৈঠক | আমরা এখনকার ছেলেমেয়েদের মত এত স্মার্ট ছিলাম না , বয়ফ্রেন্ড - গার্লফ্রেন্ড শব্দগুলো এতো সহজে মুখে আসতো না , শুধু মনের নিভৃত কোনে কিছু চাউনি , একটা হালকা হাসি বা ছোট্ট কথা দোলা দিয়ে যেত এমন , সে দোলা হিল্লোল তুলতো অনেকদিন | পুজোর সময় আমার সব বন্ধুদের মত আমারও প্রেম পেত | বাড়ির কড়া শাসনের ভয়ে একেবারে " প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোহারে " না হলেও ," একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি " টাইপের প্রেম হত বই কি | মনে পড়ে জীবনে প্রথমবার এই পুজোর সময়েই শুনেছিলাম শঙ্খদা আমাকে লাইক করে | বর্তমানে ফেসবুকে লাইক করার মত জিনিসটা অতটা সহজলভ্য নয় | শঙ্খদা পড়াশুনায় ভালো , দেখতেও হ্যান্ডসাম , নিজেকে মনে হতে লাগল ঐশ্বর্য রাই | কিন্তু প্রথম প্রস্তাবেই মেনে নিলে হ্যাংলা বলবে ,

নারীসুলভ প্রেস্টিজটি বজায় রাখার জন্য এই ব্যাপারটির বার্তাবাহক , শঙ্খদার খুড়তুতো বোন আর

সহপাঠিনী লিপিকে বলেছিলাম , " আজ তো সবে মহালয়া , দাদাকে বল আরো পাঁচদিন মন দিয়ে পড়াশুনা করতে , তারপর ভেবে জানাব |" ঠিক কতটা ভাও বা দর নেওয়া যায় সেটা ভাবতে ভাবতে পঞ্চমী অব্দি কাটিয়ে ফেলে শুনলাম , শঙ্খদা আমাদেরই অন্য এক বন্ধু অপর্ণার সাথে ফিট হয়ে গেছে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই | পুজোর ওই কটা দিন হয়ত বোনের কোনো এক বন্ধুর সাথে কাটাবে ঠিক করেছিল সে , তা সে টিনা , মিনা , রিনা যেই হোক | সেদিন থেকেই শিক্ষা নিলাম পুজোয় " এই প্রেম করবি ?" ব্যাপারটা অনেকটা " এই ফুচকা খাবি ?" র মত , গ্র্যাব দা অপরচুনিটি ওর লুস ইট ফরএভার | সদ্ব্যবহার কর অথবা পস্তাও | যাইহোক ক্লাস ইলেভেনএই এমন শিক্ষা লাভ করেও আমার পুজোর ঝটিকা প্রেম করার সৌভাগ্য একবারও হয়নি |

আমার স্কুল কলেজ বেলা কোনোটাই মোবাইল বা ইন্টারনেট যুগে কাটেনি | তাই আমাদের না ছিল সেলফি তোলার হিড়িক , না হত কে কত লাইক , কমেন্ট পেল তার টেনশন | আমরা দুচোখ ভরে পুজোর দিনগুলো দেখতাম , একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে , আড্ডা মেরে চুটিয়ে উপভোগ করতাম | এইরকমই এক পুজোয় , তখন ওই ইলেভেন টুয়েলভ ই হব আমি , পাড়ার ঈশিতাদি বিয়ের পর প্রথম শশুরবাড়ি এসেছে , আমরা শালীর দল জামাইবাবুর ওপর , মানে জামাইবাবুর পকেটের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালাচ্ছি , সেইসময় জামাইবাবুর ভাই ফিস ফিস করে বলেছিল - " তোমার নম্বর টা দেবে ?"

-- " আমি কি জেলের কয়েদি যে আমার নম্বর থাকবে? তাও যদি জানতে চান , বলছি , 49/b"

-- " মানে?"

-- " নম্বর জিজ্ঞাসা করলেন তো, বাড়ির নাম্বার এটা "

সেন্স অফ হিউমারে মুগ্ধ হয়ে তিনি পকেট থেকে ছোট একটা মোবাইল , আমাদের সময়ে স্কুল পড়ুয়ার কাছে তখন ওই ছোট মোবাইলই স্বপ্ন , বার করে বলেছিলেন ,--" এ জিনিসটা আছে তোমার ? না থাকলে আমার নম্বর রাখো | সুযোগ করে ফোন কোরো একদিন | যদি কথা বলতে চাও , আমি তোমায় এরকম একটা কিনে দেব |"

ঈশিতাদির দেওর কলেজ পাস করেই বড় চাকরি পেয়েছে শুনেছিলাম , কিন্তু ভাইফোঁটা পর্যন্ত যেকটা দিন ঈশিতাদি এখানে ছিল , তার মুখে শাশুড়ির নিন্দে শুনে শুনে আমার তার দেওরকে ফোন করার ইচ্ছেটা কর্পূরের মত উবে গিয়েছিল |

কি ভাবছেন ? জীবনের সবকটা পুজোই ফুচকা খেয়ে , আড্ডা মেরে আর প্রেমের হাতছানি পেয়েই কাটিয়েছি ? মোটেই না | প্রেমিকের হাত ধরে অন্তত একটা পুজো বাড়ির লোকের চোখে ধুলো দিয়ে ঠাকুর দেখেছে এই শর্মা | সেটা হয়ত 2002-03 হবে , আবির জেদ ধরল , অন্তত দুটো দিন তার সাথে ঠাকুর দেখতে যেতেই হবে | আবির কলেজে আমার সহপাঠী , তার সাথে তখন চারমাসের সদ্য ফোটা ফুলের মত প্রেম , আমার মনটাকে সে তখন আবির রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে , তাকে কি ফেরানো যায় ? সে ভয় , উত্তেজনা মাখা এক অনন্য অভিজ্ঞতা |

তারপর যা হবার তাই হল | খুব চেনা বাংলা সিনেমার স্ক্রিপ্টের মত ঘটনাপ্রবাহ চললো আমার জীবনে | কে একজন আমাদের একসাথে কোন প্যান্ডেলে দেখে বাবাকে বলে দিলো , মেয়ে প্রেম করছে জেনে চিন্তিত ও রাগত বাবা একসপ্তাহের মধ্যেই ঘটক ডেকে আনলেন | আমার বিয়ে প্রায় পাকা হয়ে গেল বি এ ডিগ্রি পাওয়ার আগেই | আবির নিজের পায়ে দাঁড়ায়নি , তাই আমার দায়িত্ব নিতে পারবেনা বলে সহজেই পাশ কাটিয়ে গেল , আমিও ভাঙা মন নিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মত এক শ্রাবণ সন্ধ্যায় বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়লাম | তারপর চলে এলাম কল্যাণী থেকে সোজা শ্রীরামপুর , আমার শ্বশুরবাড়ি , মানে ফ্ল্যাট , একটা আবাসনে |

আজ বিয়ের পর কেটে গেছে পাঁচটা বছর | শ্বশুর শাশুড়ি , স্বামী পুত্র নিয়ে আজ আমার ভরা সংসার | আমার শাশুড়ি একটুও ঈশিতাদির শাশুড়ির মত নন , বরং অনেকটা মায়ের মত | শ্বশুরমশাইও বেশ মানুষ | আর আমার পতিদেবটিকে নিয়ে আমার বেশ গর্বই হয় | তিনি এমন মানুষ , পরম ভরসায় যার হাত ধরে জীবনপথে পাড়ি দেওয়া যায় | আমাদের আবাসনেও পুজো হয় | পুজো নিয়ে আমার ছেলে ঋভুর উৎসাহ আমাকে আমার ছেলেবেলার দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে যায় | সময়ের নিয়মে হয়ত বদলেছে অনেককিছু , বদলায়নি মহালয়া , বদলায়নি পুজো ঘিরে বাঙালির প্রাণের আবেগ | আজ আমার ছেলে যখন বলে - " ঠাকুর কখন আসবে মা ? আজ থেকে তাহলে পড়ার ছুটি তো ?" আর আমি গম্ভীর হয়ে বলি , পুজোর পর পরীক্ষা মনে আছে তো ?" তখন নিজেরই মনে মনে হাসি পায় | একেই বোধহয় জীবনচক্র বলে |

তমেকা ঘোষ । বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর, পেশায় একজন স্কুল শিক্ষিকা, নেশায় কলম ধরি। দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

ডায়াগনোসিস

গল্প

স্বরূপ মণ্ডল

কণিকার হাতটা শক্ত করে ধরল লোহিত। তারপর কতকটা জোর করেই টেনে নিয়ে ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকাল তাকে। সামনেই বসে রয়েছেন বিখ্যাত মনরোগ বিশেষজ্ঞ কমলেশ সরকার, সত্তরোর্ধ্ব, সৌম্যকান্তি। ঘরটি সুসজ্জিত; একটি দামি পেন্ডুলাম ঘড়ি আপন ছন্দে দুলছে, দেওয়াল আলমারিতে সাজান রয়েছে ডাক্তারি বইপত্র, জানালায় হালকা বেগুনি রঙের পর্দা, টেবিলে গোটা তিনেক ডায়েরি, একটা প্রেসক্রিপশন প্যাড, কাচের পেপার ওয়েট, টেবিল ক্যালেন্ডার, নক্সা করা বেতের কলমদানি, তাতে গোটা কয়েক দামি কলম। ইশারায় বসতে বললেন কমলেশবাবু। লোহিত ডাক্তারবাবুর ঠিক সামনের চেয়ারটিতে বসাল কণিকাকে, নিজে বসল পাশের চেয়ারটিতে। চকিতে ডাক্তারবাবুর দিকে চাইল কণিকা। সন্দিগ্ধ চাহনি, যেন বিরাট এক ষড়যন্ত্র তার বিরুদ্ধে! সকলে মিলে তাকে পাগল বানাতে চায়। তাতে কার যে কী লাভ হবে, সে বোধ করি তার জানা নাই। আবার সব আগের মতো ফিরে পাবে কিনা তাই নিয়ে সে বড়ই সন্দিহান! তার যে কী হারিয়েছে আর কী সে ফিরে পেতে চায় সেটাই কেউ বুঝে উঠতে পারছে না। জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দিতে পারে না। শুধু ফ্যালফেলিয়ে তাকায়, হাসে।

তবে এটা সকলেই বুঝতে পেরেছে, সে তার বাপের ধারা ধরেছে আর রক্ষে নাই। অনেক সাধ্য-সাধনা করেও তাকে ডাক্তারের কাছে আনা যায় নি। শেষমেশ হাত-পা বেঁধে নিয়ে এসেছে ডাক্তার কমলেশ সরকারের কাছে। এর আগে গাঁয়ের জগন্নাথ কবিরাজকে দেখিয়েছিল। শিমুলিয়ার জগন্নাথ কবিরাজকে দেখিয়ে রোগ সারে নি এমন নজির বিশেষ নাই। শুধু কণিকার ক্ষেত্রেই তাঁর ওষুধ কাজে আসে নি। থেকে থেকেই আবোলতাবোল বকে, ঘরের লোকেদের গালাগালি করে, অসংলগ্ন আচরণ করে। শ্বশুরবাড়ির লোকেদের ধারণা এ সবই তার মনের বদমায়েশি। পাড়ার লোকে বলে, তাকে ভূতে পেয়েছে। ওঝা ডেকে, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক সব করেই দেখা হয়েছে। কোনও কিছুতেই কিছু হয় নি। শেষে এক বন্ধুর পরামর্শে ডাক্তার কমলেশ সরকারের কাছে নিয়ে এসেছে লোহিত। সেও একপ্রকার আশা ছেড়েই দিয়েছে। শুধু ছেলের মুখ চেয়ে শেষ চেষ্টাটুকু করা।

কণিকার সামাজিক জ্ঞান এখনও টনটনে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শি, সম্বন্ধ সব মনে আছে তার। শুধু একটাই চিন্তা তাকে কিছুতেই স্বস্তি দিচ্ছে না; যা কিছু ঘটছে তা ঠিক হচ্ছে না। কোথাও নিশ্চিতভাবে কিছু ভুল হচ্ছে যা অবধারিতভাবেই তার ক্ষতি করবে। দিন পনেরো ধরে খুবই বাড়াবাড়ি শুরু করেছে সে। বাড়ির লোকদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে। শাশুড়ি তো রাগের মাথায় নিদান দিয়েই দিয়েছেন, ঝাড়ের গুণে কঞ্চি! যে কণিকাকে এতদিন ধরে দেখেছে, তার আচরণের এ হেন পরিবর্তন গাঁয়ের লোকেদেরও বিস্মিত করেছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়েছে তারাও— ভারি মিশুকে ছিল লোহিতের বউটা! হঠাৎ করে কী যে হল তার? এ যে এক্কেবারে উন্মাদ! কণিকার বাপের বাড়ির ইতিহাসটা শাশুড়ির সুবাদে আর কারোর অজানা নাই। তাছাড়া ভাবনায় ইন্ধন যোগানোর লোকের অভাব নাই। এখন তাদেরও বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, কণিকার এই পাগলামি তার বাপের থেকেই পাওয়া।

দুই

কণিকা আর মণিকা দুই বোন। বছর দুয়েকের ছোটো-বড়। জ্ঞান হওয়া ইস্তক দেখেছে বাবা বদ্ধ উন্মাদ, মা নিরুদ্দেশ। মা কোথায় গেছে, কেউ জানে না। ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা, তাও অজানা। বাড়িতে মায়ের সম্পর্কে কোনওরকম কথাবার্তা, আলাপ, আলোচনা নিষিদ্ধ। পথে-ঘাটে, লোকমুখে যেটুকু শোনা তাতে ছেলেবেলা থেকেই মায়ের সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠেছে দুই বোনের। একান্নবর্তী পরিবারে তুতো ভাইবোনেদের সঙ্গে তারাও বেড়ে উঠেছে। ঠাকুরদা, ঠাকুরমাই ছিলেন তাদের বাপ-মা; সব আবদার মেটানোর দ্বিধাহীন আশ্রয়স্থল। তবুও কোথাও যেন কিছু একটা না পাওয়ার অনুভূতি নাড়া দিত শিশুমনে যখন দেখত তাদের তুতো ভাইবোনেরা বাপমায়ের আদর খাচ্ছে। খুনসুটি, মারামারি হলে মার খেত তারাই।

ঠাকুরদা, ঠাকুরমা প্রতিবাদ করলেও তার জোর ছিল কম। আর সব ভাইবোনেদের আচরণে ক্রমেই তাদের মনে হতে লাগল, ফায়-ফরমায়েশ শোনার জন্যই যেন তাদের জন্ম। অল্প বয়সেই তারা বুঝে গেছিল পরিবারে তাদের অবস্থান ঠিক কোথায়। গাঁয়ের পাঠশালায় দুই বোনকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন নিত্যানন্দ। টেনে হেঁচড়ে চতুর্থ শ্রেণি অবধি গড়িয়েছিল মণিকা; কণিকার সেটুকুও হয় নি। রাবণের গুষ্টির রান্নাবান্না, ঝাড়ামোছা, সিজে-ভাপা, মাজাঘষা, কাচাকাচি করতে বাড়ির বউদের দু'দণ্ড বসে জিরনোর ফুরসত মেলে না। এসবের মধ্যে দু' দুজন হাত নুরকত পেলে মন্দ হয় না! ক্রমে গৃহকর্মে হাত পাকাল তারা।

দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল কণিকা। ফুল ফুটলে সৌরভ ছোটে, ভ্রমর আসে। পথেঘাটে, বাড়ির আশপাশে পাড়ার ছেলে ছোকরাদের উঁকিঝুঁকি মারা শুরু হল। কোনদিন কী অঘটন ঘটে! নিত্যানন্দ বেঁচে থাকতেই মেয়ে দুটোর হিল্লে করে যেতে চাইলেন। কিন্তু, রক্তের জোর কমে এসেছিল তাঁর। কাজেই ছেলেদের উপর নির্ভরতা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। এদিকে ছেলেরাও নিজ নিজ সংসার গোছানোয় তৎপর। নিত্যানন্দ বললেও তেমন গুরুত্ব দিয়ে ভাবে না তারা। গতিক ভাল ঠেকছে না বুঝে একদিন নিত্যানন্দ ছেলেদের ডেকে যারপরনাই ভর্ৎসনা করলেন।

বাপের আনচানানিতে ছেলেরা আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না। বড় ছেলের শ্বশুরবাড়ির দেশে এক চাষি পরিবারের সাথে যোগাযোগ হল। ছেলের তেমন কিছু কামাই নাই। পৈতৃক জমি, জায়গা দেখাশোনা করে আর মাঝেসাঝে কীর্তনের দলে দোহার হিসেবে যোগ দেয়। যা দু' চার পয়সা পায় তাতেই তার হাতখরচ চলে। পড়াশোনা বিশেষ জানে না। গাঁয়ের স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে ইতি টেনেছে। নিত্যানন্দ গররাজি হলেও নাচার। গয়ংগচ্ছ করে বিয়ে হল কণিকার। নিত্যানন্দ মনে মনে ভাবলেন, আর যে ক'টা দিন আছেন, তার মধ্যে মণিকার একটা সদ্গতি করে ফেলতে পারলে শান্তিতে মরতে পারবেন তিনি। ঈশ্বর মানুষের সব ইচ্ছে পূরণ করেন না, পূরণ করলে বোধহয় তার মান থাকে না। নিত্যানন্দকে মারণ রোগে ধরল। গাঁয়ে থেকে যতটা সম্ভব চিকিৎসা করাল ছেলেরা। কিন্তু চাল তাঁর ফুরিয়েছিল। ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে গেলেন। একদিন স্ত্রী, নির্মলাকে ইশারায় কাছে ডেকে অস্ফুটে বলে গেলেন, "মণিকাকে দেখো।"

ঠাকুরদাদার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বিমর্ষ কণিকা তড়িঘড়ি বাপের বাড়ি এল। মণিকা আঁকড়ে ধরল দিদিকে। কণিকার শ্বশুরবাড়ির অবস্থা মন্দ ছিল না। যা জমিজমা ছিল তাতে খেয়েপরে দিব্যি চলে যেত।

কণিকার বর লোহিত বাড়ির বড় ছেলে। বেশ করিৎকর্মা। যখন মাঠে আবাদের কাজ কমে আসত তখন সে কীর্তন দলে যোগ দিত। গলার সুরটাও ছিল বেশ ভাল। কীর্তনের দলের সাথে থেকে থেকে পদাবলীর অনেকটাই রপ্ত করে ফেলেছিল সে। মনে

তার বড় কীর্তনিয়া হওয়ার সাধ। চাষের কাজে বড্ড খাটুনি! কীর্তনিয়া হলে রুজি রোজগার আর ভগবানের নাম দুই-ই হবে। বছরখানেক বাদে একটি হৃষ্টপুষ্ট ছেলে হল কণিকার। আনন্দে ভরে উঠল তার সংসার। ততদিনে মণিকাও বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠল। নিত্যানন্দ মরে চিন্তামুক্ত হয়েছিলেন। মণিকার জন্য বড় চিন্তা নির্মলার। কিন্তু, যে নিজেই পরগাছা তার চিন্তার মূল্য থাকে না।

কাকা-জেঠারা নিজেদের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে সদাব্যস্ত। এ অবস্থায় বোনের জন্য চিন্তা হওয়া অমূলক নয়। সে গাঁয়ের বনেদি চাষি পরিবারের একমাত্র ছেলের বিভাস; দেখতে-শুনতে ভাল। দোষের মধ্যে থেকে থেকে মাথা গরম হয়। কিছুদিন একভাবে থেকে আবার আপনাআপনিই সেরে ওঠে। সে ভাবল, এ বাড়িতে বোনের বিয়ে হলে আর যাই হোক সারা জীবনের খাওয়া-পরার অভাব থাকবে না মণিকার। প্রস্তাব দেওয়া মাত্র জ্যাঠা-কাকারা রাজি। রাজি হওয়ার পেছনে মূলত যে কারণ ছিল তা হল, দাবিহীন পাত্রের ঘাড়ে কোনওমতে নিজেদের দায় ঝেড়ে ফেলা। সবাই নিজের মতো করে ভেবে নিল, শুধু মণিকার ইচ্ছে বা মতামত জানার প্রয়োজন বোধ করল না কেউ। আত্মীয়েরা ভাবল দুই বোনে এক গাঁয়ে থাকবে, বিপদে আপদে, সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়াবে; খুব ভাল হবে। তাছাড়া ছেলে যখন কণিকার চেনা-জানা, তখন দিদি হয়ে কি আর বোনের ক্ষতি চাইবে? ইতিমধ্যে কাকা-জ্যাঠারা ভিন্ন হয়েছিল। যার যখন পালা পড়ত, মণিকা তখন তাদের বাড়ির ঝি। বিনিময়ে দু'বেলার খাবার। নির্মলার অবস্থাও কতকটা সেইরকমই। শুধু নিত্যানন্দের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির উপর ছেলেদের মতোই তাঁর সমান অংশ থাকার সুবাদে জোরটা একটু বেশি খাটত।

এই দাসত্বের জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গেছিল মণিকার। সেও চাইছিল মুক্তি। পাত্রপক্ষ ঘটা করে ছেলের বিয়ে দিয়ে মণিকাকে লক্ষ্মী বানিয়ে নিয়ে গেল ঘরে। বিয়ের পরে ছেলের কাজে-কর্মে মতি ফিরল। ছেলের এ হেন পরিবর্তন দেখে বাপ-মা আহ্লাদে গলে পড়লেন। মণিকার কদর বাড়ল। সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী এসেছে ঘরে, নইলে তাদের আধ-পাগলা ছেলের কী আর এমন সুমতি হয়! বোনের বাড়িতে কণিকারও খাতির বাড়ল। কিন্তু যে মেয়ে মন্দ কপাল নিয়ে জন্মেছে, তার কপালে সুখ সইবে কেন! বিয়ের মাস ছয়েকের মধ্যেই ঘটে গেল এক অঘটন। জমির ফসল বিক্রয়কে কেন্দ্র করে বাপের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হল ছেলের। এক কথা, দু' কথা হতে হতে তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেল। রাগের মাথায় ঘরে ঢুকে খিল দিল বিভাস। কিন্তু সে যে গলায় দড়ি দিতে পারে, এ ভাবনা ঘুণাক্ষরেও কারোর মনে এল না। বিভাসের আকস্মিক মৃত্যুতে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল মণিকা। শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লেন বিভাসের বাপ-মা। শ্রাদ্ধ, শান্তি, পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্মাদি মিটলে পর মণিকার প্রতি দুর্ব্যবহার শুরু হল শ্বশুর, শাশুড়ির। তাঁদের ধারণা, এ মেয়ে নির্ঘাত অলক্ষ্মী, ছেলে তাঁদের আধ-পাগলা হোক আর যাই হোক বেঁচেবর্তে ছিল, এই কালসর্প এসেই খেল তাকে। বেশিদিন আর শ্বশুরবাড়ির অন্ন জুটল না মণিকার ভাগ্যে। কাকা-জ্যাঠারাও আর আপদ ফিরিয়ে নিতে চাইল না। কিন্তু যা হবার নয়, তাকে হওয়ানো যায় না। অগত্যা সালিসি সভা বসল গাঁয়ে। মণিকার সারা জীবনের ভরণ-পোষণ বাবদ তারা বিঘা দুই দু-ফসলি জমি আর নগদ দু' লক্ষ টাকা দিতে রাজি হল।

মণিকা ফিরে এল পুরনো জীবনে। সারাদিন কাজে-কর্মে কেটে গেলেও রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসত না তার। পাড়ার এক বান্ধবীর দিদির বিয়ে হয়েছিল পূর্ণিয়ায়। সেখান থেকে এক ছোকরা এসেছিল পলাশপুরে। মণিকাকে খুব পছন্দ হল তার। মণিকার বিষয়ে সব জেনেও বিয়ে করতে চাইল তাকে। মণিকারও মনে ধরেছিল ছেলেটিকে। হয়ত বয়সের ধর্মে নয়ত যেকোনো উপায়ে সে মুক্তি পেতে চাইছিল। কাকা-জ্যাঠারাও নিমরাজি হয়েছিল কিন্তু বাধ সাধল কণিকা। লোহিত তাকে বুঝিয়েছিল, এ

রকম দু-ফসলি বিঘা দুই বা-কুরি, তাও আবার নিজের গাঁয়ে! কোনওভাবে ছোটো ভাইয়ের সাথে বিয়েটা দিতে পারলে জমিটা তাদেরই হবে। মণিকা সুন্দরী, আশা করা যায় মোহিতের অমত হবে না। কণিকাও পাকা গিন্নি হয়ে উঠেছিল। লোহিতের প্রস্তাব তার মন্দ লাগে নি। শ্বশুরের যৎসামান্য জমি, দু' ভাগ হলে কতটুকুই বা জুটবে! কণিকার প্রস্তাব শুনে শ্বশুর, শাশুড়ি লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না। ছোটো ছেলেকে কোনওমতে রাজি করালেন। কণিকা সানন্দে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হল কাকা-জ্যাঠাদের কাছে। এ যেন মেঘ না চাইতে বৃষ্টি; তারাও অমত করল না। দিদি হয়ে কণিকা, বোনের মনের খবর একবারও নিল না। মণিকা মনে মনে ঠিক করে ফেলল তার গন্তব্য। দিনকয়েক পর, সকালে সবাই ঘুম ভেঙে দেখল মণিকা চিত হয়ে পড়ে আছে বিছানায়, ঘরে ফলিডলের অসহ্য গন্ধ। সবাই হতচকিত হয়ে গেল। কারোর মুখে কথাটি সরল না। পাগল বাপ বুঝতেও পারল না, অসহায় ঠাকুরমা ডুকরে কেঁদে উঠল। বোনের আত্মহত্যার খবরে হতভম্ব হয়ে গেল কণিকা, যেন আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়! ঠিক কী কারণে? মণিকাকে দেওয়া জমি, টাকা বেহাত হয়ে গেল বলে? নাকি তার মনে পাপবোধ কাজ করছিল? যখন গাঁয়ের আধ পাগলা ছেলের সাথে বোনের বিয়ে দিয়েছিল, তখনও কী বোনের ইচ্ছা জানতে চেয়েছিল সে? আর যখন জমির লোভে তার দেবরের সাথে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করে এল, তখন? দিনরাত মনের মধ্যে ঘষতে লাগল সেইসব কথা। ক্রমে তার উপোষ, বার-দেবার বেড়েই চলল ।

তিন

কণিকার ছেলে বড় হয়েছে। গাঁয়ের স্কুলেই পড়াশোনা করছে। আসছে বছর মাধ্যমিক দেবে। এদিকে লোহিতও কীর্তনিয়া হয়েছে। রোজগারপাতি মন্দ হচ্ছে না। এসবের মধ্যেই কণিকার এমত পাগলামি অশান্তি ডেকে এনেছে সংসারে।

কমলেশবাবু কণিকাকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করলেন তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "কী নাম তোমার?"

"কণিকা বিশ্বাস," সভয়ে উত্তর দিল কণিকা, ভাবখানা এমন এই বুঝি কিছু ভুল বলে ফেলল।

প্রেসক্রিপশনে নামটা লিখতে লিখতে ফের জিজ্ঞেস করলেন, "বয়স?"

কণিকা একবার তার স্বামীর দিকে চেয়ে ইতস্তত করে বলল, "ব-তিরিশ।"

কমলেশবাবু প্রেসক্রিপশনে লিখলেন তারপর কলমটা নামিয়ে রেখে জানতে চাইলেন, "বল, কী হয়েছে তোঅমনি অভিযোগের ভঙ্গিতে সে বলতে শুরু করল, "আমার তো কিছু হয় নি গো ডাক্তারবাবু, ওরা আমায় জোর করি ধরে এনিছে। আমি আসবু না বলিছিলাম, জানেন? কিন্তু আমার কুনু কথাই শুনলু নাকু। আমার হাত, পা বেঁধি নিয়ি এলু।" বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

কমলেশবাবু লোহিতের দিকে একবার তাকালেন, তারপর কণিকাকে আশ্বস্ত করে বললেন, "তুমি যখন একবার আমার কাছে এসে পড়েছ, আর তোমার কোনও ভয় নাই।"

সাহস পেয়ে সে বলতে শুরু করল, "জানেন ডাক্তারবাবু, আমাদের গাঁয়ে এক সাধুবাবা এইছিলু, আমার মাথায় হাত দিয়ি বললু, পাগলি; আচ্ছা আপুনিই বলুন, আমি কি পাগল?"

বলতে বলতে জিভ কাটল সে, একবার লোহিতের দিকে তাকাল, পরক্ষণেই ডাক্তারবাবুর দিকে চেয়ে বলল, "আমি বুধায় ভুল কিছু বলি ফেল্লাম, না?"

কমলেশবাবু সুতোর বাণ্ডিলের হারিয়ে যাওয়া খেই ধরার চেষ্টা করছিলেন, বললেন, "তুমি কিছু ভুল বল নি, তোমাকে যে সাধুবাবা পাগলি বলেছে, সে কিচ্ছু জানে না।"

ডাক্তারবাবুর কথায় খুশি হল কণিকা, গলা নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, "একটো কথা বলবু? আপুনি কাউকে কয়ে দিবেন না তো?"

কমলেশবাবু কণিকাকে আশ্বস্ত করে বললেন, "না, আমি কাউকে বলব না, তুমি আমাকে নির্ভয়ে বলতে পার।"

কনিকার মুখের ওপর থেকে কিছুক্ষণের জন্য ভয়ের ছায়াটা সরে গেল যেন, বলল, "আমি না, গলায় দড়ি দিতি যেইছিলাম; ঠিক করিনি, বলুন?"

কমলেশবাবু বুঝলেন, ব্যাপারটা গুরুতর। জল অনেক দূর গড়িয়ে গেছে, এই অবস্থা থেকে রুগীকে সুস্থ করা, একটা বড় চ্যালেঞ্জ। জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা তুমি মরতে গেছিলে কেন?"

কনিকার সহজ, সরল উত্তর, "জানি না; আমি বুধায় তাইলে ভুলই করিছিলাম, বলুন?"

কমলেশবাবু বললেন, "ভুল তো করে ছিলেই! তুমি মরে গেলে কী আর সমস্যার সমাধান হতো? বেঁচে থেকেই মোকাবিলা করতে হবে, বুঝলে কি না? তাছাড়া, তুমি যখন আমার কাছে এসেছ, লড়াইটা না হয় একসাথেই লড়ব, কী বল?"

এবারে হাসি ফুটল কণিকার মুখে। সব দ্বিধা কেটে গেল তার, ডাক্তারবাবু সত্যিই তার শুভাকাঙ্ক্ষী। স্বাচ্ছন্দ্যে কেবিনের চারপাশটা দেখতে লাগল। কমলেশবাবু ভাবলেন, মেয়েটার মনে আর কী চলছে সেটাও জানা দরকার। বললেন, "তোমার কী কেউ কোনও ক্ষতি করতে চায় বলে তোমার মনে হয়?"

কণিকা জোরের সাথে বলল, "চাই-ই তো! আমাকে ওষুধ খাইয়ি খারাপ করিছে, জানেন? সাধুবাবা সব কয়িছে আমাকে।" চট করে পেটের থেকে কাপড়টা সরিয়ে বলল, "দেখুন না, এ এইখানে, থেকি থেকি খুব বেদনা করে।"

কমলেশবাবু কণিকাকে পাশের ডেস্কটা দেখিয়ে বললেন, "এবারে এখানে সোজা হয়ে শুয়ে পড় দেখি তো মা।"

প্রথমে সঙ্কোচ করলেও পরে ডাক্তারবাবুর কথা মতো উঁচু ডেস্কটাতে উঠে হাত-পা টান টান করে শুয়ে পড়ল সে। কমলেশবাবু পেট টিপে টিপে ভাল করে দেখতে লাগলেন; উপর পেটের ডানদিকে হাত পড়তেই কঁকিয়ে উঠল। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল সে। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে বলল, "আমি বাঁচবু তো? সবকিছু আগের মতন ফিরি পাবু তো, ডাক্তারবাবু?"

কমলেশবাবু কনিকার মাথায় হাত রেখে বললেন, "বাঁচবে না মানে! আলবাত বাঁচবে! আমিই তোমার সবকিছু ফিরিয়ে দেব, কোনও ভয় নাই।"

চোখ ছলছল করে উঠল কণিকার। এই ভরসাটুকুই এতদিন তাকে কেউ দিতে পারে নি। কমলেশবাবু প্রেসক্রিপশনে খচখচ করে লিখে দিলেন রেফারড টু ডক্টর সুমন্ত স্যানাল; তারপর লোহিতকে বললেন, "দেখে যেটুকু বুঝলাম, ওর পিত্তথলিতে পাথর আছে, আজই ডক্টর সুমন্ত স্যানালের কাছে চলে যান। ওখানে এই প্রেসক্রিপশনটা দেখাবেন। আগে ওর পেট থেকে পাথরটা বের করতে হবে; তারপর ওর মনের চিকিৎসা হবে।"

এই ধরনের সাইকোসিসের বেশ কয়েকটা কেস সল্‌ভ করেছেন কমলেশবাবু। আক্রান্ত রুগীরা শরীরের কোনো লঘু সমস্যাকে গুরুতর মনে করে। এমনকি মৃত্যুভয়ও গ্রাস করে ফেলে তাদের। শুরু হয় অসংলগ্ন আচরণ। পরিবার এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অসহযোগিতায় এরা বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়। এই কেসটাও বেশ বাড়াবাড়ি রকমের। লোহিত পকেট থেকে একটা পাঁচশ টাকার নোট বের করে ডাক্তারবাবুর দিকে এগিয়ে ধরল। কমলেশবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "এখন ফি লাগবে না, যেটা বললাম সেটা করুন।"

লোহিত ডাক্তারবাবুকে নমস্কার জানিয়ে কণিকার হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এল।

স্বরূপ মণ্ডল, জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি শহরে। প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'দুন্দুভি' নামক পত্রিকায় যেটি কান্দি থেকে প্রকাশিত হতো নয়ের দশকে। পরবর্তীতে 'অঙ্গাঙ্গি' নামক লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক শ্রী অপরেশ চট্টোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য লাভ এবং কবিতা প্রকাশ। এছাড়াও মাধুকরী, পরবাস, তথ্যকেন্দ্র, হাতপাখা, সঙ্গদীপ প্রভৃতিতে কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "প্রতিধ্বনি"।

নদীর ঘাটের কাছে নৌকা বাঁধা আছে

ভ্রমণ

দিব্যেন্দু ঘোষ

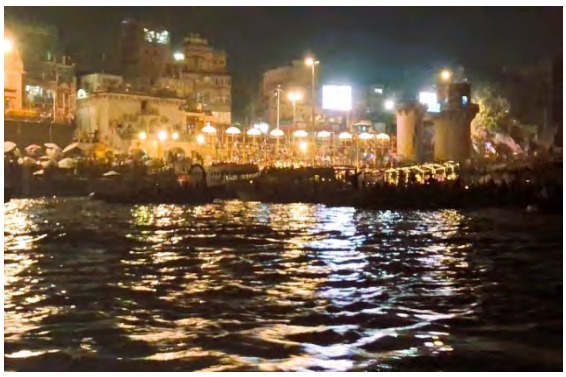

এক, দুই, তিন..... গুনতে গুনতে নামছি সিঁড়ি বেয়ে, বেশ খাড়া সিঁড়ি, আমার কর্পোরেট যাপনের ধড়াচুড়ো ছেড়ে রেখে পবিত্র গঙ্গার কাছে যাওয়ার, পা ডুবিয়ে বসে থাকার, সূর্যাস্তের রঙে শরীর রাঙানোর, গোধূলির রঙে মন-তুলির আদুরে আবদারে ধড়াচুড়ো পঁচিশটা বছর ফিরে যাওয়ার সোপান বেয়ে নামছি। ঠিক শেষ সিঁড়িটায় বসলাম, গঙ্গার ঘোলাটে জলে পা ডোবালাম, ওই দূরে দিনশুরুর আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে অপার ভক্তির পীঠস্থান। দূরে মিঠে সুরে কে যেন ভজনের পালে বাতাস দিচ্ছে, আরেকটু দূরে কেউ যেন গঙ্গাস্তোত্র আউড়াচ্ছে। এই আদুরে সকাল, আকাশের গায়ে চাঁদপানা রং, অনন্ত জলরাশির ঘাত-প্রতিঘাতে কাছ থেকে দূরে আছড়ে পড়ছে আমার দৃষ্টি, গাঙ্গেয় বাতাস মনটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে, পুজোর ছুটিতে মগনলালের ডেরায় গিয়েও আমার মন বেয়ে গড়িয়ে পড়ছেন রবিঠাকুর।

নদীর ঘাটের কাছে/নৌকো বাঁধা আছে,/নাইতে যখন যাই দেখি সে/জলের ঢেউয়ে নাচে।
আজ গিয়ে সেইখানে/দেখি দূরের পানে/মাঝ-নদীতে নৌকো কোথায়/চলে ভাঁটার টানে।

না, এ আমার কাছে কোনও নতুন দেশ নয়। পঁচিশ বছর আগের বেনারসকে পাল্টে যাওয়া, বদলে যাওয়া মনে জরিপ করার চেষ্টা করছি। বড়ই বদলেছে সে, বেনারসের সেই গলি, তস্য গলি পেরিয়ে পলেস্তারা খসা বিবর্ণ দেওয়ালে আজ গ্র্যাফিটি। জ্ঞানবাপীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকা, বিড়িতে টান দেওয়া সেই শার্ট-পাঞ্জাবি আর খাটো ধুতি আজ উধাও, ষাঁড়ের দল গলি আটকে দাঁড়িয়ে আছে বটে, তবে ধাঁ করে সেই গলিতে ইতিউতি ঢুকে পড়ছে অটো, টোটো। সেই পায়ে-চালানো রিকশা, পাশাপাশি বসে তোপসে আর জটায়ুর রিমেক আছে, তবে মাথায় হাত ঠেকিয়ে রাখা লোকের অভাব ঘটেছে।

বেনারস বদলে গেছে, যা দেখি নতুন লাগে। বেনারসে বাঙালি নেই, বলাটাও দুঃসাহস। তাই পুজোও আছে, বিনা পুজোর দেশ বললে জিভ আড়ি করবে। তবে বেনারসের গঙ্গা বেয়ে ঘোরাফেরা আমার কাছে না-পুজোর দেশেরই সমান, না হলে কি বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের অলিগলি ছেড়ে কাশীর এতটা কাছে এসে গঙ্গার আনমনা বাতাসে নিজেকে সেঁকে নিতে ইচ্ছে করে, ইতিহাসের গন্ধ নিতে ইচ্ছে করে? বেনারস বলে কি ভুল করলাম? কাশী, বারাণসী, বেনারস, বনারস, ভরানসি! যে নামেই ডাকি না কেন, আকাশ-বাতাসে ধর্ম-বিলাসে। বেনারসের অলি-গলি-পাকস্থলী আজও ধর্মের কথাই বলছে, কর্পোরেট বিকিকিনির ঢালাও পসরা। ধর্ম এখনও চোখ রাঙিয়ে সেবা কাড়ছে, আদর করে আগলে রাখছে, প্রাচুর্যে নজর ভরাচ্ছে, দারিদ্রের শোকেসও সাজাচ্ছে।

হোটেলের চিলতে বারান্দায় নধর রোদ ভোর থেকেই উঁকি মারে, মাঝদুপুরে গনগনে চোখ রাঙায়, যেন বলে, ঘরের বাতানুকূল নিভৃত যাপনে ফিরে যেতে, নাহ্, কাশী সে অবকাশ দেয় না, ঘাট থেকে ঘাটে ইতিহাস খুঁজতে বেরোই। বেনারসের অধিকাংশ ঘাটই ১৮শো শতাব্দীতে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল, যখন শহরটি মারাঠা শাসনের অধীনে এসেছিল। হিন্দুধর্মে প্রচলিত বিশ্বাস, মহাদেবের ত্রিশূলের ডগায় অবস্থিত কাশী বা বারাণসী। গঙ্গা নদীর পশ্চিম পাড়ে বিশ্বনাথের এই বহু প্রাচীন মন্দির। গঙ্গার গা ঘেঁষে হাঁটলে একডাকে সবাই চিনিয়ে দেবে বিশ্বনাথ গলি। গলির শেষ প্রান্তে কাশী বিশ্বনাথ। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রথম লিঙ্গ। উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর বিশ্বনাথ ছাড়া অন্য এগারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ হল গুজরাতের সোমনাথ, অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীশৈলমের মল্লিকার্জুন, মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর, মধ্যপ্রদেশের ওঙ্কারেশ্বর, হিমালয়ের কেদারনাথ, মহারাষ্ট্রের ভীমাশংকর, মহারাষ্ট্রের ত্র্যম্বকেশ্বর, ঝাড়খণ্ডের দেওঘরের বৈদ্যনাথ, গুজরাতের দ্বারকার নাগেশ্বর, তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমের রামেশ্বর এবং মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের ঘৃষ্ণেশ্বর মহাদেব।

বিশ্বনাথ করিডর তৈরির আগে একেবারে কাছ থেকে ভক্তরা শিবের দর্শন করতে পারতেন। এখন জল ঢালা থেকে বিশ্বনাথ দর্শন সবেতেই কর্পোরেট ছোঁয়া। ধনী ও প্রভাবশালীদের জন্য ভিআইপি দর্শন, আমাদের জন্য কিলোমিটারব্যাপী সাধারণ লাইন, আর না পারলে অনলাইন। গর্ভগৃহ আকারে ছোটই রয়েছে। বেড়েছে দম্ভের করিডর। বিশাল সাদা মার্বেলের মন্দির চত্বরজুড়ে চারদিক থেকে আসা লাইনগুলি মিশছে।

মন্দিরে প্রবেশ করে এক মুহূর্তের জন্য মনে হয় গুজরাতের অক্ষরথাম কিংবা বিড়লাদের কোনও মন্দিরে হাজির। বিশ্বনাথ মন্দিরের আশেপাশের পুরনো মন্দিরগুলিও উধাও হয়ে গেছে। ঝাঁ-চকচকে মার্বেল গ্রানাইটের মন্দির। চারপাশ জুড়ে জেলখানার মতো বিরাট পাঁচিল। ছোট্ট গর্ভগৃহে পাণ্ডার দাপট। গর্ভগৃহের চারপাশের চারটি দ্বার থেকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য কাশী বিশ্বনাথ দর্শন। ধড়াচুড়ো চারটের সময় মঙ্গলারতি দেখার জন্য এখন অনলাইন বুকিং করা যায়। আগে হাতে হাতে কুপন দেওয়া হত। এখন হয় না। নিয়ম ছিল ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ। সে সব নিয়ম কথার কথা। বড় মাপের মানুষ, অর্থাৎ ভিআইপিদের মঙ্গলারতিতে ডিরেক্ট এন্ট্রি। ১.৫ লক্ষ বর্গফুট জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে এই কাশী বিশ্বনাথ ধাম করিডর।

কাশীর বিখ্যাত সরু সরু গলির বদলে চওড়া বাঁধাই করিডর দিয়েই মন্দিরে পৌঁছে যান দর্শনার্থীরা। পুরো করিডরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং রয়েছে চারটি বড় দরজা এবং একটি প্রদক্ষিণ পথ। তৈরি হয়েছে ওয়াচ টাওয়ার। কিছু দূরে জ্ঞানব্যাপী মসজিদের পাশেই করিডরের প্রধান দ্বার 'ঢুন্ডিদ্বার'। সাধারণ মানুষের প্রবেশদ্বার। 'ঢুন্ডিরাজ' মানে গণেশ। তাঁর অধিষ্ঠান ছিল জ্ঞানবাপীর কাছে। এই দ্বার দিয়ে প্রবেশের নিয়ম মহাদেব বলেছেন শিবপুরাণে। মহাদেব পার্বতীকে বলছেন, "ঢুণ্ঢিরাজ পূজি, হবিষ্যান্নভোজী হবে পূর্বদিনে।" অর্থাৎ, ঢুণ্ঢিরাজকে পুজো করে সাত্ত্বিক আহার করে পরদিন কাশী বিশ্বনাথে প্রবেশ করাই হল চিরন্তন নিয়ম।

এছাড়া আরও তিনটি দ্বার দিয়ে প্রবেশ করা যাবে মন্দিরে। আধুনিক কাঠের বিশালাকার এই প্রবেশদ্বারগুলি তৈরি হয়েছে রাজস্থানে। অতীতে পঞ্জাবের শিখ সম্রাট রঞ্জিত সিং মন্দিরের চূড়াটি ১০০০ কেজি সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের তিনটি গম্বুজ সোনায় মোড়া। যা আজও একইভাবে বিদ্যমান। প্রচলিত ধারণা, এই সোনার ছত্রী দেখে ভক্তদের মনোকামনা পূরণ হয়। মন্দিরের বাইরে দশাশ্বমেধ ঘাটের দিক দিয়ে মন্দির দর্শনে যেতে গিয়ে চোখে পড়ল, বাড়ি এবং দোকানগুলিতে নতুন রঙের পোঁচ পড়েছে, কিছু নতুন সাইনবোর্ড হয়েছে। বিরাট দশাশ্বমেধ ভবন গড়ে উঠেছে রাস্তার ধারে। গলিপথ, লোকবিশ্বাস, ভিড়, ষাঁড়, কচুরি, লস্যি,

রাবড়ি আছে বটে, তবে বেনারস বদলে গেছে। শিক্ষা, সঙ্গীত আর নৃত্য জীবনের সব রসের ধারা এখানে মিশে গেছে, তাই তো এ শহর বনারস বা বেনারস! শহরের বয়স? হাজার তিনেক তো হবেই। বাবা বিশ্বনাথ শিবের বাড়ি বলে কথা! পরের পর ঘাট সেই হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের কথাই তো বলে।

নীল আকাশের পশ্চিম পাড়ে শেষ বিকেলের ডালিম রং ধরেছে, বেনারসের ঘাটে গেরুয়া বসন পরা সাধু, মন্ত্রের উচ্চারণ, পর্যটকদের উচ্ছ্বাস, জল ছিটিয়ে স্নানের শব্দ, গণৎকারদের মেলা, সন্ধের আরতি, সব মিলিয়ে যাকে বলে ধর্মীয় ম্যাডনেস! আর আমি তো বরাবর ফেলু মিত্তিরের ভক্ত, তাই বেনারসের ঘাট বড়ই প্রিয়!

গঙ্গা যেখানে অসি নদীর সঙ্গে মিশেছে, সেখানেই অসি ঘাট। কথিত আছে, দেবী দুর্গা শুম্ভ আর নিশুম্ভ নামে দুই রাক্ষসকে হত্যা করার পর তাঁর অসি বা তরবারি এই নদীতে ফেলেছিলেন। তাই এমন নামকরণ। বেনারসের একদম দক্ষিণে অসি ঘাট। মস্ত পিপল গাছের নীচে অতিকায় শিবলিঙ্গ। মূল শহর থেকে এই ঘাট বেশ দূরে, তবে পায়ে পায়ে পৌঁছে যেতে অসুবিধে নেই। পড়ান্ত বিকেলে বেশ গমগম করছিল অসি ঘাট। আমার ওই এক অভ্যেস, জলে পা ডুবিয়ে বসা। বিকেলে অসি ঘাটে যাওয়া গোলগাপ্পা খাওয়ার লোভে। খানিক বসে চললাম অসি চৌরাহা সাইনবোর্ডের কাছে, দুর্দান্ত গোলগাপ্পা। অসি চৌরাহার কাশী স্টলের সবজি-কচৌরি আর জিলিপিও অসাধারণ।

ঠিক করেই রেখেছিলাম, একটা দিন শুধু রাখা থাকবে মণিকর্ণিকা ঘাটের জন্য। বারাণসীর সবচেয়ে পবিত্র ঘাট এই মণিকর্ণিকা। এখান থেকেই যে পাওয়া যায় মোক্ষ, পাওয়া যায় অনন্ত মুক্তি। মৃত্যু পথযাত্রী বয়স্ক মানুষদের ভিড়, তাঁরা বিশ্বাস করেন, এখানে মারা গেলে মুক্তি পাওয়া যায়। বলা হয় এই ঘাটে চিতার আগুন কোনওদিন নেভে না।

বিকেলের দিকে পা বাড়িয়েছিলাম চেত সিং ঘাটের দিকে। এই ঘাটের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা ইতিহাস। ১৭৮১ সালে এখানেই লড়াই হয়েছিল ওয়ারেন হেস্টিংস আর চেত সিংহের। চেত সিংহ এখানেই একটি ছোট্ট কেল্লা তৈরি করেছিলেন সুরক্ষার জন্য। যুদ্ধে তিনি হেরে যান এবং ব্রিটিশরা এই কেল্লা দখল করে। ১৮ শতকের পুরনো এই ঘাটে তিনটে শিবমন্দির আছে। সূর্যাস্তের পরে ঘাটে বসে আরতি দেখছিলাম। সন্ধ একটু গাঢ় হতে পা বাড়ালাম, গলি পেরিয়ে নির্জনতার স্বাদ খুঁজতে গিয়ে হোঁচট খেলাম, ভুলেই গেছিলাম, সব যে কর্পোরেট, গলিও তাই কর্পোরেট চাদরে মোড়া।

মুসলিম সেনানায়ক মীর রুস্তম আলির নামে নামাঙ্কিত মীর ঘাট। এখানে জরাসন্ধেশ্বর আর বৃহদাদিত্যর উদ্দেশে পুজো হয়। বৃহদাদিত্যর অঞ্চলে আশা বিনায়ক ও যজ্ঞ বরাহন্দ বিশালাক্ষীর মূর্তি আছে। আছে একটি পবিত্র কুয়ো, যা ঘেরা পাঁচটি মন্দির দিয়ে এবং দিভদস্বেশরের মূর্তি দেখা যায় ধর্মকূপ বলে একটি অঞ্চলে। মীর ঘাটের দিকে শতাব্দী প্রাচীন বটুক ভৈরব মন্দির। ১৭৫০ সালের মুঘল স্থাপত্য দেখতে গিয়েছিলাম রামনগর কেল্লায়।

পরের দিন সকালেই গন্তব্য দ্বারভাঙা ঘাট। নাগপুরের অর্থমন্ত্রী শ্রীধর নারায়ণ মুন্সি এই ঘাট নির্মাণ করেন। তাই এই ঘাটের আরেক নাম মুন্সি ঘাট। আমি ক্যামেরা চালাতে বিশেষ পটু নয়, তবে প্রকৃতির ছবি, জলের ছবি, টলটলে জলে সূর্যের ছায়া, মাঝির দাঁড়ে ছলাত্ শব্দে নৌকাদের এগিয়ে যাওয়া, ছইয়ের নীচে দুর্নিবার প্রেম আর যায় ভেসে যায় আদরের নৌকার ছবি দেখতে মন উচাটন হয় বইকি! এখানে একটি ১৯০০ শতকের দুর্গ আছে, যার মালিক হল বিহারের একটি পরিবার। গোটা দুর্গ নির্মিত হয়েছে বেলেপাথর দিয়ে। গ্রিক স্তম্ভের ব্যবহার করা হয়েছে এই দুর্গে। শানবাঁধানো ঘাটে এপাশ ওপাশ করতে করতে নিজেকে মাঝে মাঝে জটায়ু মনে হচ্ছিল, এই

তো বেঁচে আছি, অক্ষত। দুপুরের দিকে চন্দ্রপ্রকাশ স্যাংচুয়ারির গভীর অরণ্যে ঘুরে এলাম। সোনা আর রূপোর ব্রোকেড ও জরির কাজ দেখতে তাঁতিদের গ্রাম সরাই মোহনাতেও ঢুঁ মারি।

দুপুরের খাওয়া সেরে হঠাত্ মনের মধ্যে গানটা বেজে উঠল, খাইকে পান বনারসওয়ালা, ব্যস দে ছুট গোদোউইলিয়া বাজার। শুধু পান নয়, এ বাজারের কালাকাঁদ একবার খেলে বারবার খেতে ইচ্ছে করবেই। সিন্ধিয়া ঘাটও বেশ সুন্দর। পুরাণ বলে, এখানে জন্মেছেন দেবতা অগ্নি। নানা রঙে রাঙানো এই ঘাটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অর্ধেক জলমগ্ন শিবমন্দির। এই মন্দিরের বয়স ১৫০ আর ১৮৩০ সালে এই ঘাটের কিছু নির্মাণ কাজ হওয়ার সময় মন্দিরটি অর্ধেক জলে ডুবে যায়। দেখলাম, এই ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। অতএব পাড়ি দাও নিরুত্তর জলের কাছে, অসীম বৈভবের কাছে। সূর্যাস্তের পর উঠে পড়লাম নৌকোয়।

শেষ দিনটা রেখেছিলাম দশাশ্বমেধ ঘাটের জন্য। লালমোহন গাঙ্গুলির বাণী একদম যথার্থ। এই ঘাটে একটা ব্যাপার আছে। সন্ধ্যারতিতে দেখতে দেখতে মন যে এভাবে বাঁধা পড়ে যাবে, ভাবিনি। পুরাণ বলে, প্রজাপিতা ব্রহ্মা যজ্ঞ করার সময় দশটি ঘোড়াকে বলিদান করেন আর তাই এই নামকরণ করা হয়েছে। এখানে মূলত অগ্নি দেবতার পুজো করা হয়। এছাড়া সূর্য দেবতা , শিব ও গঙ্গা নদীর আরাধনাও করা হয়। রাজপুত স্থাপত্যের জন্য মানমন্দির ঘাট দেখতেও ভুলিনি। জয়পুরের মহারাজ মান সিংহ ১৬ শতকের মাঝামাঝি এই ঘাট নির্মাণ করেন। এখান থেকে গঙ্গার দুই পাড়ই দেখা যায়।

কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরকে ঘিরেই হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীদের আনাগোনা। দশাশ্বমেধ ঘাটের আরতি, মাঝরাত থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোরে বিশ্বনাথের দর্শন, পুজো। দিন-রাত এক করে চলে যজ্ঞের প্রস্তুতি, আরতির আয়োজন। কাশী বিশ্বনাথের গলি, দশাশ্বমেধ ঘাট এখনও কোনও রাতে ঘুমোয়নি তাই। ঘুমোয়নি কখনও দশাশ্বমেধের অনতিদূরের মণিকর্ণিকা ঘাটও! সেখানে নেভেনি কখনও কাঠের চুল্লির আগুন। নিভলেই বা চলে কী করে? কত মরণাপন্ন আশা নিয়ে দিনের পর দিন মৃত্যুর অপেক্ষা করেন এ শহরে এসে, শুধু মণিকর্ণিকার কোনও এক চুল্লিতে তাঁর স্বর্গারোহণের ব্যবস্থা হবে। কাশী যে তাঁদেরও একান্ত আপন। কাশীর ঘাটে ঘাটে পুরাতনী প্রেম খোঁজার চেষ্টা করেছি, গলিতে গলিতে খুঁজেছি সেই পুরনো বেনারসকে, ঐতিহ্যের সুনিপুণ মায়াজাল কীভাবে এক বারান্দা থেকে আরেক বারান্দায় অবলীলায় ছড়িয়ে পড়েছে, অন্ধকার রাতে ফেলু মিত্তিরের সেই জলদ গম্ভীর কণ্ঠ, অলি গলি চলি রাম ফুটপাতে ধুমধাম কালি দিয়ে চুনকাম মনে করার চেষ্টা করে গেছি অবিরাম।

কিন্তু বারাণসী সব মিলমিশের আহ্লাদে গোটা বিশ্বের কাছে হয়ে উঠেছে ভরানসি। বাঙালিটোলার গলি যত না বাঙালি, তার চেয়ে বেশি যেন হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক। জাপানি বৌদির কেবিন, নেপালি কাকিমার দোকান তো আছেই, সঙ্গে ফরাসি-ইতালীয়-মার্কিন দাদা-কাকা, দিদির সংসার যে কম নেই এ তল্লাটে। সকলেই কি ধর্মমুগ্ধ? বেনারসের অলিগলির সংসার দেখতে গেলে তাই বাদ দেওয়া চলে না বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, রাজকীয় বারাণসীর রাজাদের বাসস্থান রামনগর কেল্লা, বারাণসীর মুসলিম পাড়া এবং কয়েক কিলোমিটার দূরে বৌদ্ধ ধর্মের পীঠস্থান সারনাথ।

এতেই শেষ নয়। বারাণসী যার হাতে হয়েছে বনারস, সেই উচ্চাঙ্গ বেনারস ঘরানার কথাও মাথায় রাখতে হবে। খেয়াল, ঠুমরি, বেনারসি শাড়ি, মশলার গন্ধে ম ম করা বারাণসী মেজাজ কম মানুষকে টানেনি এ শহরে। আজও দেশ-বিদেশের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী সঙ্গীতের তালিম নিতে হাজির হন এখানে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাবও এই শহরের গলিতে গলিতে। কোনও এক গুরুর উঠোনে কাঠের

বেঞ্চে বসে গুরু-শিষ্যদের বাদ্যে-কণ্ঠে রাগের স্পর্শ সঙ্গী হয়ে রয়ে আমার যাবে আজীবন। এমন এক সন্ধে ছাড়া বারাণসী কথকতা সম্পন্ন হয় কী করে।

হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, ত্রিলোকের প্রধান দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন দেবতার মধ্যে ভগবান শিব বারাণসী শহরের নির্মাণ করেন। একদা ব্রহ্মা এবং শিবের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়, সেই যুদ্ধে ব্রহ্মার পাঁচটি মাথার একটি খণ্ডন করেন ভগবান শিব। যুদ্ধে জিতে ব্রহ্মার কাটা মাথা হাতে নিয়ে নিজের জয় ঘোষণা করেন। ভগবান শিব প্রায় সব সময়ই ব্রহ্মার মাথাটি মুঠোবন্দি করে রাখতেন। কিছুদিন পর শিব যখন বারাণসীতে আসেন, হঠাৎ করেই তাঁর মুঠোবন্দি ব্রহ্মার মাথাটি মাটিতে পড়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ সেই মাথাটি উধাও হয়ে যায়। এই ঘটনার পর থেকেই হিন্দু শাস্ত্রে বারাণসীকে পবিত্র স্থান হিসেবে মনে করেন হিন্দু ভক্তরা। বারাণসী শুধুমাত্র হিন্দু ধর্ম নয়, বৌদ্ধ ধর্মেরও অন্যতম পীঠস্থান। খ্রিস্টপূর্ব ৬৩৫ সালে চৈনিক পর্যটক হিউএন সাং বেনারসে আসেন। সেই সময় এই শহরের সংস্কৃতি এবং ধর্ম তাঁকে মুগ্ধ করে। ৮ম শতকে আদি শংকরাচার্য এখানে শিবের মন্দির নির্মাণ করেন। মধ্যযুগে বারাণসী চেরো সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। পরবর্তীকালে আকবরের আমলে এই শহরের আরও বিকাশ ঘটে।

ফিরে আসার সকালে আবার সেই খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়েছিলাম। সেই পা ডুবিয়ে বসে থাকা, এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছিল, বিস্তীর্ণ জলরাশি দোল খাচ্ছিল সকালের নরম আলো মেখে, ঘাটে সার দিয়ে বাঁধা নৌকাগুলো অন্য বিকেলের ছইয়ের গল্প বলছিল, কান পেতে শুনছিলাম। পিছন ফিরে তাকাতে চায় না ওরা। এই বর্তমানে বাঁচতে চায়, কর্পোরেট বেনারসই ওদের রুটি-রুজি। অমৃতপ্রবাহিনী গঙ্গা আপন মনে বয়ে চলেছে। জিজ্ঞেস করলাম, গঙ্গা তুমি কোথা হইতে আসিয়াছো? ঠিক তখনই ছলাত্ করে জল এসে ভিজিয়ে দিল সিঁড়ির পাশে ছোট-বড় শিবলিঙ্গকে। পুণ্যতোয়া গঙ্গার অর্ধচন্দ্রাকৃতি বামতীরে জ্ঞানপীঠ থেকে ফিরলাম অনেকটা জ্ঞান আহরণ করে। না, চেনা পাড়া ছেড়ে বেপাড়ায় ঠাকুর দেখা নয়, বাঙালিটোলার পুজোর আবহেও বিনা-পুজোর কর্পোরেট গলিতে মগনলালকে খুঁজে পাইনি। না হলে এক গ্লাস সবুজ সরবত গেলাসে নিয়ে গিয়ে বলতাম, এ সরবতে বিষ নাই।

দিব্যেন্দু ঘোষের জন্ম সাঁকরাইল, হাওড়া, বাণিজ্যে স্নাতক, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপনে স্নাতকোত্তর, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, আজকাল, প্রতিদিন, সকালবেলা, স্বভূমি, স্টার আনন্দ, জি 24 ঘণ্টা, রিপাবলিক বাংলা, কলকাতা টিভির মতো প্রথম সারির বাংলা লেখ্য ও দৃশ্য মাধ্যমে দীর্ঘ কাজ, একাধিক প্রবন্ধ, গল্প, ভ্রমণ কাহিনি, রম্য রচনা, মুক্তগদ্যের লেখক।

মার্জার উপাখ্যান

বড়গল্প

অনন্যা দাশ

সেদিন অফিস থেকে ফিরে আমি যা দেখলাম তাতে আমার মেজাজটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। মায়া আবার একটা বিড়াল নিয়ে এসেছে! আমার বলতে দ্বিধা নেই যে কোন রকম পোষ্য আমার বাড়িতে থাকুক সেটা আমার মোটেই পছন্দ নয়। সে কুকুর হোক, বিড়াল হোক, পাখি হোক বা অন্য কোন জন্তু। তখন যেন বাড়িটা আর আমার নিজের থাকে না। তাদের গা থেকে বিটকেল গন্ধ বেরোয়, চারিদিকে লোম ছড়ায়, সেই সব দেখলে বা সেই সবের কথা ভাবলেই আমার মাথা গরম হয়ে যায়। তা আমার স্ত্রী মায়া কিন্তু কিছুতেই আমার কথা শুনবে না। একে তো ব্যাঙ্ক থেকে আমাকে এই ধ্যারধ্যারে গোবিন্দপুরে ট্রান্সফার করে দিয়েছে। মায়ার মতে এটা নাকি পানিশমেন্ট ট্রান্সফার। সে ও যা ভাবে ভাবুক আমার বয়েই গেছে। বাড়িটাও পেয়েছি একখানা অন্ধকার অন্ধকার স্যাতসেঁতে মতন, আলো টালো বিশেষ ঢোকে না এমন দোতলা একটা বাড়ি। রান্নাঘর বসবার ঘর আর খাওয়ার ঘর নিচের তলায় আর শোওয়ার ঘরগুলো ওপরে। বাড়িটার দুপাশেই খালি জমি পড়ে রয়েছে অনেকটা করে। সে যেরকমই হোক আমার মাথা গোঁজার ঠাঁই তো।

তা যা বলছিলাম এমনিতেই মেজাজটা আজ ভালো নেই। ম্যানেজার ওই বিরু খ্যাপা কী সব হিসেব মিলছে না করে আমার পিছনে লেগেছিল। মিলছে না তো মিলছে না। তা আমি কী করব? এও না যে লক্ষ লক্ষ টাকার হিসেব, কী না বাইশ টাকা উনসত্তর পয়সার হিসেব মিলছে না। ভাবখানা এমন তার যেন আমিই সরিয়েছি! আমার বলতে ইচ্ছে করছিল, 'আমি কি এতই বোকা নাকি যে ওই বাইশ টাকার ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করব?' আজ কোন রকমে পালিয়ে বেঁচেছি। কাল আবার ওই একই জাঁতাকলে গিয়ে পড়তে হবে। তার মধ্যে বাড়ি ফিরে যদি দেখি বউ একটা বিড়াল কোলে নিয়ে বসে রয়েছে তাহলে কার না মেজাজ গরম হয়! আর সে যে সে বিড়াল নয়। একেবারে কালো কুচকুচে একটা বিড়াল যার গায়ে ছিঁটেফোঁটাও অন্য কোন রঙ নেই। চোখগুলো একেবারে হলুদ। মায়া আর বিড়াল দুজনেই আমার দিকে চেয়ে রয়েছে আর দুজনের মুখেই একটা অমানুষিক হাসি। বিড়ালকে আমি কোনদিন হাসতে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না তবে এ ব্যাটার মুখে যেন একটা ক্রূর হাসি।

আমি রেগে গিয়ে মায়াকে জিগ্যেস করলাম, "কেন একে এনেছো? তুমি জান না আমি বিড়াল পছন্দ করি না?"

মায়া একটা নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলল, "জানি তো! সেই জন্যেই তো এনেছি!"

আমি অবাক হয়ে মায়ার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মায়া এখন বিশালবপু এক নারী। অথচ আমি যখন ওকে বিয়ে করেছিলাম তখন ও মোটেই এই রকম ছিল না। রীতিমত তন্বী যুবতী ছিল। সুন্দরী অবশ্য ও কোনকালেই ছিল না। ওর বাবার কোম্পানিতে অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলাম আমি। বড়োলোক বাবার একমাত্র কন্যা বলেই আমি মায়াকে বেছে নিয়েছিলাম। অভিনয়টা মনে হয় ভালোই করেছিলাম। মায়া আমার প্রেমে মজেছিল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আমাদের। তবে আমার কপাল বরাবরই মন্দ। বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে মায়ার বাবা গত হলেন। তখন জানা গেল কোম্পানির অবস্থা নাকি ভালো ছিল না। দেনায় একেবারে জর্জরিত। অথচ আমি অ্যাকাউন্টেন্ট হয়েও সেটা বুঝতে পারিনি। আমারই দোষ।

তারপর থেকেই মায়া আর আমার সম্পর্কটা ক্রমে শিথিল হতে হতে একেবারে বরফ শীতল হয়ে গেল। এখন আমি একটা ব্যাঙ্কে কাজ করি আর মায়া ঘরে বসে থাকে সারাদিন। নড়াচড়াও যে খুব একটা করে বলে মনে হয় না। সকালে একটা মেয়ে এসে রান্নাবান্না আর ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। সেই খাবারই আমরা দুবেলা খাই। মায়া আজকাল সাজগোজও করে না, সব সময় আলুথালু নাইটি পরেই থাকে। আমি নাকি নাক ডাকি সেই বলে অন্য ঘরে শোয় সে। তা শুক তাতে আমার বরং মোবাইলে ভারচুয়াল সুন্দরীদের সঙ্গে কথা বলতে সুবিধা হয়।

তা আবার অন্য পথে চলে যাচ্ছি। এখন এই মুহূর্তে আমার সমস্যা হল একটা কুৎসিত দেখতে কালো বিড়াল আমার বাড়িতে এসে ঢুকেছে! ওটাকে কী ভাবে বিদায় করা যাবে সেটাই এখন আমার প্রধান চিন্তা। আগে যখন আমরা শহরে ছিলাম তখনো মায়া একটা বিড়াল জোগাড় করেছিল। সেটা এই বিড়ালটার তুলনায় একশোগুণ ভালো ছিল। সাদা রঙের বিড়াল, গায়ে বাদামি ছোপ, তবে তার চোখগুলোও হলুদ ছিল। একেবারে নিরীহ একটা বিড়াল কিন্তু ওই যে বললাম অন্য কোন প্রাণীর সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতে আমার একেবারেই ভালো লাগে না। আমি তাই সুযোগ বুঝে একদিন বাড়ির সদর দরজাটা খুলে রেখেছিলাম বিড়ালটা যাতে বেরিয়ে যেতে পারে। বাকিটা বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়া একটা গাড়িই করেছিল। মায়া তখন দুপুরে ঘুমোচ্ছিল। সব কিছু ঘটে যেতে লেগেছিল বড়ো জোর দশ মিনিট। তারপর আমি দিব্যি দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভাজা মাছটি উলটে খেতে পারি না মুখ করে টিভি দেখছিলাম। মায়া ঘুম থেকে উঠে তার বিড়ালকে খুঁজল (কী একটা নামও দিয়েছিল, এখন ভুলে গেছি, অতশত আর মনে থাকে না)। আমাকেও দুয়েকবার জিগ্যেস করল কিন্তু আমি বলেছিলাম জানি না। বিকেলের দিকে পাশের বাড়ির এক মহিলা এসে দুঃখের খবরটা দিয়ে গেলেন মায়াকে। এরপর মায়ার চাহূনিতে আগুন ঝড়ে পড়ছিল। যেন সে বুঝতে পেরেছিল কাজটা আমারই। আমি অবশ্য দিব্যি নির্বিকার ছিলাম। বন্য প্রাণীটা আমার বাড়ি থেকে বিদায় হয়েছে সেই আনন্দে। ওই ঘটনাটার থেকেই মায়ার ওজন বাড়তে শুরু করল। এখন সে প্রায় একশো কুড়ি কেজিতে এসে ঠেকেছে। থপ থপ করে হাঁটে, নাইটি ছাড়া কোন পোশাক পরে না। আর সেই নাইটিও স্পেশাল অর্ডার দিয়ে তৈরি করাতে হয়, অত বড়ো সাইজের নাইটি এমনি পাওয়া যায় না।

নাহ আবার অন্য দিকে চলে যাচ্ছি। মায়ার ওজনটা এখন সমস্যা নয়। সমস্যা হল ওই বিশ্রী দেখকে জীবটা। সেটাকে বাড়ি থেকে কী করে তাড়ানো যায় তাই ভাবতে হবে আমাকে। এটা তো একটা ঘুমন্ত জায়গা। এখানে দরজা খুলে রেখেও লাভ নেই। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা দিয়ে ঘন্টায় একটা গাড়ি যায় কিনা সন্দেহ। মায়া ঠিক ধরে ফেলবে। তাছাড়া এই কালো বিড়ালটা খুব একটা আমার কাছেও ঘেঁসে না। আমি দরজা খুলে রাখলেও বাইরে যাবে কিনা সন্দেহ।

আমি কী করব ভেবে উঠতে উঠতেই এক সপ্তা বেরিয়ে গেল। কালো বিড়ালটাকে দেখলে ঘেন্নায় আমার বমি হয়ে যাওয়ার জোগাড় আর সেই কিনা আমার বাড়িতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি মায়াকে দুয়েকবার বলতে চেষ্টা করলাম কিন্তু সে আর শোনবার পাত্রী নয়। সে যেন এখন কেমন একটা হয়ে গেছে। সব সময় ওই কুৎসিত জীবটাকে নিয়ে আমার সোনাটা, মোনাটা, বাবাটা করে চলেছে। বিরক্তিকর একেবারে! আমি ভেবে দেখলাম, নাহ যা করার তাহলে আমাকেই করতে হবে। আর শুভস্য শীঘ্রম। সেদিন রাতে আমি চুপি চুপি আমার শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। খুট করে যতটুকু শব্দ হল তাতে মায়ার ঘুম ভাঙ্গল না। তার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম কিন্তু দরজার যে অল্প ফাঁক সেই ফাঁক দিয়ে এক

জোড়া হলুদ চোখ আমাকে দেখছিল। আমি ধীর পায়ে সিঁড়ির দিকে যেতে সেও এগিয়ে এলো।

আমি এক লাফে খপ করে তাকে ধরে নিচে ছুঁড়ে ফেলতে গেলাম কিন্তু সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। আমার পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল সে আর ওকে ধরতে গিয়ে আমিই হুমড়ি খেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে গিয়ে পড়লাম। পরিত্রাহি চিৎকার, ডাক্তার বদ্যি। শেষমেশ পায়ে প্লাস্টার আর একটা ক্রাচ নিয়ে তিন মাস কাটালাম। মায়াকে যতবার বলতে চেষ্টা করলাম যে বিড়ালটার জন্যে পড়েছিলাম ও শুনলই না বলল, "মিছি মিছি তুমি আমার সোনাটার নামে দোষ দিচ্ছ। ও তো সেদিন রাতে আমার সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিল। শোবার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল ও বেরোবে কী করে? আমি যখন ঘর থেকে বেরোলাম ও তখন আমার সঙ্গে বেরোলো।"

আমার পাটা সেরে উঠতে আমি ঠিক করলাম আরেকবার চেষ্টা করব। ওই কালো প্রাণীটার উপস্থিতিটাকে আমি আর নিতে পারছিলাম না। আমি জানতাম মায়া দুপুরে ভাত খেয়ে দিবানিদ্রা দেয়। সেই সময়টায় ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে বাড়ি চলে এলাম আমি। আমি দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকতেই ব্যাটা দেখি কোথা থেকে এসে উদয় হয়েছে! আমি তৈরি হয়েই এসেছিলাম। খপাত করে পিজবোর্ডের বাক্সটা দিয়ে ব্যাটাকে চাপা দিয়ে দিলাম। আর যাবে কোথায়! এর পর বেশ কয়েকটা কাগজে আগুন ধরিয়ে ঝাঁ করে তলা দিয়ে বাক্সটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল আগুন। গলগল করে ধোঁয়া। আমি ভেবেছিলাম ভিতর থেকে প্রচন্ড ক্যাঁও ম্যাঁও শুনব কিন্তু তেমন কিছুই হল না। ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধে মায়া ঘুম থেকে উঠে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে চিৎকার জুড়ে দিল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বাড়িতে আগুন লাগাতে চাও?" বলে থপথপিয়ে রান্নাঘর থেকে এক বালতি জল এনে আগুনের ওপর ফেলল। আমি তখন পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রয়েছি কারণ মায়া যাকে কোলে করে নিয়ে এসেছে ওপরের তলা থেকে তাকেই আমি পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করছিলাম! সে কী করে পালালো, কখন পালাল, সেটাই আমার মাথায় ঢুকছিল না।

আমাকে মানসিক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে চাইছিল মায়া। আমি মোটেই রাজি হইনি। বলেছিলাম, "আমার যা কিছু শরীর খারাপ তোমার ওই বিড়ালটার জন্যে। ওটাকে বিদায় করলেই আমি সুস্থ হয়ে উঠব।" মায়া অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল, কিছুই বলেনি।

আমি অপেক্ষায় ছিলাম কবে মায়া ডাক্তারের কাছে যাবে। একমাত্র ডাক্তারের কাছে গেলেই সে বিড়ালটাকে বাড়িতে একলা রেখে যায়। আমাকে বলতে চায় না কবে তার অ্যাপায়েন্টমেন্ট তাই আমিও এক কাঠি বাড়া হয়ে ডাক্তারের অফিসে ফোন করে জেনে নিলাম। মায়ার স্বামী বলছি শুনে ওরা কোন রকম ঝামেলা না করেই তারিখ আর সময়টা বলে দিল। আমি দিন গুনতে শুরু করলাম।

মায়ার অ্যাপায়েন্টমেন্ট সকাল এগারোটা নাগাদ তাই তাকে বাড়ি থেকে সকাল সাড়ে দশটায় তো অন্তত বেরতেই হবে ভেবে নিয়ে আমি পৌনে এগারোটা নাগাদ বাড়িতে এসে ঢুকলাম। সে ব্যাটা হলুদ চোখ ঠিক হাজির। আমি তাকে বললাম, "আজ তোর হলুদ চোখের শয়তানি আমি শেষ করব!"

এবার আর আমি কোন ঝুঁকি নিলাম না। ছুরি দিয়ে শেষ করলাম কালো আপদটাকে। টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে ছুরি শুদ্ধু প্লাস্টিকে মুড়ে পাশের খালি জমিটার শেষ প্রান্তে যে গাছটা সেটার গোড়ায় পুঁতে দিয়ে এলাম। আশপাশে কেউ ছিল না। কেউ দেখেনি আমাকে। আহ, কি নিশ্চিন্ত যে লাগছিল যে কী বলব! দিনটাও যেন ভারি সুন্দর। নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতন মেঘ। শরৎকাল বুঝি বা এসে গেল। বেশ ফুরফুরে মন নিয়ে ব্যাঙ্কে ফিরে গেলাম।

বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে দেখি বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি। বাড়িতে ঢুকে দেখলাম পুলিশের দুজন আমাদের বাইরের ঘরে বসে রয়েছে।

আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, "কী ব্যাপার?" বিড়ালকে না পেয়ে মায়া আবার পুলিশ ডেকে বসল নাকি?

পুলিশের একজন বলল, "আমরা একজনকে খুঁজছি। সমর লাহা। পাশের জমিটা ওঁদের। উনি আজ দুপুরে এদিকে এসেছিলেন জমিতে মাপজোক না কী যেন করতে তারপর থেকে তাঁকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি তাকে দেখেছেন?"

আমি সত্যি কথাই বললাম, "না, আমি কাউকে দেখিনি। আমি তো সেই সকালে ব্যাঙ্কে চলে যাই আর বিকেলে ফিরি।"

পুলিশের লোকটার ভ্রু কুঁচকে গেল, "আপনি মিথ্যে কথা না বললে আমরা হয়তো আপনাকে বিশ্বাস করেও নিতাম কিন্তু আজ তো আপনি সারাদিন ব্যাঙ্কে ছিলেন না। আপনি বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন এগারোটা নাগাদ আর তার কিছুক্ষণ পরে একজন আপনাকে পাশের জমিতে কিছু একটা পুঁততে দেখেছে। না, অস্বীকার করবেন না মিস্টার সরকার, আমাদের সাক্ষী অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য।"

আমি তখন বলতে বাধ্য হলাম, "হ্যাঁ, আমি পাশের জমিতে গাছের তলায় আমাদের বিড়ালটাকে পুঁতছিলাম। সে হঠাৎ মারা যায়," মায়ার দিকে তাকাতে পারছিলাম না আমি।

পুলিশের লোকটা চোখ কটমট করে জিগ্যেস করল, "আপনাদের কটা বিড়াল?"

মায়া বলল, "আমি জানি না ও কী বলছে। আমাদের তো এই একটাই বিড়াল।"

আমি চমকে তাকিয়ে দেখলাম মায়ার বিশাল কোল আলো করে বসে রয়েছে তার কালো মানিক! কিন্তু তাহলে তাহলে...আমি আর ভাবতে পারছিলাম না।

পুলিশের লোকটা বলল, "আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে!"

আমাকে নিয়ে পাশের জমিতে গেল ওরা।

"কোন জায়গাটা বলুন তো?"

আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন একটা মেশিনের মতন হয়ে গেছি। আমার কোন কিছু ভাববার ক্ষমতা নেই। আঙ্গুল দিয়ে গাছের তলাটা দেখালাম ওদের।

দুজনে মিলে একটু খুঁড়েই ছুরিটা পেয়ে গেল। সঙ্গের প্লাস্টিকের প্যাকেটটা খুলতেই একটা হাত বেরিয়ে পড়ল, রক্তহীন মানুষের হাত। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম।

আমি এখন জেলে। মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছি বলে মৃত্যুদন্ড থেকে রেহাই পেয়েছি কোনক্রমে। যদিও সমর লাহার পরিবারের লোকজন প্রচুর চেষ্টা করেছিল আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার।

মায়ার কোন খবর আমি জানি না। সে কোনদিন এখানে আসেনি আমাকে দেখতে। সেও মনে হয় চেয়েছিল আমার মৃত্যুদন্ড হোক তার বিড়ালের মৃত্যু চাওয়ার জন্যে। হয়তো সে জেনে খুশি হবে যে আমার এই জীবন মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ। ঘুমোতে পারি না আমি। সব সময় ভাবি সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল কিন্তু সঠিক কোন উত্তর পাই না। প্রবল ক্লান্তিতেও চোখ বুজলেও আমাকে ধাওয়া করে বেড়ায় একজোড়া হলুদ চোখ!

অনন্যা দাশ পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের হার্শি-তে বাস করেন এবং পেন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত। শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা গল্প এবং উপন্যাস কলকাতার প্রায় সব নামকরা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

ত্রিনয়না

বড়গল্প

সুস্মিতা ঘোষ

জেঠিমা-আ-আ-আ....

বহুদূর থেকে অস্পষ্ট একটা ডাক ভেসে এল। যেন নিকষ কালো অন্ধকার চিরে দেখা দিল সূক্ষ্ম আলোর রেখা, চোখ সয়ে এলে যাকে ঠাওর করা যায়।

বহু কষ্টে আঠার মতো লেগে থাকা দু'চোখের পাতা টেনে খুলে তাকাতে চেষ্টা করলেন জেনারেল ফিমেল ওয়ার্ডের দু'শ আট নম্বর বেডের পেশেন্ট শ্রীমতী মন্দিরা আচার্য। তিনদিন আগে কেউ বা কারা তাকে এই হাসপাতালে ভরতি করে দিয়ে গিয়েছে। যখন আনা হয় তখন তার পরনে ছিল শতছিন্ন ধূলিমলিন পোশাক। দীর্ঘদিন অনাহার উৎকণ্ঠায় অচেতন অবসন্ন দেহ। বিগত দিনগুলিতে ক্রমাগত স্যালাইন আর প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে হাসপাতালের তরফ থেকে। আজ প্রথম তিনি চোখ মেলে তাকালেন, যদিও সে চোখের সামনের দৃশ্যপট তখনও সম্পূর্ণ ঝাপসা। দূর থেকে ভেসে আসা ডাক এবার খুব কাছ থেকে বলে উঠল, "জেঠিমা! শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?"

যাকে উদ্দেশ্য করে ডাকা, তার চোখ এখনও ভাষাহীন। চেষ্টা করছে বোঝার কিন্তু বোধগম্য হচ্ছে না, " কে ডাকছে? কেন ডাকছে? কোথা থেকে ডাকছে?"

যিনি ডাকছিলেন, তিনি এই হাসপাতালের হার্ট স্পেশালিস্ট ডা. অনামিকা শিকদার। মাত্র এগারো মাস হয়েছে তিনি এখানে জয়েন করেছেন। অন্যদিনের মতোই হাসপাতালের স্বাভাবিক রাউন্ডে এসে তিনদিন আগে তিনি পেশেন্টকে প্রথম আবিষ্কার করেন। তারপর থেকে নিয়ম করে প্রতিদিন তিন বেলা এই বেডের কাছে এসে একই আকুতি নিয়ে 'জেঠিমা' বলে ডাকেন, কিন্তু একদিনও রোগী সাড়া দেয় না। চোখ মেলে তাকায় না। চেতনার ওপার থেকে এপারে আসার সম্ভাবনা দেখা দেয় না। আজ ডাকার পর আকস্মিকভাবে পেশেন্টের চোখ মেলে তাকানো, ভাষাহীন দৃষ্টি ডা. অনামিকা শিকদারের চোখের কোণেও একফোঁটা টলটলে জলবিন্দু জমা করল।

পাশে দাঁড়ানো নার্স মেয়েটি প্রতিদিন লক্ষ করে, আজ সাহস করে জিজ্ঞেস করল, "ইনি আপনার কেউ হন ম্যাডাম?"

"উঁ", চেতনার ওপার থেকে ডাক্তারও যেন ফিরে এসে বললেন, "হুঁ...", তারপর ধীর পায়ে ফিরে গেলেন নিজ চেম্বারে।

রাত্রি দশটার রাউন্ডে যখন ফিরে এলেন অনামিকা, মন্দিরা তখনও অচেতন প্রায়। তবে ডাকলে সাড়া দিচ্ছেন, চোখ মেলে তাকাচ্ছেন, কিন্তু কাউকে চিনতে পারছেন বলে মনে হচ্ছে না। পরবর্তী চারদিনে অবস্থার ধীরে ধীরে অনেকটাই উন্নতি হয়েছে, আর সবটাই সম্ভব হয়েছে ডা. অনামিকা শিকদারের অক্লান্ত পরিশ্রম, সেবা ও চিকিৎসার ফলে। এখন মন্দিরাদেবীর দৃষ্টি অনেক স্বচ্ছ, সকলকে চিনতেও পারছেন। সেদিনটা ছিল শরৎকালের এক রবিবার। গত দু'দিনের টানা অকাল বর্ষণের পর ঝকঝকে রৌদ্রোজ্জ্বল এক সকালের দেখা পাওয়া গেছে। সকাল বেলার রাউন্ড সেরে ইচ্ছে করে সবশেষে ফিমেল ওয়ার্ডে এলেন অনামিকা। সমস্ত রোগীদের খোঁজ খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের

বিলি-ব্যবস্থা করে দিয়ে এসে একটি টুল টেনে নিয়ে বসলেন দু'শ আট নম্বর বেডের পাশে। পেশেন্টের মাথায় একটি আলতো হাত রেখে বললেন, "কেমন আছ জেঠিমা?"

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন মন্দিরাদেবী, একটি ক্লিষ্ট হাসি হেসে বললেন, "ভালো..."

"আর কয়েকটা দিন কষ্ট করে এখানে থাকো, তারপর তুমি একদম সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাবে", একটু আশ্বাস দিয়ে বললেন অনামিকা।

"বাড়ি!" গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওই শীর্ণ বুকের খাঁচা থেকে।

"কেন! বাড়ি যেতে চাও না তুমি?" অনামিকার প্রশ্নের জবাবে শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মন্দিরা। তারপর ধীরে ধীরে বাস্তবে ফিরে বললেন, "হ্যাঁ, যাব। ফিরতে তো হবেই আমাকে আমার 'শান্তির নীড়ে'। ওটাই যে আজ আমার একমাত্র ঠিকানা...", একটু থেমে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, "একটা কথা বলব মা?"

"হ্যাঁ বলো না! অত ভাবছ কেন?"

"তোমাকে প্রতিদিন দেখি, আমার কাছে এসে অনেকটা সময় বসে থাক! গল্প কর! আমার খোঁজ খবর নাও!" একটু থেমে পাশের টুলে বসে থাকা ঝকঝকে স্মার্ট ইষৎ শ্যামলা মায়াবী মুখের ডাক্তারটিকে বললেন, "তোমার দেরি হয় না? এখানে সবাই বলে, তুমি খুব বড়ো ডাক্তার, খুব ব্যস্ত..."

এক মুহূর্ত বালিশে মাথা রেখে শুয়ে থাকা মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন অনামিকা। সময় ছাপ ফেলেছে ওই মাজা রঙের দাপুটে নারীর মুখে। চোখের দু'পাশে অজস্র বলিরেখা, চুলগুলোর বেশিরভাগই পাকা, বহুদিনের অযত্নে রুক্ষ শুষ্ক। হাত-পাগুলি শীর্ণ। বুকের পাঁজর ক'টি যেন গোনা যায়! মুখের ভেতর বেশিরভাগ দাঁতই নেই, যে'কটি আছে, সেগুলোও ইষৎ বড়ো। কিন্তু চোখগুলো এখনও বড়ো উজ্জ্বল, তাকালে মনে হয় উলটো দিকের মানুষের ভেতর পর্যন্ত পড়ে ফেলবে। সেই চোখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ছোটো ছোটো মুক্তোর মতো দাঁতে অনাবিল হাসি ছড়িয়ে অনামিকা বললেন, "মায়ের জন্য মেয়ের কখনও সময়ের অভাব হয়? না ব্যস্ততা কোনো বাধা হয়?" মন্দিরার বিস্মিত মুখের ভাব পড়ে ফেলে সঙ্গে জুড়লেন, "আমাকে চিনতে পারলে না জেঠিমা! আমি টুসি। তোমার ফুলটুসি..."

"ফুলটুসি!" বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া মণি-মুক্তোর সম্ভার সরিয়ে তিনি মন্থন দণ্ডটি নিয়ে খোঁজ করতে শুরু করলেন অমৃত কলসটি। এই নামটি যেন গতজন্মের ওপারে শোনা। কতদিন আগে হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে! কত বছর হল! আজ ঠিক হিসেব নেই। কুড়ি! পঁচিশ! না কি আরও বেশি! তিনি কি ঠিক শুনলেন! আবার একবার উচ্চারণ করলেন, "টুসি!"

সেটাও ছিল শরতের এক সকাল, দুর্গা সপ্তমী। কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই মন্দিরার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। কাল শেফালিকে অত করে বলে দিয়েছেন, আজ যেন কোনো ভাবেই কামাই না করে! আজ খোকন বাড়ি ফিরবে। অন্যসময় তো পড়াশোনার ভীষণ চাপ। পুজোর এই কয়টা দিনই বাছা যা একটু নিঃশ্বাস ফেলার সময় পায়। তিনিও দু'টো ভালো-মন্দ রেঁধে খাওয়াতে পারেন। সে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, চতুর্থ বর্ষ। ফাইনাল ইয়ার বলে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ-এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে, তাই এবার পুজোয় আসতে চাইছিল না। তিনি অনেক সাধ্যসাধনা করায় মাত্র চারদিন আগে আসবে বলে ফোন করেছিল। তাও থাকবে মাত্র দু'দিন। সময় নেই। তিনি তাই পাখি পড়া করে ঠিকা কাজের

মেয়ে শেফালিকে বলে দিয়েছিলেন, সে যেন কোনভাবেই আজ কামাই না করে। দেব না দেব না করেও পুজোর শাড়িটিও দিয়ে দিয়েছেন কাল। আর আজ তার আট বছরের পুঁচকে মেয়েটি এসে বলছে, "জেঠিমা! মায়ের কাল রাত থেকে খুব জ্বর! আজ আসতে পারবে না..."

"কী!" শুনেই মন্দিরার ব্রহ্মতালু জ্বলে গেছে, "আসবে না মানে! তাহলে এই সৃষ্টির কাজ করবে কে! তুই?"

"হ্যাঁ...", ছোটো ছোটো বিষণ্ণ চোখে একবার তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে প্রায় শোনাই যায় না এমন ফিসফিসে স্বরে বলল সে, "মায়ের শরীর তো ভীষণ খারাপ। তবুও আসতে চাইছিল। বলল, 'আজ তো তোর দাদাভাই আসবে, আমি না গেলে বৌদির উপর খুব চাপ পড়ে যাবে...', কিন্তু বিছানা থেকে উঠতে যেতেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল। আমি কোনোমতে তুলে চোখে-মুখে জলের ছিটে দিলাম...", বললাম, "তুমি শুয়ে থাক, আমি আজ জেঠিমার সব কাজ করে দেব..."

"তুই! তুই করবি এত কাজ?" মন্দিরার চোখ দু'টো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল!

"হ্যাঁ গো! মা যখন কাজে চলে আসে আমিই তো বাড়িতে বাসন মাজি। ঘরে ন্যাতা দিই। ভাতও রান্না করতে পারি...", গড়গড় করে এক নিঃশ্বাসে বলে থামল সে।

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে মন্দিরা বললেন, "উনি না কি বাড়ির সব কাজ করেন! উনি করবেন এই ছিস্টির কাজ! যা ইচ্ছে তাই কর...", গজ গজ করতে করতে তিনি গিয়ে ঢুকলেন রান্নাঘরে। আর ওই পুঁচকে মেয়েটি বাসনের পাঁজা নিয়ে বসল সবুজ শ্যাওলা পড়া পিছল কলপাড়ে। আধ ঘণ্টা পর রান্নার কাজ থেকে একটু অবসর পেয়ে মন্দিরা কলপাড়ে গিয়ে দেখলেন, সে উবু হয়ে বসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে ঘষে ঘষে বাসন মাজছে। পিঠের দু'পাশের হাড় দু'টো উঁচু হয়ে আছে। পরনের ফ্রকটাও একপাশে ছিঁড়ে ঝুলছে। দেখে মায়াই হল। বললেন, "বাসন মাজা হয়ে গেলে রান্নাঘরে চলে আসিস। কালকের দু'টো রুটি আছে, খেয়ে নিস..."

"আচ্ছা জেঠিমা..."

আরও পনেরো মিনিট পর ছেঁড়া ফ্রকেই হাত মুছতে মুছতে এসে মাথা নিচু করে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল মেয়েটি। রুটি দু'টো দিতেই বলল, "একটা কাগজ দেবে?"

"কেন?"

মাও তো সকাল থেকে কিছু খায়নি, এ দু'টো বাড়ি নিয়ে যাই? দু'জনে মিলে খাব..."

এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মন্দিরা বললেন, "এ দু'টো তুই খা। তোর মায়ের জন্য আমি দিয়ে দেব..."

মুহূর্তে ওই চোখ দু'টোতে খুশির ঝলক দেখা দিল। রুটি দু'টো নিয়ে দরজার আড়ালে বসে মাথা নিচু করে খেতে শুরু করল সে।

এদিকে মন্দিরা রান্না-বান্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সাড়ে দশটা বাজতে না বাজতেই হইহই করতে করতে খোকন এসে উপস্থিত হল। কাঁধের ব্যাগটি কোনোমতে নামিয়ে রেখেই জড়িয়ে ধরল মাকে। ছেলেকে বুকে চেপে ধরে আবেগে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন মন্দিরাও। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ছেলেকে বললেন, "তুই হাত-মুখ ধুয়ে আয়, আমি খাবার বাড়ছি। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই!" বলে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাপনায়। পরবর্তী দু'টো দিন কেটে গেল

যেন চোখের পলক ফেলার আগেই। খোকন ফিরে গেল তার ইউনিভার্সিটিতে, তার একদিন পর শেফালি এল কাজে। এই ক'দিন ওই পুঁচকে মেয়েটাই কোনোমতে কাজ চালিয়ে দিয়েছে। কাজ করতে করতে মন্দিরার সঙ্গে তার একটু ভাবও জমে উঠেছে। ওর নাম টুসি, কিন্তু মন্দিরা ওকে ডাকেন ফুলটুসি। এ নিয়ে ওদের মধ্যে খুনশুটি লেগেই থাকে। এরপর প্রায়ই এমন হতে লাগল। শেফালি মাঝেমাঝেই জ্বরে পড়ে, সঙ্গে খুসখুসে কাশি। যে দিনগুলো সে আসতে পারে না, সে ক'দিন টুসি কাজ করে। আবার সুস্থ হলে শেফালি আসে কাজে।

এমন করে কেটে গেল আরও প্রায় তিনমাস। এক শীতের সকালে দুম করেই সুতপা এসে হাজির হল মন্দিরার বাড়ি। সুতপা মন্দিরার ছেলেবেলার বন্ধু, একই পাড়াতে ছিল তাদের বাড়ি। এখন থাকে শিলিগুড়িতে, সেখানে একটি গার্লস স্কুলে সে বাংলার শিক্ষিকা। গোলগাল ছোটখাটো সদাহাস্যময়ী অবিবাহিত মেয়েটি ব্যক্তিত্বের প্রভায় উজ্জ্বল। কঠোর পরিশ্রম করে কিছু বছর আগে একটি চাকরি জুটিয়ে নিতেই ভাইদের সংসারে বোঝা না হয়ে বাড়ি থেকে দূরে পোস্টিং নিয়ে একা নিজের মতো থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মন্দিরার সঙ্গে বরাবরই যোগাযোগ ছিল, মন্দিরাও জেদাজেদি করত আসার জন্য। তাই এবার স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হতেই প্রথম সুযোগেই চলে আসে বালুরঘাটে।

সেদিনও শেফালি আসেনি, টুসি ব্যস্ত ছিল কাজে। বাড়ি ঢুকতেই সুতপার নজর পড়ে টুসির উপর। মন্দিরাকে ডেকে বলেন, "মেয়েটা কে রে? তোর বাড়িতে কাজ করে? কতটুকু মেয়ে!"

"না না, ও না, ওর মা কাজ করে। তা সে প্রায়ই জ্বরে ভোগে কি না! ওই ক'দিন ফুলটুসি কাজ করে..."

"ওর নাম বুঝি ফুলটুসি?"

"না না, টুসি। আমিই ওকে ফুলটুসি বলে ডাকি...", বলেই মন্দিরা হাসতে লাগলেন।

দু'দিন পর আবার শেফালি এসে হাজির কাজে। টুসির ছুটি। কিন্তু সুতপা লক্ষ করলেন শেফালী ভীষণ কাশছে আর মাঝেমাঝেই কলপাড়ে গিয়ে থুতু ফেলে মুখ ধুয়ে আসছে। ব্যাপারটা কেমন যেন চোখে লাগল। মন্দিরাকে বললেন, "শেফালি কোনো ডাক্তার দেখিয়েছে? ওর কাছে শুনিস তো। ওর কাশিটা ঠিক ভালো লাগছে না। আবার বলছিস মাঝেমাঝেই জ্বর হয়..."

শেফালির কাছে শুনে মন্দিরা জানাল, "না রে, শুনলাম শেফালির কাছে। ও কোনো ডাক্তার দেখায়নি। যখন জ্বর হয় তখন পাড়ার ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ নিয়ে এসে খায়..."

"তুই ওকে হসপিটালে যেতে বল। ওখানে তো বিনে পয়সায় চিকিৎসা হয়। ডাক্তার দেখিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আসুক। কী হয়েছে ওর সেটা তো জানা দরকার..."

"তা ঠিক, কিন্তু আউটডোরে যাওয়া মানে তো সারাদিন চলে যাবে। এখনও এত কাজ পড়ে আছে! করবে কখন?"

"সে হোক! একদিন একটু কম কাজ করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। ও বেরিয়ে পড়ুক, বাকি যা আছে আমরা দু'বন্ধুতে মিলে করে নেব। তুই এখনই ওকে যেতে বল..."

"এখনই!"

"হ্যাঁ, এখনই..."

এক প্রকার সুতপার জোরাজুরিতে মন্দিরা শেফালিকে পাঠিয়ে দিলেন হাসপাতালে। ডাক্তার দেখিয়ে পরীক্ষা করিয়ে সে ফিরে এল। রিপোর্ট দু'দিন পর দেবে। রিপোর্ট নিয়ে টুসির হাত ধরে এসে যখন দাঁড়াল, তখন দেখা গেল সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত। শুনে মন্দিরা ভয় পেয়ে গেলেন। শেফালিকে বললেন, "এসব রোগ খুব ছোঁয়াচে শেফালি। আমার বাড়িতেও তো বয়স্ক মানুষেরা আছেন। কাজেই তুমি আর কাল থেকে কাজে এস না। এই এক মাসের টাকা আগাম দিয়ে দিচ্ছি। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বাড়িতেই থাক..."

শেফালির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। দুলে উঠল পায়ের তলার মাটি। সে ভালোই বুঝতে পারল, শুধু এবাড়ির বৌদি কেন, কোনোবাড়ির কোনো বৌদিই আর তাকে কাজে রাখবে না। তবুও সে মরিয়া হয়ে বলল, "কাজ না করলে আমি খাব কী? আর মেয়েটার মুখেই বা কী তুলে দেব। ডাক্তার বাবু বলেছেন, 'ঠিকমতো ওষুধ খেলে সুস্থ হতে কম করে ছ'মাস লাগবে'। এ ক'টা টাকায় ক'দিন আর চলবে! তুমি তো সবই জান বৌদি..."

"আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি কী করব বল! আমাকেও তো আমার বাড়ির মানুষগুলোর কথা ভাবতে হবে!"

অসহায় শেফালি মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল প্রায় আট বছর ধরে কাজ করা বাড়িটি থেকে। আর বিস্মিত টুসি বুঝতেই পারল না, "হঠাৎ কী হয়ে গেল? কেন জেঠিমা মাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিল?" মায়ের হাত ধরে সেও নীরবে বেরিয়ে এল সেই বাড়িটি থেকে, গত প্রায় তিনমাস ধরে যেখানে সে প্রয়োজনভিত্তিক কাজ চালিয়ে দিচ্ছিল। তারা বেরিয়ে যেতে সুতপাও কিছু জরুরি কাজে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ফিরল প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক পর।

তারপর আত্রেয়ী দিয়ে কত জল বয়ে গেছে। কিছুদিন খোঁজাখুঁজি করে নতুন কাজের লোক পেয়ে গিয়েছিলেন মন্দিরা। সুতপাও ক'দিন পর ফিরে গিয়েছিলেন তার কর্মক্ষেত্রে। গত পঁচিশ বছরে জীবনের অনেক ওঠাপড়া গেছে। কিন্তু শেফালি আর টুসির খোঁজ আর কখনোই করা হয়নি, সেভাবে মনেও ছিল না। সুতপার সঙ্গেও যোগাযোগটা ক্ষীণ হতে হতে প্রায় ছিঁড়ে গেছে। আজ হঠাৎ যেন গত জন্মের ওপার থেকে সিনেমার পর্দার মতো সব ভেসে উঠল চোখের সামনে, "এই কি সেই ফুলটুসি?" জিজ্ঞেস করার জন্য পাশের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল যেখানে ডাক্তার অনামিকা শিকদার বসে ছিলেন, সে টুলটি শূন্য। ততক্ষণে চলে গেছেন তিনি...

নিজের চেম্বারে এসে টুকিটাকি কিছু কাজ সারার পর একটু ফাঁক পেতেই ডাক্তার অনামিকার থুড়ি টুসির মনেও হানা দিতে লাগল একটিই প্রশ্ন, "এই সেই জেঠিমা! কী চেহারা হয়েছে! রুগ্ন, যেন কাঠি। মুখের সে শ্রী-ই বা কোথায়! অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে, এ ক'দিনে বাড়ির কোনো লোক দেখা করতে আসেনি ওনার সঙ্গে। আর দাদাভাই, মানে খোকনদাদা, সে-ও বা কই? আর শান্তির নীড়! সেটাই বা কোথায়? বালুরঘাটের বাড়ির নাম 'শান্তির নীড়' ছিল বলে তো মনে পড়ছে না!" স্মৃতিপটে ভেসে উঠল বহু পুরোনো দৃশ্যাবলি, "প্রায় পঁচিশ বছর আগে যেদিন ইউনিভার্সিটি থেকে খোকনদাদার বাড়ি ফেরার কথা ছিল, সেদিনই আমি প্রথম গিয়েছিলাম ওই বাড়িতে। জেঠিমাকে সেই আমার প্রথম দেখা। তার কিছুদিন পর মণি যেদিন এসেছিলেন, সেদিনও তো আমিই গিয়েছিলাম কাজে। বাড়ি ঢোকা মাত্র মণি আমাকে দেখেই আমার সম্পর্কে জেঠিমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন, সেটাও আমার মনে আছে..."

ওই দিনটি ছিল টুসির জীবনে একটি বিশেষ দিন। সেদিন সে কাজে না গেলে আর তার মণির নজর তার উপর না পড়লে জীবনটা হয়তো অন্যরকম হত। আজকের ডাক্তার অনামিকা শিকদার হওয়া হয়ে উঠত কিনা কোনোদিন, কে জানে! কারণ ওইদিন ঘণ্টাখানেক পর টুসি যখন সুতপার ঘর মুছতে এল, সুতপা তখন রান্নাঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মন্দিরার

সাথে গল্প করছিলেন। হঠাৎ করেই কিছু একটা জরুরি বিষয় মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি চলে এলেন ঘরে। ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করতে করতে টুসিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম ফুলটুসি?"

"না না, টুসি। জেঠিমা আমাকে ফুলটুসি বলে ডাকে...", টুসির ত্বরিত জবাব।

"ভারী সুন্দর নাম তো! কোন ক্লাসে পড়?"

"ক্লাস থ্রি..."

"বাহ, তোমার স্কুলে যেতে ভালো লাগে?"

"হ্যাঁ, কত বন্ধু আছে। তাদের সঙ্গে কত খেলা হয়!"

"আর পড়া? পড়তে ভালো লাগে না?"

"না, পড়তে বসলে আমার শুধু ঘুম পায়..."

হা হা করে হেসে ফেলে সুতপা বললেন, "তুমি তো দেখি কাজ করছ। তাহলে তুমি স্কুলে যাও কখন?"

"যেদিন মা কাজে আসে, সেদিন করে যাই। এখন তো মা অসুস্থ, মাঝেমাঝে জ্বর হয় আর কাশি। বিছানা থেকে তখন উঠতে পারে না। ওই দিনগুলো আমি কাজ করি। নয়তো জেঠিমার অসুবিধা হবে যে, 'জেঠিমা তখন অন্য কাজের লোক নিয়ে নেবে', মা বলেছে। মায়ের কাজ চলে গেলে আমরা খাব কীভাবে? তাই..."

"তোমার বাবা কিছু করেন না?"

"বাবা আমাদের ছেড়ে অন্যের সঙ্গে চলে গেছে। আমি কখনও তাকে দেখিনি...", মুখ নামিয়ে ধীরে ধীরে জবাব দিল টুসি।

সুতপা আর কিছু বললেন না। টুসি তার কাজ শেষ করে চলে গেল। পরবর্তী যে দু'দিন টুসি কাজে এসেছিল নানা ছুতোনাতায় সুতপা ডেকে কথা বলতেন তার সঙ্গে। জিজ্ঞেস করতেন নানা কথা। তার জীবনের গল্প যেন ভারাক্রান্ত করত সুতপার মন। যেদিন মন্দিরা কাজ থেকে শেফালিকে ছাড়িয়ে দিলেন, সেদিন ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর পেছন পেছন সুতপা এসে শেফালিকে বলেছিলেন, "টুসিকে দেবে আমায়? ওর দায়িত্ব আমি নিতে চাই...", হতবাক শেফালিকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই আরও বলেছিলেন, "না না আমি তোমার মেয়েকে তোমার থেকে কেড়ে নিতে চাইছি না। তুমিও আমার সঙ্গে চল। আগে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। তারপর টুসিকে একটা ভালো স্কুলে ভরতি করব। তুমি সুস্থ হয়ে গেলে আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকব..."

সব হারানো শেফালি খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো জড়িয়ে ধরেছিল সুতপার হাত। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বলেছিল, "আমি আপনার এ-ঋণ কখনও ভুলব না দিদি..."

"ঋণ কিসের? বরং এই সুযোগ দিয়ে তুমিই আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে ফেললে। টুসিকে দেখা ইস্তক আমি যে কী মায়ায় জড়িয়ে পড়েছি, আমি নিজেই জানি না..."

তারপরের দিনগুলো যেন স্বপ্নের মতো কেটেছে। কাউকে না জানিয়েই সুতপা ওদের নিয়ে এসেছিলেন নিজের কাছে। যতদিন শেফালি অসুস্থ ছিল, তার আলাদা ব্যবস্থা করে টুসিকে তিনি রেখেছিলেন নিজের কাছে। ভালো স্কুলে তাকে ভরতি করে দিয়েছিলেন। যে টুসির বই দেখলেই ঘুম পেত, মণির সংস্পর্শে থেকে সেই বইয়ের মধ্যেই সাগরের অতলে থাকা মণি মুক্তোর সন্ধান পেয়েছিল সে। সুতপাই তার নামকরণ করেছিলেন 'অনামিকা'। পদবীটি অবশ্য তার পিতৃদত্তই রয়ে গিয়েছে। আস্তে আস্তে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পাশ করে ডাক্তারি পড়তে সে আসে কোলকাতা মেডিকেল কলেজে। এম.বি.বি.এস. পাশ করেই থেমে যায়নি তার পড়াশোনা। আজ সে স্বনামধন্য হার্ট স্পেশালিস্ট। কাজের সূত্রেই তার কোলকাতা থাকা। একটি কথাই তার বারবার মনে হচ্ছিল, "জেঠিমা এখানে কীভাবে এলেন? সুদূর বালুরঘাট থেকে কোলকাতা! তাও যদি হয়, তবে তিনি এখানে একা কেন? এই সরকারি হাসপাতালে!" নার্স মেয়েটির ডাকে তার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন আছে, দ্রুত উঠে তিনি বেরিয়ে গেলেন চেম্বার ছেড়ে।

পরবর্তী দু'দিনে মন্দিরা অনেকটাই সুস্থ হয়েছেন। নিয়মিত ওষুধপত্র খেলে বাড়িতে থেকেই বাকিটা সেরে উঠতে পারবেন। তাই হাসপাতাল থেকে তাকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাতের ডিউটি সেরে অনামিকা তার খোঁজ নিতে এলেন। কাছে যেতেই মন্দিরা চেপে ধরলেন তার হাত। অবিরল ধারায় জল পড়তে থাকে তার দু'চোখ বেয়ে। বহু কষ্টে কান্নার উদ্বেল বেগ সামলে বলেন, "তুমি টুসি! মানে আমার ফুলটুসি!"

"হ্যাঁ জেঠিমা। আমিই তোমার ফুলটুসি..."

"কতদিন পর তোকে দেখলাম। তুই কোথায় আছিস এখন? আর তো কখনও কোনো খোঁজ পাইনি। শেফালি কেমন আছে?"

"মা ভালো আছে। আমার পোস্টিং এখানে, তাই মা-ও আমার সঙ্গে সঙ্গে। আমরা তিনজন একসঙ্গেই থাকি..."

"তিনজন!"

"হ্যাঁ... আমি, মা আর মণি..."

"মণি!"

"সুতপা মাসিকে আমি মণি ডাকি। তিনিই শিখিয়েছিলেন..."

এক মুহূর্তেই যেন অনেক রহস্যের জট খুলে গেল মন্দিরার সামনে। অনেক অজানা প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলেন। তার বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে এবার টুসি জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এখানে কী করে জেঠিমা? তোমার সঙ্গে কেউ নেই কেন? আর দাদাভাই! সে কোথায়?"

দু'ফোঁটা অশ্রুবিন্দু আবার গড়িয়ে পড়ল মন্দিরার চোখ থেকে। একটু থেমে থেমে বললেন, "সে অনেক বড়ো চাকরি করে। খুব ব্যস্ত। বালুরঘাটে আসার সময় তার হয় না। তাই তোর জেঠুর মৃত্যুর পর এখানকার জমি-বাড়ি বিক্রি করে পাকাপাকি ভাবে চলে গেছে আমেরিকা। অবশ্য যাওয়ার আগে সব খরচপত্র দিয়ে আমাকে রেখে গেছে 'শান্তির নীড়ে'। ওটাই এখন আমার একমাত্র ঠিকানা..."

"শান্তির নীড়! মানে! এটা কি বৃদ্ধাশ্রম?" এক আকাশ বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞাসা করেc টুসি।

"হ্যাঁ..."

কিছুক্ষণ কোনো কথা সড়ল না তার মুখ থেকে। তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে বলল, "তাও যদি হয়, তবে সেখানকার লোকজনই-বা কোথায়?"

"তারা জানে না। ওখানে আর ভালো লাগছিল না আমার। তাই একদিন কাউকে কিছু না-বলে সবার অগোচরে বেরিয়ে পড়েছিলাম ওখান থেকে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিলাম অনেকটা দূরে। ক'দিন ঘুরে বেরিয়েছি পথে পথে। সঙ্গে তো টাকাপয়সা ছিল না। কেউ কিছু দিলে খেয়েছি, নয়তো কলের জলেই পেট ভরিয়েছি। সন্ধে হলে পথের ধারের ফুটপাতে অন্যদের মতো শুয়ে পড়েছি। এভাবেই চলছিল। কিন্তু সেদিন বিকেলের দিকে শরীরটা খারাপ লাগতে শুরু করল। সকাল থেকে কিছু খাবার জোটেনি। তাই শরীরটা আর দিচ্ছিল না। চলতে না পেরে রাস্তার পাশের ধুলোতেই বসে পড়েছিলাম। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। তারপর আর কিছু মনে নেই। চোখ যখন মেললাম তখন তো আমি এখানে..."

নিষ্পলক কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে টুসির চোখ থেকেও নেমে এল কয়েক ফোঁটা জল, "কী ছিলেন জেঠিমা আর কী অবস্থা হয়েছে আজ মানুষটার!" একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, "ও... বুঝেছি। কিন্তু তুমি এখন কোথায় যাবে? কিছু ঠিক করেছ? হাসপাতাল থেকে তো তোমাকে কাল ছেড়ে দেওয়া হবে..."

"আমার তো আর কোনো ঠিকানা নেই। 'শান্তির নীড়'-এই ফিরে যেতে হবে...", একটি দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেন মন্দিরা।

দু'মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল টুসি, "তুমি যাবে আমার সঙ্গে? আমাদের বাড়ি?"

"তোদের বাড়ি?" একটু ইতস্তত করে বললেন মন্দিরা, "কিন্তু..."

"কোনো কিন্তু না। তুমি গেলে মা-মণি দু'জনেই খুব খুশি হবেন। আমি বলেছি তাদের তোমার কথা। তারা আসার জন্য খুব বায়না করছিলেন। মণি তো ছটফট করছেন তোমাকে দেখার জন্য। কিন্তু তিনি নিজেই আর্থ্রাইটিসের পেশেন্ট, হাঁটাচলা করতে খুব কষ্ট হয়। একা একা চলাফেরা করতে পারেন না। মণিকে একা ফেলে মা-ও কোথাও যেতে পারেন না। তাই আমিই না করেছি। বলেছি, একদম তোমাকে সঙ্গে করে তাদের সামনে হাজির করব। তারা অপেক্ষা করছেন তোমার জন্য..."

নিজের অজান্তেই দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল মন্দিরার চোখ থেকে। বললেন, "তোদের দুঃসময়ে আমি থাকতে পারি নি তোদের পাশে। আর তুই..."

"ছাড় তো ওসব কথা। যা হয়েছে তা ভালোর জন্যই হয়েছে। মনে আছে তোমার! আজও কিন্তু দুর্গা সপ্তমী! মা এসেছেন ঘরে ঘরে। আমিও আমার মাকে ফিরে পেয়েছি বহু বছর পর। জেঠিমা তুমি আমার! আমার আর এক মা...", উজ্জ্বল চোখে অনাবিল হাসি ছড়িয়ে টুসি বলল, "এতদিন আমার দুই মা ছিলেন! আমার দু'চোখের মণি! আজ থেকে আমি ত্রিনয়না হলাম..."

সুস্মিতা ঘোষের জন্ম উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জেলা অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুরে। বালুরঘাট কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পূর্ণ করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ। বর্তমানে নিজের শহর বালুরঘাটেই শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত।

বিভ্রান্তি

দেবাশিস দাস

অঙ্ক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর থেকেই অন্বয়ের পুরো মানসিক প্রস্তুতিটা বেশ জট পাকিয়ে গেল। ওর জীবনটা পুরো পরিকল্পনা মাফিক চলে। বিশেষতঃ পড়াশুনোর ক্ষেত্রে। অন্তত এই ক্লাস নাইন অব্দি চলেছে। কোন বিষয়ে কতটা সময় ব্যয় করা হবে, কোন কোন শিক্ষকের কাছে কি কি সাহায্য নেওয়া হবে, বিশেষ করে গৃহ শিক্ষকেরা কতটা বোঝাবেন, কতটা বেসিক ক্লিয়ার করা হবে, কতটা অ্যাডভান্স পড়া হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। বাড়ির লোকজন, বিশেষ করে বাবা, মা সব সময় মনোযোগ দেন অন্বয়ের পড়াশুনোর দিকে। কাজেই কোন দিক দিয়েই তার কোন অসুবিধা হয় না। পুরো স্কুল জানে যে সে টেনের বোর্ডের পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করবে।

অন্বয়ও সেটাই মনে করে এগোচ্ছে। অঙ্ক তার প্রিয় বিষয়। আগামী জীবনেও অঙ্ক নিয়েই তার পড়াশুনো করার ইচ্ছে আছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ক্লাসে অন্বয় সবসময় ফার্স্ট হয়। আর সেকেন্ড বয় তার থেকে অনেকটা পিছিয়ে থাকে। শিক্ষকরাও এইসব কারণে তাকে খুব ভালবাসেন।

মনের মধ্যে একটা খচ খচ চিন্তা নিয়ে একের পর এক অঙ্ক কষা শুরু করল অন্বয়। সে দেখে নিয়েছে সমস্ত অঙ্ক তার জানা শুধু একটা ছাড়া। সেটা বীজগণিতের সেকশনে আছে। মুশকিল হল সেই অঙ্কটা কম্পালসারি। ওটা ছেড়ে অন্য অঙ্ক করার কোন সুযোগ নেই। তাই না পারলে এই পাঁচ নম্বরের অংকটা তাকে ছেড়েই দিতে হবে। সময়ের সাথে দুশ্চিন্তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে তার।

প্রথম এক ঘন্টা পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই পেছনের বেঞ্চে বসা প্রমথ লুস বা অতিরিক্ত পাতা চাইল। তার মানে বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে প্রমথ। অন্বয় জানে তাকে ক্লাসে কিছুটা হলেও টক্কর দিতে পারে একমাত্র এই প্রমথ। সেও অঙ্কে খুব ভালো। প্রায় অন্বয়ের কাছাকাছি নম্বর পায় অঙ্কে। কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ, হিস্ট্রি ইত্যাদি সাবজেক্টে সে বিশেষ মনোযোগী নয়। এই কারণে ক্লাসে সে কোন র‍্যাঙ্ক করতে পারে না। যদিও ভালো ছেলে হিসেবে তারও নাম আছে। এতদিন প্রমথকে নিয়ে অন্বয়ের কোন চিন্তা ছিল না। কিন্তু এবারের অঙ্ক পরীক্ষার একটু বেশি মূল্য আছে। নাইনের এই অ্যানুয়াল পরীক্ষায় অঙ্কে সবচেয়ে বেশি নম্বর যে পাবে, তাকে স্কুলের পরিচালন সমিতির তরফ থেকে একটা রুপোর মেডেল দেওয়া হবে। স্কুলে এটা একটা বিশেষ সন্মান।

বারে বারেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল অন্বয়। তবে কি মেডেলটা তার ভাগ্যে নেই? তবে কি প্রমথই মেডেলটা পাবে? অবশ্য প্রমথ যে সব অঙ্ক সঠিকভাবে করবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে এই অনিশ্চয়তাটাই সে ভীষণ ঘৃণা করে। তার জীবনের সবকিছুই সুনিশ্চিত। কিন্তু ৯ নম্বর প্রশ্নের বি পার্টের অঙ্কটাতে একটা ট্রিক বা কৌশল আছে আর সেটা সে ধরতে পারছে না। ছেড়েই দিতে হবে বোধহয়। অন্য অঙ্কগুলো করতে করতে বেশ কয়েকবার জানলার বাইরে কাঁঠাল গাছের নিচের কাঠবিড়ালিদের খেলা দেখল সে। পরীক্ষার হলে এদিক-ওদিক সে কোনদিন তাকায় না। আজকে কেন জানিনা কাঠবিড়ালিদের খেলা তাকে টানতে লাগলো। দুটো কাঠবিড়ালি একসাথে গাছে উঠছে, একসাথে নামছে, একসাথে এদিক-ওদিক যাচ্ছে। পুরো ব্যাপারটা একটা নিয়মের মধ্যে বা নকসা মাফিক ঘটছে। তাদের গতিবিধি যেন একটা নিশ্চয়তার মধ্যে বাধা। সময় এগিয়ে চলেছে, জোর করে পরীক্ষার খাতায় মন দিল সে।

আজ পরীক্ষার হলে গার্ড দিতে এসেছেন কমল স্যার। তিনি বেশ কড়া ধাতের মানুষ। ছাত্ররা আড়ালে তার সম্বন্ধে বলে ‘কমল’ মোটেই ‘কোমল’ নয়। এইভাবে নামের অক্ষর গুলো এদিক ওদিক করে মানে বদলানোর খেলা তাদের ক্লাসে বেশ প্রচলিত। যেমন তাকে ‘অন্বয়ের’ বদলে মাঝে মাঝে ছাত্ররা ‘অন্যায়’ বলে রাগায়। আর ‘প্রমথ’কে বলে, যে কোনো সময় সে অক্ষরের স্থান বদলে ‘প্রথম’ হয়ে যেতে পারে। অন্বয় যেন সাবধান থাকে। তবে কি আজ অঙ্ক পরীক্ষায় সেরকমই কিছু ঘটবে? দু-তিনবার কমল স্যার তার পাশ দিয়ে ঘুরে গেলেন। তিনি কি বুঝতে পেরেছেন যে আজ অন্বয় কিছুটা অন্যমনস্ক?

তাদের স্কুলে পরীক্ষার হলে বসার একটা নিয়ম আছে। দুটো ক্লাস পাশাপাশি বসে। যেমন একই বেঞ্চে একজন ক্লাস নাইনের সাথে একজন ক্লাস টেনের ছাত্র বসে পরীক্ষা দেবে। আজ এই নিয়ম মেনে তার সাথে একই বেঞ্চে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে ক্লাস টেনের সৌভিক। সেও তার ক্লাসের ফার্স্ট বয়। অঙ্কে সে গতবার মেডেল পেয়েছে। অন্বয় যদিও কখনো কথা বলেনি তার সাথে। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে পটাপট অঙ্ক কষে চলেছে সৌভিক।

পরীক্ষার দ্বিতীয় ঘন্টা পড়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। অন্বয়ের আর দুটো অঙ্ক করে ফেললে এই নয়ের বি পার্টের অজানা অঙ্কটা বাকি থাকবে। সবশেষে চেষ্টা করতে হবে অঙ্কটা। প্রায় আধঘন্টা সময় বাকি আছে সময়ের ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।

জানা অঙ্কদুটো কষে শেষ অঙ্কটা চেষ্টা করতে লাগলো সে। ওপাশে প্রমথ তখন বোধহয় প্রশ্নের সাথে উত্তরপত্রের সবকটা অঙ্ক মিলিয়ে নিচ্ছে খাতা জমা দেবার আগে। একটু যেন চাপ অনুভব করল অন্বয়।

বাকিরাও রিভাইস করছে যার যার খাতা। কিন্তু কিছুতেই সে ধরতে পারছে না এই অঙ্কটা। প্রশ্নপত্রের অঙ্কের প্রশ্নের পাশে লিখে লিখে চেষ্টা করতে লাগল সে। যদি কৌশলটা ধরা যায়।

এমন সময় হঠাৎ পাশের ক্লাস টেনের সৌভিক ফিসফিস করে তাকে বলল 'কি অন্বয়, এই অংকটা তোমার অসুবিধা হচ্ছে? এটা তো খুব সোজা। এখানে ওয়ান এর বদলে এক্স বাই এক্স নাও তাহলেই হয়ে যাবে'। বলে ব্যাপারটা লিখে দিল তার প্রশ্নপত্রের মধ্যে।

তার মাথায় আলো জ্বলে উঠল। আরে এটা বোধহয় আজকের সবচেয়ে সোজা অঙ্ক। অবশ্য এই কৌশলটা না জানলে অঙ্কটা করা যায় না।

একটা চিন্তা মাথায় এল তার, এই অঙ্কটা কি উত্তরপত্রে করা উচিত হবে? এক মিনিট লাগবে অঙ্কটা করতে। অঙ্কটা করলে তার মেডেল নিশ্চিত। কিন্তু করাটা হয়তো অন্যায় হবে। কেননা অঙ্কটা অন্য কেউ তাকে দেখিয়ে দিয়েছে। মেডেল পেয়ে নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য এই অন্যায়টা কি তার করা উচিত? এমন সময় সৌভিক আবার ফিসফিস করে বলল, 'চটপট অঙ্কটা করে খাতা জমা দিয়ে দাও। আর সময় নেই'। নিজের খাতা জমা দিয়ে হলের বাইরে চলে গেল সে।

অন্বয় নিজে বড় দোলাচলের মধ্যে দুলতে লাগল। কি হবে? কেউ তো জানবে না। আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি, সবাই যে যার উত্তরপত্র জমা দিচ্ছে। পেনটা খুলবে কিনা ভাবতে লাগল সে। এমন সময় হঠাৎ উদয় হলেন কমল স্যার 'এবার খাতা জমা দিয়ে দাও অন্বয়'। তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন স্যার।

'একি প্রশ্নপত্রে কি লিখেছ এগুলো'? কমল স্যার কি তাদের ফিসফিস করে কথা বলতে দেখেছেন দূর থেকে?

'আরে এই হাতের লেখাটা তো তোমার নয়। এটা অন্য কারও লেখা? অংকটা কেউ তোমায় দেখিয়ে দিয়েছে তাহলে'?

বেশ অপ্রস্তুত হয়ে অন্বয় বলল 'স্যার এই অঙ্কটা তো আমি করিনি। শুধু শিখে নিয়েছি'।

'কিন্তু পরীক্ষার হলে তো এসব করা যায় না অন্বয়। এতে কত মার্কস ছিল দেখি? ফাইভ মার্কস। তুমি অঙ্কটা করেছো কিনা আমি জানিনা। তবে অঙ্ক না করলেও ব্যাপারটা পরীক্ষার হলের নিয়মবিরুদ্ধ। আমি তাই তোমার ফাইভ মার্কস মাইনাস করে দিচ্ছি। এটা আমাকে করতেই হবে। বিশেষ করে তোমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে'।

অন্বয় কিছু বলার আগেই 'কমল স্যার' তার খাতার ওপরে লিখে দিলেন। 'মাইনাস ফাইভ মার্কস'। এর মানে, সে যা নম্বর পাবে তার থেকে পাঁচ নম্বর বাদ যাবে।

অন্ধকারে ডুবে গেল সে। মাথা কাজ করছে না। একবার ভাবল- ঠিকই করেছেন স্যার, পরীক্ষার হলে কথা বলা উচিত নয়। বা অন্য কেউ কাউকে কিছু বলে দেওয়া উচিত নয়। এই জন্যেই তার নম্বর মাইনাস হয়েছে। আবার এও ভাবল- সে তো অঙ্কটা করেনি, বরং শিখেছে। পরীক্ষার হলে কি শেখা যায় না? আর সে তো সৌভিককে বলেনি তাকে লিখে দেবার জন্য। তবে কেন নম্বর কাটা হলো তার? সবাই যে বলে- শেখার কোন স্থান, কাল, পাত্র নেই! যেখানে খুশি, যখন খুশি, যার কাছ থেকে খুশি শেখা যায়- সেটা সবক্ষেত্রে ঠিক নয় তাহলে?

এই প্রথম বড় বিভ্রান্ত বোধ করল অন্বয়। বাইরে কাঁঠাল তলায় দেখতে পেল এখন অনেকগুলো কাঠবিড়ালি এদিক ওদিক দৌড়ে বেড়াচ্ছে। অনেকটা তার মনের চিন্তাগুলোর মতো। সে বুঝল, বিভান্তির মধ্যেও সঠিক পথটা নিজেকেই বেছে নিতে হবে। খাতা জমা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

দেবাশিস দাস বর্তমানে কলকাতার বাসিন্দা। কর্মসূত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় 'তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের' কাজে রত ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি বাংলার বাইরে বঙ্গসংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। তার নেশা অবশ্যই সাহিত্যচর্চা, বিশেষত: একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে। বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে লেখালেখি করেছেন। বিগত কয়েকবছর ধরে নানান পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখার চেষ্টা করছেন।

Anjali Art by Nilesh Nandi Photography

শিরোনাম:- জলপান

নীলেশ নন্দী; জন্ম মধ্যমগ্রাম। প্রাণিবিদ্যায় স্নাতক। সেইসঙ্গে প্রবল সাহিত্যানুরাগী। পড়তে এবং লিখতে খুব ভালোবাসি। "চিরকালের ছেলেবেলা", "আনন্দকানন", "উৎসব", "আগন্তুক" সহ বেশ কয়েকটি মুদ্রিত পত্রিকার পুজো এবং সাধারণ সংখ্যায় আমার লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

Anjali ART by Allbhya Ghosh

Allbhya Ghosh
Cloth Craft. With photography.

অলভ্য ঘোষ কলকাতার টালিগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন; ছোট থেকেই একরোখা অলভ্য প্রথাগত শিক্ষা সমাজ ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থাশীল-প্রতিবাদী । শিল্প কলা তার উপজীব্য হলেও ব্যতিক্রমী এই মানুষটি নিজেকে একজন সৈনিক বলে মনে করেন যার অস্ত্র কালি মাটি কলম । দেশে বিদেশের পত্র পত্রিকায় তার কাব্য ,ছোটগল্প ,প্রবন্ধ সসম্মানে প্রকাশিত হবার পর তিনি স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাণে আত্মমগ্ন ।

উদজ by স্নেহাশিস মুখোপাধ্যায়

This particul painting art (Udajo- **উদজ)** is a picture of living society that seems to look like fish, snake, diver, survivor, protector, and some figures that would be motivated as watcher of death and danger. It is a sea-space life that can tolerate other living life, but with tension and wish of free-living time and energy. Moreover, this painting is looking for the search of humanity.

Anjali Art by Maitreyee Mukherjee

I am Maitreyee Mukherjee, from Paschim Medinipur. Painting is my passion, and I have been doing this for many years. My specialties are pencil sketches and watercolor.

Anjali Art by Sanghamitra Bhattacharya

We Want Justice

Sanghamitra Bhattacharya, has a master's in computer application. She is a Kolkata-based photographer. Her photographs have been published in 1X.com, Photomagnetic, Shades of Color, Edge of Humanity Magazine, Dodho, 121clicks.com, and Photojournale. She had been awarded on many international platforms, including ND Awards 2019 and Eyewin Award 2019. Her interview was published in Shades of Color magazine in France in 2019. She won 2nd place in the 4th annual international photography contest, 35 Awards in 2018. She is one of the grantees of Sahapedia Frames Photography Grant 2020. She is currently a founder member of a Bengali musical band, KaanKaata Nekii (**কানকাটা নেকি**). Her work includes painting, visual-graphic designing, music, and script writing.

Anjali Art by Rupanjana Rakhshit

আমি রূপঞ্জনা রক্ষিত , একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট । আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পাশাপাশি ছবি আঁকতে আর গল্পের বই পড়তে ভীষন ভালোবাসি ।

Shiva Linga represents the ascending energy of consciousness and life in nature.

An ardent lover of art and culture, Anasua Datta has a passion of artistically visualize her surroundings. This is her first attempt with paint brush and computer filters. By profession, she is a Database Engineer with Cornell University's IT sector.

'চান্স ইন আ মিলিয়ন '

আর্যা ভট্টাচার্য

দর্শনের অধ্যয়ন অধ্যাপনা ছাড়া, সাহিত্য, ভ্রমণ ও ভাষা শেখার আগ্রহ রয়েছে আর্য্যা ভট্টাচার্যের। তার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ' পরবাস' । তার লেখা কবিতা ও ছোটোগল্প বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

নির্জন বিদেশী রাস্তায় অকস্মাৎ এসেছিল

একটি মানুষ । কোটি কোটি বয়ে যাওয়া ক্ষণের ভিতর ক্ষণজন্মা এক ক্ষণ ছুঁয়ে।

চেয়েছিল কিছু;

শীত কাটানোর আর্জি ছিল কি অস্ফূট ঠোঁট ছেয়ে ? !
দুজনের মাঝে ছিল ভাষার কঠিন কাঁটাতার। ভাষাহীন দুই চোখে আগুনের তাপ!

হালকা বরফ ছিল। বৃষ্টির ফোঁটা দুই চার।
তারই পিঠের ঢালে নিজেকে আড়াল করে
কয়েক কদম , হেঁটে যাওয়া দুজনার।

স্পর্শ হালকা, পথ ছিল সংক্ষিপ্ত ,অস্থির।

অস্পৃষ্ট চুম্বন এক, জমাট বরফ টুকরো হয়ে
নিশ্চল স্থবির দুজোড়া ঠোঁটের মাঝে ঝুলেছিল , রশি
আঁকড়ে ঝুলে থাকা নিরূপায় মৃতের মতন।

ভালোবাসাময় ভ্রূণ , সামাজিক খেলায় অচ্ছুৎ ।
লোকে জানে।
সে এক মুহূর্ত ছিল! তুড়ি মেরে ক্ষণিককে , ক্যানভাসে স্থির।

নির্জন একাকী পথ তারপর।
মূর্ছিত বরফ তারপর রাতভর ।।

সত্যবতী

সুবীর বোস

অনেক ভিড়েও তুমি একা হতে চাও
চেনা মুখ দূরে সরে যায়, পড়ে থাকে রাজার অসুখ
কী অলৌকিক সম্ভ্রম তোমার, তবু
মাতৃস্নেহের আঁতুড়ে যেন পড়ে আছে অপরাধ বোধ!

সত্যবতী, তুমি যে আড়াল ভালোবাসো
সে কথা কি বলেছ কখনও!
নাকি অভিমান, ক্ষয়, শুধু ক্ষয় নিয়ে বেঁচে আছ?
দেখছ কখনও - জলবেঁধে হাঁসেরা চলেছে পিঠে
তাহাদের সন্তানসন্ততি?

এ ঘরে তোমাকে চাই, তোমাকেই চাই সত্যবতী
বাইরে আকাশ যেন একা -
সত্যবতী, তুমি জানো - ঘোলাটে ঈগল চোখে
এ গ্রহে সমন এলে
মহাকাব্যেও ঘরে ফেরা অনিবার্য হয়।

সুবীর বোস
কবিতা যে সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে – দেশ, কৃত্তিবাস, কৌরব, পরবাস, কবি সম্মেলন ইত্যাদি;গল্প যে সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে – দেশ, আনন্দবাজার রবিবাসরীয়, আনন্দমেলা, সানন্দা, উনিশ-কুড়ি, শুকতারা , পরবাস ইত্যাদি; ভ্রমণ কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে পরবাস এবং অবসর ওয়েব ম্যাগাজিনে।
প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ দু'টো – আঙুলের সংলাপ ও আমার মহড়াগুলো।
প্রকাশিত গল্পের বই – ভাঙা কলমের আন্তরিকে।

ফিকে ভালোবাসা

জয়া মজুমদার

সাদাকালো যাপনে তুমি আমি খুব পাশাপাশি
মরসুমী ভালোবাসার খরস্রোতায় দু'জনায় কাছাকাছি

সময়ের স্রোতে ভাসিয়েছি কত রঙিন কথকতা,
কখনো গাছের ছায়ায় জন্মেছে কত সুখের চারা ,

রাগে অনুরাগে দৃষ্টিসুখে তুমি আমি আত্মহারা
আজ যখন সন্ধ্যাকালীন ছায়ায় হিসাবে বসি

মহার্ঘভাতা শূণ্য ভালোবাসা রহস্যময় অন্ধকার দেখি
আড়ালে নিংড়ানো স্মৃতির গায়ে কান্নার আভাস

মেঘের ভিড়ে বদলে যায় চেনা ছবির ক্যানভাস।
অলিন্দে অলিন্দে ঘুরপাক খায় ক্ষতবিক্ষত অভিমান।

নিরবতায় বেদনার রঙ গাঢ় হলে সুখের অপমান
মনের গোপন খামে ফিকে ভালোবাসার বর্তমান

জয়া মজুমদার, বর্তমানে নিজস্ব ঘরোনায় কবিতা, গল্প ,অনুগল্প ,শ্রুতি নাটক এবং গান ও লিখে চলেছি আপনখেয়ালে । নিজস্ব সৃজনশীল সৃষ্টির ভেতর অনাবিল আনন্দ খুঁজে পাই। কলম কালির বন্ধুত্বকে আজীবন প্রশয় দিয়ে এদের সঙ্গকে সঙ্গী করে বাকিপথটুকু চলতে চাই।

অভিমান

কবিরুল (রঞ্জিত মল্লিক)

বাইরের বাতাসটা বড্ড গরম আজ!
ঠিক তোমার অভিমান যেমন, জানি না
কতদিন তোমার সেই গোমড়া মুখ দেখিনি।
আকাশেও আজ কালো মেঘের বোরখা -
চাঁদ লুকিয়েছে মেঘের আড়ালে, বৃষ্টি নামবে,
একা আমি অসহায়! ভিজব তোমার অভিমানী অশ্রুতে।

আমি কবিরুল। এই ছদ্মনামে আমি শব্দ চাষী। প্রকৃত নাম রঞ্জিত মল্লিক। খুব ছোট থেকে লেখালিখি করছি। বারো ক্লাসের পর থেকে লেখার প্রতি একটা মোহ জন্মায়। একটা সময়ে ইংলিশ স্টেটসম্যানে লিখতাম। বর্তমানে বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে আমি লিখছি।

প্রেমের পাঁচালী

কাজল মৈত্র

প্রেম মানে ভালোবাসা
প্রেম হলো পদ্য
প্রেম মানে বচসা
বেঁচে থাকার গদ্য

প্রেম মানে বিশ্বাস
আনকোরা শব্দ
প্রেম হলো নিঃশ্বাস
জীবন্ত উপপাদ্য

প্রেম মানে তুমি আমি
প্রেমে হলাম অন্ধ
প্রেম নিয়ে আঁতলামি
কবিদের ছন্দ ।

কাজল মৈত্র :স্কুল কলেজের দেয়াল পত্রিকায় লেখালেখি শুরু । তারপর কালের নিয়মে অনেক পত্র পত্রিকার লেখালেখি করছি । আমাদের মত দুঃখী লোকদের কবিতা আনন্দের বাতাস , আমিও সেই আনন্দে ভাগীদার হওয়ার চেষ্টা করি ।

মহাকাব্য স্মৃতি

চয়ন দত্ত

ভালোবাসা বলতে শ্রাবণ বুঝি
চারদিক জল থৈ থৈ
ঘন মেঘ,
ভালোবাসা বলতে লাক্ষাগৃহ
এখনও পুড়ে চলেছি, দেখো !

বাইরে বৃষ্টি হয় খুব
বাইরে ঝড় , জল , নীল
তোমার বুকের ভেতর ,
আমার শহর বেঁচে থাকে

চয়ন দত্ত: ইতিহাসের ছাত্র । বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত । প্রথম কবিতার বই - 'কুয়াশার মতো ঘুম '(২০২৩) ভালোলাগা - ইতিহাস, কবিতা ও বর্ষা ।

সীমানা

শম্পা ঘোষ

বিষাদে চন্দ্রবিন্দু মিশে যায় একসাথে
কৌণিক দূরত্ব বরাবর সচেতন হৃদয়
বেহুশ আবেগের পাগলামিতে
শুধুই তোমাকে খুঁজে চলা ,
কবিতা হলেই কি তার প্রেমের ধারাভাষ্য হওয়া চাই?
চাইনা বলতে বলতে ও বিকোচ্ছে মন
সম্মানের সীমানায় যেন অবাধ অনুপ্রবেশ
হঠাৎ আকাশ জুড়ে বৃষ্টি মাটি কি চেয়েছিল
ভিজতে এ কথা কে জানে!
প্রশ্নের ইঙ্গিতে বিধ্বস্ত বাতাস কেন্দ্রীভূত হওয়ার চেষ্টায়
ক্যাকটাস বিছিয়ে থাকে।
তবুও কয়েকটা কৌতূহলে অসমাপ্তির
বীজ বহন করে চলে,
মৃত কফিনে ইতিহাস ভরা
অথচ ভৌগলিক সীমানায় বদ্ধ থাকতে থাকতে হঠাৎই কেমন
দুঃখ বিলাসী হয়ে ওঠে
সঙ্গবদ্ধ বেপরোয়া মন।

শম্পা ঘোষ,পেশায় একজন মনস্তত্ত্ববিদ কাউন্সেলর, শিক্ষাগত যোগ্যতা ডক্টরেট ডিগ্রী প্রাপ্ত। লেখালেখি করা জীবনের বেঁচে থাকার রসদ,
তিনটি একক কাব্যগ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত যথাক্রমে ব্ল্যাক হোল, কিউবিক টার্ন এবং শূন্য প্রশ্রয়

রূপের বাহার

নীলাঞ্জনা হাজরা

সারা সময় জুড়ে অন্ধকার
সারা সময় হাহাকার
একটা সুর তুলছে ধ্বনি
অসহায় খাঁচার বোধ।
একটু দূরে, একটু কাছে,
এই যে ছিলে,এই যে পিছে,
গল্প গাথায় সবটা কাল
আসবে তাই নতুন সকাল।
ঝরছে দিন, পেরিয়ে যাও
সত্য রূপের সাক্ষী হও।

নীলাঞ্জনা হাজরা; পেশা শিক্ষিকা, বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করেন,
কবিতা,গল্প,
প্রবন্ধ লেখেন।

বর্ষার নিরুপমা

স্নেহাশিস মুখোপাধ্যায়

শুধু সাদা সাদা সামুদ্রিক ফেনা দেখছি।
জল আছড়ে পড়ে যেখানে মুক্তো হয়েছে,
সেই জনহীন বিন্দুর দ্যুতি তো দেখছি না!
সেই লবণাক্ত মাছের স্বাদ কোথায় বিরতি!
মেখলা কোটির আজ মন দেয়া নেই কেন?
বঙ্গোপসাগরে আমি এমন ঢেউয়ের মুখ চিনেছি।

শুধু ধ্বংসের পাঁজর গুণে হীরক খুঁজেছি।
পাথর আছড়ে পড়ে যেখানে সাগর হয়েছিলো,
সেখানে এখনও আতপ্ত বালিয়াড়ির শুকনো হাওয়া!
বিরহী প্রেমিকার সচল মুহূর্তগুলো কোথায় জ্বলছে?
না জ্বললে তাকে প্রেম ভেবে কখনও কি উপহাস
করেছি?
আফ্রিকার হীরক লেকে না গিয়েও আমি বরফের হীরে
দেখেছি!

তোমার অন্ধকার মুহূর্তগুলো দেখতে চেয়েছি উঁচু গম্বুজ!
শরীরের অন্ধকারে সব দুর্গে মিশেছে সেই কার্তুজ!

স্নেহাশিস মুখোপাধ্যায়: বাড়ি হুগলি জেলার ভদ্রেশ্বরে। কবিতা লেখা পছন্দের বিষয়। প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভাবনা

কবি :গুলজার

মূল উর্দু থেকে অনুবাদ :স্বপনকুমার পাহাড়ী

আজ আবার চাঁদের কপাল থেকে
ধোঁয়া উঠছে
আজ আবার সুরভিত রাতে জ্বলতে হবে

আজ আবার বুকের ভেতর জমে ওঠা ভারী নি:শ্বাস
ফেটে প'ড়ে ভেঙেই যাবে ঠিক
ছড়িয়ে পড়বে
আজ আবার জেগে কাটাবে রাত তোমার স্বপ্নে

আজ আবার চাঁদের কপাল থেকে ধোঁয়া উঠছে

স্বপনকুমার পাহাড়ী: অবসরপ্রাপ্ত লেকচারার।১৯৭১ থেকে বাংলা ও ইংরেজিতে মৌলিক ও অনুবাদে গদ্য-পদ্য লেখালেখি। ওড়িয়া ও উর্দু থেকে বাংলা এবং বাংলা থেকে ওড়িয়া অনুবাদও প্রকাশিত।

আবার যদি দেখা হয়

তুষার ভট্টাচার্য

আবার যদি মুখোমুখি কখনও দেখা হয়
মেঘ শ্রাবণ বাদল দিনে হ্রদের কিনারে
হয়তো তখন কথা হবে না কোনও
শুধু দু'চোখ দিয়ে অভিমানের অশ্রু
যাবে ঝরে

তুষার ভট্টাচার্য l
বহরমপুর l মুর্শিদাবাদ l

অঞ্জলি দেনন্দী, মম

অঞ্জলি দেনন্দী ; ছদ্মনাম মম

অঞ্জলি

অন্ধকারে প্রদীপ আলোর অঞ্জলি দেয়।
আঁধারকে আপন করে নেয়।
নিজের ভালবাসায় নিজেকেই নিঃশেষ করে।
অন্ধকারকে আলোয় ভরে।
প্রদীপের অঞ্জলি নিশার প্রেমে জ্বলন্ত।
পবিত্র, পরিপূর্ণ, অনন্ত।
সৃষ্টির আদিতে মহা শূণ্যের, মহান্ধকারের বুকে,
সবিতা চির জ্বলন্ত প্রদীপ হয়ে আলো দিল সুখে।
আজও ও আলো ঢালছে।
নিজেকে জ্বালছে।
তাই তো হল দিবা আর নিশির সৃষ্টি।
সফল হল সকল দৃষ্টি।
আবার রজনীতে আকাশে অসংখ্য প্রদীপ জ্বলছে।
অশেষ কাল ধরে আলোর অঞ্জলি দেওয়া চলছে।
চির রহস্যে তারা ধরা ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে আছে।
রাতে স্বপ্ন দেখি আমি তাদের খুবই কাছে।

সুখময় দাস

জন্ম কলকাতাতে.দেশ সূত্রে ঢাকা বিক্রমপুর এখন বাংলাদেশ ।তিনটি কবিতার বই প্রকাশ হয়েছে ।কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় এবং বাইরে লেখা প্রকাশ পেয়েছে ।ভালোলাগা কবিতা লেখা গল্প ইত্যাদি । কলকাতার খ্যাতনামা নাট্যদল-মেঘনাদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের দলের নিয়মিত অভিনেতা ।

বেল পাতা

সুখময় দাস

ত্রিনয়নী মায়ের মত
সবুজের পটে আঁকা তিন পাতা
তুমি বেল পাতা
যখন মায়ের পায়ে অর্ঘ্য
দেখি সেই অপরূপ রূপ
সেকি তব জ্যোতি
আনন্দে ভরে মন প্রাণ
ভাবি,ব্যর্থ এই জীবন
শুধু বেলপাতা হওয়া ভার ।

মা এলো

ঝুমা দত্ত

ঢাকের কাঠি শুনছে আমার মন
দুলছে ঐ দূরে কাশফুলের বন
শিউলি ফুলের গন্ধ, খুললো বন্ধ দ্বার
এত খুশি চারিদিক কে ছড়ালো !
আমার ঘরে মা এলো... মা এলো.....।

পূজো পূজো গন্ধ,বাজলো ঢাকে আনন্দ
নতুন গানের সুরে বাঁধলো মন ছন্দ
নীল নীল আকাশ,মায়ের মিষ্টি সুবাস
প্রকৃতির কোলে একসাথে প্রাণ গাইল
আমার ঘরে মা এলো.... মা এলো.... ...।

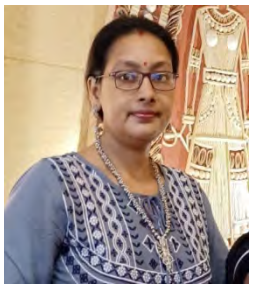

ঝুমা দত্ত: জন্ম ব্যারাকপুরে, পড়াশোনা দুর্গাপুরে শুরু এবং ব্যারাকপুরে শেষ করি। গান শুনতে, আঁকতে, গল্প পড়তে এবং লিখতে ভালবাসি।

আলোর বেণু বাজে

দীনেশ সরকার

ঢ্যাং কুড়া-কুড় ঢাকের বাদ্যি পুজো পুজো গন্ধ
চারিদিকে খুশির হাওয়া মনেতে আনন্দ।
আকাশ বাতাস মুখরিত আলোর বেণু বাজে
উড়ু-উড়ু মন যে সবার বসছে না আর কাজে।

চিন্ময়ী মার মৃণ্ময়ী রূপ দেখবো দুচোখ ভরে
শারদ প্রাতে মায়ের আশিস ভরবো যে অন্তরে।
মিলনযজ্ঞে মিলবো সবাই দ্বেষ-বিদ্বেষ ভুলে
খুশির তরী বাইবো সবে আনন্দে পাল তুলে।

নতুন জামা নতুন জুতো, সাজবো মনের মতো
খুশির স্রোতে যাবেই ভেসে মনের কলুষ যত।
আলোর রোশনাই মন্ডপেতে পড়লে কাঠি ঢাকে
সবাই মিলে হৃদয় ভরে দেখবো দুর্গামাকে।

দীনেশ সরকার: অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক আধিকারিক। ছড়া, কবিতা, গল্প লিখি (বিশেষ করে ছোটদের উপযোগী) যেগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয় ।

বছর পরে নিজের ঘরে

গোবিন্দ মোদক

কমলা সাদা পোশাক পরে ফুটলো শেফালিকা,
নীল আকাশে মেঘের ভেলা ভাসলো সুদূরিকা।
ভোরের শিশির যত্নে ধোয়ায় পদ্ম-কলির মুখ,
শাপলা-শালুক ফুটে বলে - আহা শারদ সুখ!

কুমোরপাড়া ব্যস্ত ভীষণ ঠাকুর গড়ার কাজে,
ঢাকির ঢাকে তাকুড়-নাকুড় শারদ বাদ্যি বাজে।
কৈলাস থেকে বছর পরে আসছেন দুগ্গা মা যে,
নতুন পোশাক, নতুন সাজে খোকা-খুকু সাজে।

অঞ্জলি আর ধুনুচি-নাচে — খুশি সবার মন,
মা-দুগ্গা আমাদের যে — বড়োই আপন জন॥

গোবিন্দ মোদক। (কবি, ছড়াকার, গল্পকার)সম্পাদক: কথা কোলাজ সাহিত্য পত্রিকা। নেশা: লেখালিখি। প্রকাশিত গ্রন্থ: হারিয়ে গেছে ডাক-বাক্স, ধিতাং ধিতাং বোলে, অদ্ভুত যতো ভূতের গল্প, পদ্য ভরা আমার ছড়া, ছন্দ ভরা আমার ছড়া, আলুক ফালুক পদ্ম-শালুক, ‘আয়নার সামনে একা’, ‘প্রথম অন্ধকার এবং ঈভ’, ‘অনিকেত শ্রদ্ধাঞ্জলি, নিমগ্ন রাত্রির ধ্বনিময় সংলাপ, প্রণমি তোমায়

অনাহূত

নিমাই চন্দ্র দে

অনাহূত বলে দিওনা গো ঠেলে
মায়ের প্রসাদ হতে
তোমরা মায়ের প্রিয় পাত্র
অভাজন আমি পথে।

মা'গো তুমি জগত জননী
সুখ দায়িনী অন্নপূর্ণা
কোন দোষে তুমি ভিখারী
করিলে
ক্ষুধার অন্ন জোটে না।

তোমার পূজায় বিশ্ব
ভুবন
মেতেছে সুখের হাটে
সেই সুখ হতে কৃপা
করো মাগো
যেন উদরে অন্ন
জোটে।

নিমাই চন্দ্র দে: বিশিষ্ট শিক্ষক, কবি, সঞ্চালক, । বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম, এ পাস করেন।

বাঙালির প্রিয় উৎসব

হরবোলা সুনীল আদক

মন্ডপে মন্ডপে আসছে দশভূজা
শরতের সোনা ঝরা রোদ্দুরে
বাঙালির মনে বাজে সুর
সে যে দশভুজার সুরে।

দেশ-বিদেশে পড়ে সাড়া
বাঙালির প্রিয় উৎসব
নতুন নতুন সাজ পোশাকে
মন্ডপে ওঠে কলরব ।

পুজোয় বাঙালিকে এক করা,
সবথেকে বড় প্রাপ্তি
মহাসমারোহে হুল্লোড়ে,
দশমীতেই হয় সমাপ্তি।

হরবোলা সুনীল আদক দুরদর্শন, চলচ্চিত্র, আকাশবাণী বেতারকেন্দ্রে যুক্ত ছিলেন এবং নানা সেবামূলক কাজে ব্রত্রী ।

চাইছি মাগো তোর কাছে আজ

সুজন দাশ

অসুর নাশিনী রূপখানা তোর,
দেখা মা আবার পাই মনে জোর!
থাকিস না আর চুপ,
অন্যায় করে লুটে যারা বাড়ি,
গরিবের ধন পেলে নেয় কাড়ি ;
দেখুক আসল রূপ।

নিয়ে আয় মাগো ভক্তির বারি,
আমিত্ব যেন ছেড়ে দিতে পারি!
মুছে দিস মনে ক্ষোভ,
দুদিনের এই মিছে সংসার,
মনে জাগা তুই বোধ টুকু তার ;
ছেড়ে দিতে পারি লোভ।

সুজন দাশের জন্ম বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায়। ছাত্র জীবন থেকেই লেখালেখি করেন।প্রকাশিত গ্রন্থ ছয়টি।
সমাজের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অসঙ্গতি তার লেখার মূল উপজিব্য।বাংলাদেশ ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন বাংলা ভাষাভাষী পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখে থাকেন। বর্তমানে তিনি পরিবার নিয়ে আটলান্টিক সিটি, নিউজার্সিতে বসবাস করেন।

শারদীয়া ইতিকথা

গৌউর দে

শীত গেল, বর্ষা গেল
শরত এল ফিরে,
মিঠে রোদের কিরণ আবার
এল ফিরে একটি বছর পরে।

নদীর তীরে কাশফুল দুলে
প্রকৃতিতে হয় শরতের আগমন,
শারদীয়ার খবর আনল বয়ে
একটি চিঠি, তাথৈ তাথৈ নাচে মন।

এল দুগ্গা বাপের বাড়ি
সাথে নিয়ে কার্ত্তিক গনেশ,
লক্ষী, সরস্বতী বলে মাগো আমরাও যাব
মামার বাড়ি, হবে মজা ভারী বেশ।

সপ্তমীতে এল কলাবউ
সোনার পালকি চড়ে,
ঢ্যাং কুড়া কুড় ঢাকে কাঠির
বাজনাতে আজ আগমনীর রোল পড়ে।

চলল কত আয়েশ, মজা
পুজোর চারটি দিন ধরে,
অবশেষে এল বিজয়া দশমী
বিসর্জনের বিষন্নতা পড়ল সাঁঝের পরে।

মন খারাপ করো না বন্ধু
বলি শোনো তোমরা সবে,
এমন দিনটি আসবে আরবার ফিরে, তাই
জোরসে বোলো, আসছে বছর আবার হবে।।

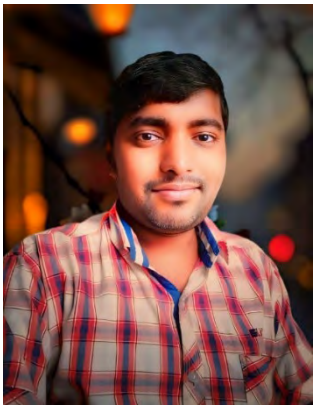

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের লালমাটির জেলা বাঁকুড়া-র অন্তর্ভুক্ত আসবেড়িয়া নামক ছোট্ট গ্রামে কবির জন্ম । ইনি একজন অক্ষম শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। বর্তমানে ইনি, "উমা পত্রিকা"র সম্পাদক হিসেবে কাজ করে চলেছেন ।

মেঘলা দিনে

শ্রীকান্ত মাহাত

মেঘলা দিনে আঁধার রাতে
মা- গেছে ঐ কবে।
সূরজ ওঠে চন্দ্র-অ ওঠে
মা রাখে মু' ঢেকে।
সে দিন হতে তাকিয়ে পথে
রয়েছি এ ভবে।
মায়ের লাগা ডালিম গাছে
গেছে ডাল বেঁকে।
পাকছে ফল আসছে তোতা
খাবে চেখে চেখে।
বাদল দিনে মায়ের কথা
মনে পড়ে তবে।
মুরগি কষা খিচুড়ি রান্না
বসে খেতে খেতে।
চাটনি চাই চাটনি চাই
ডাক রসে বশে।
শেষের বেলা পাঁপড় ভাজা
রুচি মুখ তাতে।
স্মৃতির রেখা সপুনে দেখা
ব্যাথা অবশেষে।
আজ ই ফিরে আসবে মাগো
খোকা আছে আশে।
নতুন করে আবার এসো
মিঠা হাসি হেসে।

শ্রীকান্ত মাহাত এর বাড়ি পুরুলিয়া জেলায়। পেশায় একজন শিক্ষক। সুবোধ বসুরায় এর ছত্রাক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ। এছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করেন। কাজের ফাঁকে লেখালেখিই তাকে আকৃষ্ট করে।

ভোরে

মলয় সরকার

সরলতায় নুয়ে পড়া চাঁদের আলোয়
মাখামাখি হচ্ছিল তার সারা মুখ-
তার থেকে ফুটে বেরোচ্ছিল
নিস্তব্ধতার বেড়া ভেঙে
দিগন্ত অতিক্রম করা
এক অতলস্পর্শী অদৃষ্টপূর্ব জ্যোতিরেখা-

সারা পৃথিবীর অনন্ত গতিপথের
একঘেয়েমী আবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে
আকাশে ছড়িয়ে পড়ছিল
বিস্তৃত ছায়াপথের পশমী মখমল-

ঠিক সেই মুহূর্তেই-
তাকে দেখে,
আনন্দে রাঙা হয়ে উঠল দিগন্তের সীমারেখা।

মলয় সরকার: অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক আধিকারিক। লেখালিখি বহুদিন, দেশে বিদেশে বহু পত্রপত্রিকায়, মূলতঃ গল্প, কবিতা ও ভ্রমণকাহিনী।উদ্যানচর্চা, পড়াশোনা ছাড়াও একটি নিম্নবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা ও স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সংক্রান্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার।নেশা দেশে বিদেশে ভ্রমণ।

আঁধারমাধুরী

বিকাশ ভট্টাচার্য

প্রতিটি রাত্রি মুছেই আঁকা কাকডাকা ভোর
প্রতিটি চিত্রপট ধরে রাখে কিছু ছায়ান্ধকার
নিরঙ্কুশ পথ নেই----সবটাই ধাপসিঁড়ি জীবন
নিশীথেই আলোপোকা ঝরে যায় এখানে ওখানে
জবাকুসুম ভোরের আগেই
মাটির গন্ধের স্বাদ নিহিত রক্তে, তাই
রাত্রির হিম দিয়ে ঊর্ণনাভ বুনে যায় সাধ-----
দু'চারটে পতঙ্গপ্রাণ ধরা দেয় তাতে
নীলাভ শূন্যের দিকে মিশে যাওয়া মূর্ধা
আকাশে
যেভাবে আঁধারমাধুরী টেনে নেয় স্বপ্নের রং,
কাকের গ্রীবার মতো ধীরে ধীরে ভোর হয়ে
আসে
সকাল প্রত্যেকদিনই
আলো হাতে এসে দাঁড়ায় দুয়ারের কাছে।

বিকাশ ভট্টাচার্য: অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষক। ১৯৬৭ সালে কবিতা দিয়ে লিটল ম্যাগাজিন আত্মপ্রকাশ। বাণিজ্যিক অবাণিজ্যিক বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা ও গদ্য লেখালিখি করি।

শান্তির খোঁজে

মোহন মিত্র

বিপ্লব ঘটে গেছে কবিতায়,
আছে শান্তির অপেক্ষায়।
শান্তি আসেনি যুদ্ধে,
আসেনি বিচার-বার্তায়,
সাক্ষী ইতিহাস, সাক্ষী পুরাণ।
ক্ষয়, অবক্ষয় জানি,
তবুও আমরা যুযুধান।

বুঝিনি কৃষ্ণকথা, বুঝিনি বুদ্ধকথা
নিভৃতে কাঁদে যত বাণী।

শান্তির খোঁজে অশান্তির পোত,
জীবন দিয়েছে পাড়ি,
তীরে তীরে ঘুরি,
আমরা শান্তির ফেরি করি।

মোহন মিত্র, অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার। সাহিত্যের প্রতি গভীর আসক্তি। তাঁর লেখা প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ – ১)"সবাই নাকি সুখে আছে", ২)"ছায়া রোদ্দুর", ৩)"কবিতা কথায় কথায়", ৪) "ঢেউ খোঁজে তীর" ৫)"কবিতার অণু-পরমাণূ" ও ৬)"পরের ধনে পোদ্দারি"(লিমেরিক - ই-বুক)

জাদুআয়না

প্রভাত ভট্টাচার্য

আমার কাছে এক জাদুআয়না আছে
সেখানে ইচ্ছেমত দেখা যায় সবকিছু
যখন যা মন চায় ।
ধরো তুমি দেখতে চাও শরতের কাশফুল
দেখবে জাদুআয়নায় তুমি রয়েছ
রাশি রাশি শুভ্র কাশফুলের মাঝে ।
আবার বিষাদবাষ্পের থেকে মুক্তি চাইলে
দেখবে তোমাকে ঘিরে রয়েছে
অজস্র হাসিমুখ
আর তুমিও চলে যাবে খুশির জগতে ।
চাওয়ামাত্র জাদুআয়নায় দেখবে
কৃষ্ণগহবর থেকে বেরিয়ে এসে
দলে দলে মানুষ প্রবেশ করে
আলোকময় জগতে ।
আমি ভালোবাসি আমার জাদুআয়নাকে।

প্রভাত ভট্টাচার্য একজন চিকিৎসক, কবি ও লেখক। উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ , গল্প সংকলন মিলিয়ে তার লেখা কুড়িটি বই আছে ।লেখা প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রিকায় ।

বাংলার বারো মাস

দিলীপ হরি

আসছে বৈশাখ সে যে বাংলার সর্বপ্রথম মাস
তাই দুর থেকে পাই উত্তরপশ্চিমের হাওয়ার আভাস
আনন্দ হয় মনে এখন হবে আমাদের পয়লা বৈশাখ
সাজাবো বাড়ী মন্দির মোরা পরবো নতুন পোশাক
এসেছে জ্যৈষ্ঠ শেষ হবে এখন গরমের রাতদিন
এই মাসেতে পালন করি কাজী নজরুলের জন্মদিন

আসছে আষাঢ় ডুববে ক্ষেত পুকুর বর্ষার জলে
দেখবো মোরা ময়ূরের নাচ নাচবে পেখম খুলে
এসেছে শ্রাবণ তখনও যেন বর্ষা থামে না
শুরুয় এখন তৈরি মোদের মাদুর্গার প্রতিমা
আরও এক স্মৃতি নিয়ে আসে এই মাস শ্রাবণ
কবিগুরুর মৃত্যুবার্ষিকী করি এই মাসে পালন

এসেছে ভাদ্র এখন হবে শরতের আগমন
মনে থাকে যেন এখনই হয় হাওয়ার পরিবর্তন
আসছে আশ্বিন তাই আনন্দে ভরা মন সবার
আগমন হবে যে মা দুর্গার এই মর্তে আবার
জাগবো মোরা এই মাসেতে কালীপূজোর রাতে
আনন্দ হয় দিগুণ মোদের এই দুটি পুজোতে

এলো কার্তিক যেটি হোল বাংলার সপ্তম
বলে বিষ্ণু পুজার লয়ে এই মাস হয় উত্তম
আসছে অগ্রহায়ণ তাই চলেছে অনেক আয়োজন
বিবাহ হবে খুব এখন অনেক তারই প্রয়োজন
এলো পৌষ মাস যখন কাটবে নতুন ফসলগুলি
মন মানেনা শুধু মনে হয় কখন খাবো পিঠেপুলি

আসছে মাঘ সনের দশম যখন হবে শীত অতি
এই মাসে যে হবে পূজা আমাদের মা সরস্বতী
এলো ফাল্গুন আনন্দ দ্বিগুণ বাজাই মোরা ঢোল
রং মাখাবো নাচবো সবাই খেলবো এখন দোল
আসছে চৈত্র সবার পরে শেষ হবে বসন্ত
কোকিলের ডাক কৃষ্ণচূড়া এই প্রকৃতি অনন্ত

আমি ফেলে এসেছি

নয়ন মণি মিশ্র

কখনো ভাবিনি
কেন ছেড়া গীটারের সুর
ভাললাগত সেসময় !
আধ কাপ চায়ের পাশে
মন খোলা নোটবুকটা রেখে
কেউ যেন আসার অপেক্ষা !
বৃষ্টির ছাদে
ভেজা কাপড়ের মাঝে
একটুখানি হারিয়ে যাওয়া.....
দুরন্ত সময়ে স্বপ্নীল মনে
কত কি ভেবে নেওয়া !
আজ হঠাৎ
জানতে পারলাম----
আমি ফেলে এসেছি
অনেক ভাললাগা.....
সেগুলো হয়তো
ধূলো বৃষ্টির ভিড়ে কোথাও হারিয়ে গেছে----
কিছু স্বপ্ন
সেই আমি'টা
আর
প্রিয় নোটবুকটা.....

নয়ন মণি মিশ্র ২০০৯ সন থেকে কাব্যচর্চার সাথে যুক্ত। বাংলা দৈনিক যুগশঙ্খ, সংবাদ লহরী, গতি বাংলা মেগাজিন মজলিস সংলাপ, পারিজাত সাহিত্য পত্রিকা, ব্যতিক্রম সাহিত্য পত্রিকায় কবির লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন অসমীয়া ভাষার দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকায় আমার কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

আমার বিকেল

অন্বেষা চক্রবর্তী মুখার্জী

বিকেল যখন গড়িয়ে গেলো
শহরতলি ধরে...
আমার বিকেল সাজঘরেতে
নতুন বসন পরে।

আমার বিকেল লাল মাটিতে
করছে ছুটোছুটি
আমার বিকেল ছড়িয়ে ধুলো
খাচ্ছে লুটোপুটি।

আমার বিকেল পুকুরঘাটে
পাথর কুচি ফেলে
ঢেউয়ের পরে দুলিয়ে শরীর
হাঁস গুলো জল খেলে।

আমার বিকেল সাজতে জানে
হালকা আলোর ছোঁয়ায়
আটপৌরে গ্রামীন শরীর
সাজছে মেঠো মায়ায়।

তোমার বিকেল শহরতলি
তোমার বিকেল চুপ
আমার বিকেল সর্ষে ক্ষেতে
সাজিয়ে নিলো রূপ।

আমার বিকেল কল্কে ফুলে
নয়নতারার ডালে
ফড়িং হাতে দৌড়ে চলে
নিজেরই খেয়ালে।

তোমার বিকেল ছাদবাগানে
বদ্ধ খেলাঘর
আমার বিকেল ছুটছে তখন
অনন্ত প্রান্তর।

আমার বিকেল সেজেই চলে
গয়না অনেক তার
তোমার বিকেল শহরতলি
ধূসর গলি পার।।

অন্বেষা চক্রবর্তী মুখার্জী

I am a homemaker in a normal joint family who works hard to take care of every issue. My passion for writing on every topic has given birth to the poet in me, and every appreciation provides oxygen to its survival. I wish to produce a lot more in the future by getting plenty of encouragement.

আগলে রাখার রোগ

ছন্দা দাম

আমার ভীষন আগলে রাখার সখ...
আগলে রাখি যেখানেই যা পাই,
কলম,খাতা, কুরুশ কাটা,হাতের লেখা বা উপহার,
মেমো,রসিদ,ছবি,খাতা,
ঘরের মাঝে জমিয়ে রাখা ডাই।

আমার ভীষন আগলে রাখার রোগ...
বুকের মাঝে হাজার খোপের একটা বাক্স আছে,
কথা,হাসি,কষ্ট,ক্ষত,ব্যথার ডালি কান্না বিজড়িত
ভালোবাসা ঘৃণা মনকেমন ,
আপন পরের মায়াস্পর্শ থরে থরে সাজানো যত্নে...
সকাল রাতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি হারিয়ে যায় পাছে!!

আমার ভীষণ আগলে রাখার নেশা...
নির্জনেতে,গোপন ক্ষতে কষ্ট বিষাদ ছোঁয়ার নেশা,
কেমন যেন মাতাল করা মত্ততা এক ঘিরে ধরে...
এমন সুরায় ডুবে থাকার কেমন জাদু,
জানবে সে জন ডুবেছে যে এমন ঘোরে।।

আমার ভীষণ আমার নিজের মাঝে...
সকাল সাঁঝে ডুবে থাকার সাধ,
আমার ভীষণ মরার আগে ভীষণ ভাবে...
আমিটাকে ভালোবেসে হবার ইচ্ছে বরবাদ।।

আমি ছন্দা দাম। ভারতবর্ষের আসাম রাজ্যের পাড়ার ঘেরা শহর করিমগঞ্জে জন্ম ও বেড়ে ওঠা।আমি প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করি। কবিতা লেখা আমার ভালোবাসা। এছাড়া ছবি আঁকা আমার নেশা ।

সুখের ঘরের চাবি

জয়ন্ত কুমার মল্লিক

চাবি ছাড়া তালাটার দাম যে নেই মোটে
কোন একটা হারিয়ে গেলে,কপালে দুঃখ জোটে।
ফ্রিজের চাবি হারানোটা গিন্নির এক হবি
আমি তখন নীরব থাকি,যেন নির্বিকার ছবি।'

ট্রেনে উঠে বাক্সপ্যাঁটরা শেকল দিয়ে বেঁধে
চাবি না পেয়ে তালা হাতে কাকা ফেলেন কেঁদে।
আলমারিতে তালা না দিয়ে বিয়ে বাড়ি গিয়ে
আধা খেয়ে বাড়িতে ফিরি কিছুটা হন্যে হয়ে।

এসি গিজার এয়ার কূলার,তালা চাবি ছাড়া
শহর জীবন এখন তো ভাই আধুনিকতায় মোড়া
গাড়ির চাবি দামি চাবি চালায় ড্রাইভার
লক না দিলে গাড়ি খানা হবেই পগার পার।

ট্রাঙ্ক সুটকেস ড্রেসিং টেবিল লকের সঙ্গে কী
চাবি তালার মাহাত্ম্য,আর বলবো কি?
বেড়াতে গেলাম বাড়ির গেটে,মস্ত তালা দিয়ে
ফিরে দেখি ঠিক আছে তো ?ঠাকুরের নাম নিয়ে।

চাবি তালার গল্প শুনে বলেন দুলাল ভাই
মোর জীবনের সুখের ঘরে চাবি খানা নাই।

-জয়ন্ত কুমার মল্লিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। ১৯৭২ সাল থেকে তিনি লেখালেখি করছেন। সংবাদপত্র এবং পত্র-পত্রিকা ছাড়া তার লেখা তেরোটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দূরদর্শন এবং আকাশবাণীতে দীর্ঘদিন অনুষ্ঠান করেছেন। অবসর জীবনে কাগজ-কলমই তার নিত্য সহচর।

পরিস্থিতি

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

অন্ধ লোকটি বলল, কত কিছু ঘটছে
আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!
বললাম, বেশ আছো প্রলয় এলেও
তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে

বোবা লোকটি ছটফট করে উঠল
অদ্ভুত যত শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে
সে আমাকে কি বলতে চায়
কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি

যে লোকটি কানে শোনে না
কত কথাই যে, এলোমেলো বলল
আমি তার কথায় সায় না দেওয়ায়
সে কটমট করে তাকিয়ে রইল

সারাদিন এইসব লোকেদের সঙ্গেই
দেখা হয় আমার, কথা বলতে পারে
চোখে দেখে, কানে শুনতে পায়
এমন লোকেরা কোথায় হারিয়ে গেল?

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

সত্তর দশকের কবি ও সাহিত্যিক। সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁর অবাধ বিচরণ।
দেশ, আনন্দবাজার, বর্তমান, যুগান্তর, চতুরঙ্গ, বসুমতী, উল্টোরথ, প্রসাদ, পরিচয়, প্রসাদ, শিলাদিত্য, সুখবর পত্রিকা ও আরও বিভিন্ন পত্র পত্রিকার লেখক তিনি। অনেক লিট্‌ল ম্যাগাজিনে তিনি
লিখেছেন। মাসিক 'শিলাদিত্য' পত্রিকার সহ-সম্পাদক পদে ছিলেন।

কবিতা নয়

সুজিত বসু

কবিতা আর লিখিনা আমি ,কবিতা আর নয়
কাগজ কলম মিথ্যে শুধু অবশ হাতে ধরা
লিখতে গেলেই মনের মধ্যে অসংখ্য সংশয়
পরিবেশটাই বদলে গেছে, শরীরে আজ জরা
কবিতা ছিল মাধুরীদির মৌঝরা যৌবন
কলেজ মাঠে ম্লান বিকেলে শিল্পা ঘোষের শাড়ি
কবিতা ছিল দীঘার তীরে গভীর সে ঝাউবন
তার বদলে এখন মনে রিক্ত বালিয়াড়ি
একফালি ওই চাঁদের মতো রত্না বসুর নাভি
আধঝলকে ,কবিতা দিয়ে প্রেমের তখন জয়
সকাল বিকেল সন্ধ্যে রাতে টাকার কথা ভাবি
এখন শুধু ;টাকার জ্বরে পোড়ে শরীর মন
বহু বছর আগেই বিদায় নিলেন সরস্বতী
সঙ্গে নিয়ে সাহিত্য আর সত্যজিতের ছবি
কিছুই তাতে যায় আসেনা, কিইবা এমন ক্ষতি
ব্যাংকে জমুক অনেক টাকা ; নাইবা হলাম কবি
লক্ষ্মী দেবীর আরাধনায় কাটুক না জীবন
বিল গেট্স আর আম্বানিকেই করবো পুজো রোজ
হঠাৎ কেন মধ্যরাতে অদ্ভুত এক ভয়
সর্বস্ব গেল আমার ;বন্ধ সুখের খোঁজ
সরস্বতী গেলেন ;তবু লক্ষ্মী এলেন না তো
স্বপ্নে দুজন দেবীই বলেন কাঁদো সুজিত কাঁদো

সুজিত বসু তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় গবেষণা করে পি এইচ ডি প্রাপ্ত হন মস্কো থেকে।ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় দীর্ঘ বিজ্ঞান সাধনার পর এখন অবসরে।দেশের এবং আমেরিকা সহ বিদেশের বহু প্রথম সারির পত্রিকায় তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত।

তবে বিজ্ঞান যদি তাঁর পেশা হয়ে থাকে তবে কবিতা তাঁর নেশা এবং অন্যতম ভালোবাসা। আমেরিকার পরবাস ছাড়াও দুই বাংলার দুটি নামী পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রায়ই দেখা যায়।

আমি জানিনা

দিলীপ হরি

আমি জানিনা
কেন এই পৃথিবীতে এসেছি
আমি জানিনা
কেন আমি এসেই কেঁদেছি
আমি জানিনা
কী করে আমি মাকে পেলাম
আমি জানিনা
কী করে আমি এই বাড়ীতে এলাম
আমি জানিনা
কী করে আমি বাবাকে পেলাম
আমি জানিনা
কী করে ভাইবোনের কাছে গেলাম
আমি জানিনা
কী করে হল জীবনসঙ্গিনীর দেখা
আমি জানিনা
কী করে হল সব বন্ধুবান্ধবী আর সখা
আমি জানিনা
কখন এলো আমার সন্তানেরা
আমি জানিনা
কী করে নিয়ে এলো এত আনন্দ ওরা
আমি জানিনা
আমি বা ওরাসব কে থাকবে কতদিন
আমি জানিনা
কী হত যদি সবাই থাকতো চিরদিন
আমি জানিনা
কত নদী আছে এই পৃথিবীতে
আমি জানিনা
কেন বাঁচানো যায়না ওদের দূষণ হোতে
আমি জানিনা
কেন করে ওরা উজাড় সব বন
আমি জানিনা
ওরা বোঝেনা কেমন তরো ওদের মন
আমি জানিনা
থাকবেতো এই পাহাড় পর্বত আর নগর
আমি জানিনা
শুকিয়ে যাবেনাতো এই সব মহাসাগর
আমি জানিনা
কতদিন থাকবে উর্বর এই জমি
আমি জানিনা
হবেনাত একদিন সব মরুভূমি
আমি জানিনা
চিরদিনই থাকবেত সাগরের জল
আমি জানিনা
কী হবে যদি রয়ে যায় শুধু স্থল
আমি জানিনা
কতদিন থাকবে এই দুষণমুক্ত বায়ু
আমি জানিনা
ওরা জানেতো ততদিনই মানুষের আয়ু

আমি জানিনা
কত আছে এই ভুবনে বন আর বনানী
আমি জানিনা
কেউ জানে কিনা এদের জীবন কাহিনী
আমি জানিনা
কত আছে এই বিশ্বে পশু আর পাখী
আমি জানিনা
কেন এত আনন্দ যখন ওদেরকে দেখি
আমি জানিনা
কত আছে সূর্য চন্দ্র আর তারা
আমি জানিনা
হয়তো মহা বিশ্ব এইসবে ভরা
আমি জানিনা
এই মহাবিশ্বের কত পরিধি
আমি জানিনা
মাপা যায়কি না করা যায় শুধু উপলব্ধি
আমি জানিনা
কেন পায় সবাই এখানে সুখ আর দুঃখ বেশী
বা অল্প
আমি জানিনা
আছে কিনা এই পৃথিবী সৌন্দর্য আর বিচিত্রতার
কোন বিকল্প
আমি জানিনা
যদিয় এখানেই আমরা পাই সবকিছুই
আমি জানিনা
কেন আমরা পৃথিবীকে স্বর্গ বলতে পিছুই

দিলীপ হরি একজন CPA এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ,কর্নেল স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্টে পড়াশোনা করেছেন। একটি হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি DPNY হসপিটালিটির মালিক এবং চারটি ভিন্ন রাজ্যে হিলটন, শেরাটন এবং বেস্ট ওয়েস্টার্ন হোটেল পরিচালনা করেন। ওয়েবসাইটটি হল www.dpnyhospitality.com। দিলীপ ম্যানহাটন, এনওয়াইতে ৭টি এবং ওয়াশিংটন ডিসি-তে একটি ফ্রেঞ্চ ওয়াইন বিস্ট্রোর মালিক। ওয়েবসাইটটি হল www.vinsurvingt.com।

এ শহরে নিজেকে বন্দী করি

সঞ্জীব হালদার

ঘরের মধ্যে ঘর গড়ি ,আকাশে আকাশে ঘন নীল
তারই নীচে নাগরিক কোলাহল ,
সময়ের স্তব্ধতায় রাত্রি নামে

জনারণ্যে একটি দিন চলে যায় ।বয়ে যায়
মানসিক গ্লানি হৃদয়ে হৃদয়ে –
দিনের কাছে প্রত্যাশা করে যাই পাওনাগণ্ডা

পূর্ণ হয় জীবনের ভাঁড়ার ?

রাত্রির ঘরে আবার নিজেকে বন্দী করি
সকলেই ব্যস্ততার চক্রব্যূহে বন্দী
ছাদের আকাশে চেয়ে থাকি রাতপাখির মত ,
অনুভূতির বিবর্ণ রং ঘিরে ধরে রাত্রির
শহরকে একেকটি রাত্র একেকটি ক্লান্তির
দীর্ঘশ্বাসে বন্দী ,
রাজা নিজেও বন্দী কজন জানে ?

এ শহর হাজার বছর ধরে আমাকে বন্দী করে ।

সঞ্জীব হালদার: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর । বর্তমানে শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত ।প্রথম কবিতা " বসন্তের দুপুর " প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯২ সালে ।

পুজোর মজা

এক যে আছে ছোট্ট মেয়ে,
মনে বড়ই ব্যাথা।
সবাই বলে পড়ো পড়ো,
নেই কোনো আর কথা
মনে ভাবে পুজো এলো,
কটা দিন -ই বা বাকী ।
সারা বছর যদি চলে ,
পরীক্ষার এই ঠ্যালা
পুজোর মজা নেই কো কিছু,
নেই তো কোনো খেলা।
একটা এবার করছি বুদ্ধি,
কেউ যেন না শোনে।
কাউকে কিছু বলব না আর,
রাখব নিজের মনে।
এবার যাবো বেড়াতে আমি,
চাঁদ মামার দেশে
পিসি এলে দুজন মিলে,
চন্দ্রযানে বসে।

তিয়ানা মজুমদার

অষ্টম শ্রেণী

কুমারী সরিৎ কর দেবিশ্বরী বিদ্যায়তনে পাঠরত দশম শ্রেণীর ছাত্রী | ছবি আঁকা ও ছবিতে গল্প বলা তার অন্যতম প্রিয় সখ | নেহেরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম আয়োজিত শিল্পী দেবাশীষ দেব এর প্রশিক্ষনে কার্টুন শেখানোর কর্মশালায় অংশগ্রহণ করার পর সরিৎ এর আঁকার নেশা এক নতুন দিশা পেয়েছে |

I am Udita Maitra. I live in Uttarpara , Hooghly, West Bengal, India. I am studying in Class IX from Uttarpara Children's Own Home High School. My presentation is on 'Animated Durga

আগমনী

অনীশ পাল

আশ্বিনের এই শারদ প্রাতে ,
মন মেতেছে আনন্দেতে ,
কাশের বনের ইঙ্গিত পেয়ে,
দিন গোনা হল শুরু ।

আকাশে তাই মেঘের ভেলা ,
যাচ্ছে ভেসে সারা বেলা ,
রাশি রাশি পদ্ম ফুটে ,
ঝিল পেয়েছে শোভা ।

হিমেল হাওয়ার পরশ আসে ,
শারদীয়া সুর ভাসছে বাতাসে ,
শিউলি ফুলের সৌরভেতে ,
প্রকৃতি মশগুল ।

ঘাসের আগায় শিশির ধরে ,
মন যে বড় ব্যাকুল করে ,
দেবী প্রতিমায় শুকনো হয়েছে ,
শেষ প্রলেপের মাটি ।

ভ্রমর-অলির গুঞ্জরণে ,
ঢাক-কাঁসরের মধুর তানে ,
কণ্ঠেও আজ উঠেছে বেজে ,
মায়ের আগমনী।

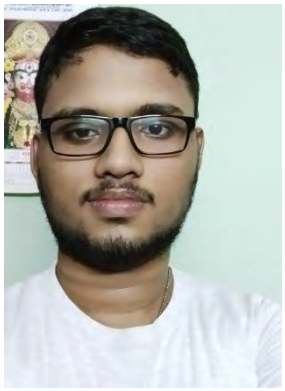

অনীশ পাল: I am 18+ years old. I passed higher secondary in the middle of the year 2024 from the West Bengal board, and now I am preparing for Medical Entrance (NEET) of 2025

First Durga Puja at Belur Math

Vaswati Biswas

In the balmy autumn of 1901, the fields were lush green in Bengal. With white Kash stalks waving their laden heads and lotuses, jasmines and tuberoses were rendering the air fragrant and heavenly. Amidst this magical nature's bloom, the first Durga Puja started in Belur Math in 1901 by Swami Vivekananda.

It is said both Swami Vivekananda and Swami Brahmananda (the first President of Belur Math) had visions of Maa Durga. Swami Brahmananda was sitting in the Math compound facing the Ganga. He saw Ma Durga come over the Ganga from the Dakshineshwar side and stop near the Bilva tree in the Math compound. Just then Swami Vivekananda came by boat from Kolkata and asked for Rakhal Maharaj (Swami Brahmananda) to make arrangements for Durga Puja. Swami Brahmananda voiced his fear to Swamiji of the unavailability of the Idol or Pratima in Kumartoli as the time was too short. Then Swami Vivekananda told him of the vision he had. Swamiji had seen the Durga puja being celebrated at the Math and Mother being worshiped in a Pratima. The news of the visions caused a great sensation at the Math, and one Brahmachari was sent immediately to search for Pratima at Kumartoli, the pottery village in Kolkata. Luckily, an image was found and brought from Kumartoli a day or two before Sasthi, October 18th,1901.

Before initiating the Durga Puja at Belur Math, Swamiji sought the approval of Sri Sarada Ma at her residence in Baghbazar in North Kolkata. The revered Holy Mother blessed wholeheartedly and gave her approval. In a letter to his brother disciple, Swami Shivananda (direct disciple of Sri Ramakrishna), Swamiji wrote from USA in 1894, expressing his conviction about the Divinity of the Holy Mother as follows, "Brother, I shall show how to worship the living Durga (Jivanta Durga) and then only shall I be worthy of my name. I shall be relieved when you have purchased a plot of land and established there the living Durga, the Mother e.i. Sri Ma Sarada".

The Holy Mother attended the first Durga puja held at Belur Math in 1901, then in 1912,1916, and other years, blessing her monastic and lay children. In the courtyard between the old Shrine building(old) and the Math (Belur Math) building, a temporary pandal was erected where the image was installed for worship. It was facing west. The pandal extended up to the mango tree which still stands in the courtyard and the direct disciples of Sri Ramakrishna sat there. Along with the lady companions, Sri Ma Sarada arrived for the first Puja and stayed at the garden house of Nilambar Babu, which was rented for a month. The everyday presence of

the living Durga- Holy Mother surcharged the atmosphere with a divine bliss and elevated the spiritual dimension.

The invocatory worship began on Shasthi, the 6th day of the lunar month, on 18th Oct,1901. On Shasthi, the rites connected with Adhivasa, Bodhana, and Amantrana were performed under the Vilva tree (the spot in front of the place where Swamiji's Temple now stands). The Pujaris of the first Puja were Brahmachari Krishnalal and Isvar Chandra Chakraborty, father of Shashi Maharaj or Swami Ramakrishnananda, another devout disciple of Sri Ramakrishna. The arrangements for the Durga Puja for all four days of celebration were personally supervised by Swami Brahmananda. The Sankalpa Mantra was uttered in the name of the Holy Mother for Swamiji declared, "We are all penniless beggars, the worship won't be done in our names. Moreover, Sanyasins are debarred from performing Vedic and Puranic rituals". The worship is, therefore, performed by a Brahmachari of the Order. This custom is still being followed.

On the night of Saptami, Swami Vivekananda had an attack of fever. So, he couldn't join the worship the next morning. But he came down to the pandal at the time of Sandhi Puja and offered Pushpanjali thrice. The Sandhi Puja began at 6.17 am and ended at 7.05 am on 20th Oct. The rite of sacrifice (Bali) of an animal was dropped on the advice of the Holy Mother. As a substitute, sugar and sweets were heaped on either side of Mother Durga. Swamiji himself sang Agomoni songs, welcoming Mother Durga, who was sitting under the Bel tree. He sang several songs on Navami night praising the Divine Mother, some of which were sung by Sri Ramakrishna. One day, there was an open-air Jatra or Theatre performance of Nala-Damayanti. On the Vijay Dashami day, 22nd Oct, Mother Durga idol was immersed in Ganga River. During immersion, Swami Brahmananda danced like a boy with the beats of Dhaak (drum) and flute, and Swami Premananda watched from upstairs. One of the main items of the Puja was to feed the poor.

Kumari Puja

Swami Vivekananda introduced the Kumari Puja on Ashtami day, and it is now the biggest attraction of Belur Math's Durga Puja for devotees. Swamiji himself worshipped nine little girls as Kumaris. He offered flowers, sweets, and Dakshina in their hands and then prostrated before them. Gauri Ma, a lady disciple of Sri Ramakrishna, made the necessary arrangements for Kumari Puja. Sri Ramakrishna's nephew, Ramlal's youngest daughter, Radharani, was one of the Kumaris on Ashtami day in 1901. The answer to why Swamiji introduced Kumari Puja is found in Sri Ramakrishna's life. Thakur saw the Divine Mother in everything and everyone. He saw no distinction between the Mother (Goddess Kali) in the temple, his own mother- Chandra Devi, and his divine consort, the Holy Mother Sarada. Sri Ramakrishna said," All women are in so many forms of the Divine Mother. But her manifestation is greatest in pure souled virgins."

This first-ever Durga Puja in Belur Math attracted household disciples, general mass, and orthodox Brahmins from the vicinity, and the Holy Mother's presence gave Swami Vivekananda tremendous joy and satisfaction. According to Swami Saradananda, the main purpose in conducting this Durga Puja was to remove all unsavory doubts and skepticism from the minds of the orthodox. Also, during his time in the West, Swamiji observed that the elevation of women had contributed significantly to Western progress. Worship of the Divine Mother, particularly through Kumari Puja, aimed to raise awareness of women's potential divinity and promote a respectful attitude towards them. Unfortunately, that was Swami Vivekananda's first and last year of the Durga Puja. He passed away the following year.

Sri Ma Sarada was highly pleased with the way the Puja was conducted and remarked, "Ma Durga will come here every year". However, from 1902 to 1911, the worship of Durga was on pot (ghot). A devotee promised the expense of the idol and hence from 1912 onwards Durga Puja at Belur Math is worshipped with great traditions, dedication and devotion. This autumnal Puja celebration still continues today in the same manner with fervor and joy and has become a global phenomenon.

Acknowledgement: Vedanta Kesari and Internet

Picture Courtesy: Internet

Vaswati Biswas was a longtime resident of upstate New York, she had recently moved to Charlotte, North Carolina with her family. She loves reading, writing, and nature.

ONE LAST TIME

PARAMARTHA
BANDYOPADHYAY

I'm getting news,

From the butterflies,

My days are numbered.

It's coming thick & fast

And will over soon.

I want to leave gracefully,

Want to stay calm.

If, still rain comes in my eyes,

Forgive me, one last time.

One last smile,

One last hug,

One last suffering,

Hit me so hard,

That I can live rest of my life

In very deep pain.

One last dimple,

So, I can sleep in peace.

Just, one last time.

I'm 'Paramartha Bandyopadhyay' from Kolkata, India and service is my profession. My passion is to write poems, stories, and articles.

Goodbye Riju

Rwitwika Bhattacharya

Riju cannot live in this house anymore.

These were the first words that came to my mind two days ago. And the minute they trickled into my consciousness they took over my entire existence. *He can't be here.*

It won't be easy of course, I'm awfully fond of the little boy. And he is everything to Mandira.

I remember the first time I'd met them both. It was exactly a year ago. Clad in a pale blue saree Mandira was walking down the station platform. She had just stepped off of the Mumbai to Kolkata train which was quite a few hours late. She struggled so much, with a suitcase in one hand and holding a kid, wriggling and bawling in the other, that it was almost inhuman not to lend a helping hand. It was raining cats and dogs as the downpours in October often do. With no Uber and no yellow cabs to be seen I had decided to invite her to my place which was nearby.

My well lit living room revealed a rather striking woman, not beautiful in the conventional sense of the word but still so alluring. The boy, only about a year old, was wrapped in a blue comforter, still sobbing inconsolably. I felt deep sympathy for the poor woman, both at her current condition as well as her past experience. Mandira described how she had escaped her cruel husband, who left no opportunity to humiliate and assault her, and fled to Kolkata with their son. With very little money and no real relations alive the mother and son started living with me and we became a sort of family.

We spent several wonderful months together, the three of us. I grew closer to Mandira and started loving Riju as my own son. My business trips to Kolkata transformed from being a dull necessity to a much-awaited pleasure. All was well until Riju started saying the things he did, revealing what he wasn't supposed to. The first few times he slipped up, things went relatively unnoticed. But last week at dinner he finally said too much. I stared at Riju, then at Mandira and I saw it right then on her face. She sat there like a statue, looking stonily at me.

I'll miss the little kiddo. It's a lie if I say I won't. But honestly, I don't have a choice anymore. I hope that someday Mandira will see that.

I make the final phone call. It's all been decided. I'll take the boy to the park at about 10.30 (the park is rather isolated at night) and they'll take care of the rest.

I wait till the scheduled time. Riju is in his room, Mandira is reading Peter Pan to him. I get restless, why is it taking so long for him to fall asleep? My heart drums in my chest, beads of sweat form on my forehead. The clock ticks on and I grow increasingly nervous. Until about 10.25pm when she finally comes out and goes upstairs to the bathroom.

I seize my chance. Without wasting a single second, I run to Riju's bedroom and pick him up. I look at his little round face, sleeping so peacefully. I rush out and hurry towards the park.

There's an autumn chill in the air, the pale crescent moon hangs in the sky. I carry the boy and walk on, all the while reminding myself that this *has* to be done. When I reach the park, I find it completely empty. I put Riju down on the bench, him still sleeping soundly, and look at my watch. 10.35. For a brief paranoid moment, I fear I'm too late. But then I see the two figures walking towards me.

I take one last look at Riju and then turn around and walk away. It is done. Nothing more to fear. It all happened within a matter of a week but to me it seemed like a decade. From the first time Riju in his childish almost incoherent way started talking about how his mother collected newspaper clippings, up until this moment when I handed him over, so much has happened!

It had taken me a while to find her box of paper cuttings about the little boy who was abducted from his Mumbai home. But the moment I saw them I realised it all. The circumstances under which I had met Mandira for the first time, how much the little boy was crying, it all made sense. The poor kid must have been so scared! All alone, without his parents, in the arms of an unknown woman! How blindly I had believed her tales of an abusive husband! How she manipulated my saviour complex…But now it's all over.

And thank God that, in the end, I didn't have to call the police after all! Involving the cops would undoubtedly lead to my wife finding out about how I lived with Mandira whenever I was in Kolkata. But no harm done; all's well that ends well. Now, all that's left is to pay the remaining rent for my Kolkata apartment and get out of that house before Mandira finds out what I have done. As for the kid, I do hope he is happy with his real parents.

Rwitwika Bhattacharya; I am Psychological Counsellor currently residing at Rajarhat, Kolkata. My passion has always been writing poems, short stories, novels and screenplays.

The Guiding Angel

Asish Mukherjee

A guiding angel is a nebulous thought that offers a mental staff to walk the path of life. It can be a person, a concept, or even the Creator. I feel that the feeling springs from childhood experiences.

In the flicker of a flame afar

Like the lasting glow of a spent star

I feel your tender strength.

In the earthy scent of vernal rain

From a long-forgotten dusty lane

I sense your tepid breath.

When classroom lessons old in time

Drift to me like a childhood rhyme

I can touch your mind.

Now, tomorrow waits beyond the bend

Yesterday's stories have to end

But I know you're right behind.

Asish Mukherjee, a resident of Maumee, Ohio, USA. is a physician by profession; he loves writing, computers, and travel.

The Flow

Wribhu Chattopadhyay

1

Opening

-What are you doing dear?
- Nothing special, darning for the same worship and other rituals.
-Just completed my breakfast; now I am just yet to serve. Then I have to make lunch. Oh! I may have forgotten the reason for the phone call. She also went out yesterday.
-Really? Time?
- Around four in the afternoon and returned after one and half an hour.
-Very weird and what about dada?
– He will not deem anything.
–Let's stop, you need not say anything, leave it to me. You have to keep your lip tight and don't divulge anything to dada.
- But I am now very much worried. Is Maa in any affair?
- Boudi stop thinking, I may be in the next month then the entire matter may be shaken-up.

2

Ruma, the mother

Balcony is very suffocating and Ruma feels lonely here. But it happens nowadays only. The surrounded towers and skyscrapers are very penetrating. It has absorbed the fresh air and candidness. The bigger you are the lonelier you would be. Her son Bimbisher is married and Bouma Shruti has come. It is their love marriage, and when Ruma heard about them, she atone gave them permission. Shruti was non-Brahmin, not of their caste,

After Basab's death Ruma and her son Bimbishar were trying their best to live in this two- story house. Her daughter Bidipta came only twice after her father's death. It was not abnormal for her. She came only once a year after her marriage, and Basab was living then.

Basab used to ask her, and she replied, 'Baba, I wanted to come but your jamai couldn't manage and this time is very competitive. For a narrow space her promotion might be dropped.' Basab understood everything, or pretended to understand, bobbed his head and silently perceived the physical severance from one person to another.

Immediately after his death daughter Bidipta came but her husband Pronay couldn't or had not. Bidipta came to Ruma and in her sobbing tone said, 'Maa, your jamai wanted to come but couldn't manage an unexpected task.'

It was an obituary, but the entire house was very crowded. Ruma liked it very much. Loneliness is always horrible for her. But she has to adopt a lonely life.

Bimbi goes out to the office at nine every morning and after that the entire house becomes a dome for her. But no one could do anything. Bimbi goes out in the morning and returns in the evening. Ruma spends her

time by fiddling books, and by roving in her memory lane. She sporadically watched the black and white album of her marriage and remembered the days with Basab.

They together roamed by the river near their town. She also remembers how Basab said, 'In my dearth, try to feel my touch in this flowing brook. I will always be with you, not physically but in this flowing brook.'

It was Saturday and Basab was born on Saturday. After his death Ruma remembered everything and was waiting for the last Saturday of the month. On that day she gets ready and at four pm she comes out and sits beside the river. She dangles her legs and feels a sensation. She closes her eyes and feels a breath of Basab.

That is her pleasure, that is her panacea potion for battling with her seclusion. For the first two months after Basab's death she goes once in a month then she decides for a fortnight after. And the rest of the days she has to engage for that fifteenth date. After six months on a Sunday evening Bimbishar says, 'After father's demise I am brooding over your matter, and very afraid too, now it seems you have recovered the stage, I am quite happy with it.'

Ruma smirks and replies, 'The first few days were really disturbing, I could not manage the solitariness. Now I am trying to solve the equation. I feel your father is with me, and he directs me every time.'

3

Bimbi and Bidipta or Bouma

– Dear, may I share something with you? I have been thinking for a couple of months but cannot manage the courage.

– Okay, don't swindle, be straight and say.

- Once in a fortnight your mother goes somewhere, leaves the home in the afternoon and returns in the evening. I asked her several times but no reply.

–What the needs of your questions? You also roam like a bird, and I hope my mother has not asked you anything.

Shruti hesitates and replies, 'This is true, but something odd stuck me'

– You need not think much, the dead shouldn't bury the dead.

Shruti frowns and replies, 'you know what has happened for Kanak's mother, buzz spreads like open fire, and we all must be cautious, if your mother….'

–Shruti! Don't cross your limit.

Bimbishar gets angry. But he controls himself and says, 'be straight of your words, I don't want to live on half plate.'

-Have you paid any prior attention to my consent, for you I am just a know nothing lady, and it is not me, your own sister is saying so.

- Oh! You are not unaccompanied. Manthara is also playing the cube.

– You may revert, but your sister is very pragmatic and practical, no one can believe you two are from the same womb.

- Now tell me what have you discussed?

- We were neither condemning you nor your mother. But we are all very afraid of her. She is leaving as she wishes. Your mother is still very young and her cycle is still going on.
-You too are of a dirty mind, and don't know how to tribute the elders. Probably it is your lineage and custom. My sister too is getting nasty.
–Yes I am nasty, in our area just two streets away from here, one lady of your mother's age fled with a young boy. She also has a son, daughter more than grand son and daughter too.
Bibbishar shows his indignation but does not make any reply at once. He waits and then says, 'It is better for you to switch for a job, and also asks your sweet nanad for the same venture.'

Bimbishar or Bimbi and Maa 4

Everything is very mysterious. Bimbi does not ask any questions. Ruma leaves the flat without mentioning anything to anyone. Bimbi is in the room, he immediately asks, 'Mother, are you going somewhere?'
Ruma is not ready to answer. She has been fumbling and hesitatingly replies, 'Yes, I have work to do.'
-Will you go by bus, or should I drop you.
–No, no, you need not to be worried; I could manage by auto and by bus. You should take a rest now. Ruma leaves at once, but something aggravates her. The situation is not welcoming; he has not asked anything till date. Has he doubted something, if it really goes, then what? 'Mother is in a relationship.'
Ruma smirks. Should she reveal everything?
What might they think if the actual fact comes to light? They all are children still, or kids.

5

Doubt

Everything is getting hazy, not a single thing can be understood, and every equation is coagulating and becoming mysterious. When Baba was alive mother was also very jolly and no dubious matter could be perceived. Bimbi could not recollect any incident of broiling between them. Mother tried to look after the family like her own shadow; even she recovered herself from the verge of mournfulness after the death of the father. There is hardly any question of extramarital affairs. Then! Is she in any part-time job, no it cannot be, she has a huge bank balance, and further if it is a part-time job then why is it only on Saturday?
Is she in any course, computer, yoga, or something else?
No, Bimbi cannot think more. If it continues he may get insane. Then!
A family discussion is much needed now.

6

Dipu, Bidipta, the daughter

Ageing is very dangerous, it can make a man mad, and it spoils mental stability. Otherwise, such an incident may not happen. Mother, at present is the head of the family, goes out in her wish. After any misfortune or accident, they have to hide their face. Moreover, Pronay neither likes this home nor likes to come here. Her

two daughters are teens now. They two are in a hostel; there is no question for vacation. If any incident happens everyone has to face the ditch. Boudi is paying heed, but I don't know how much Data may pay attention. I have to go there otherwise the situation may be worse; any bicker may crop up between dada and Boudi for maa. She needs a serious discussion.

7

Dada Boudi and Nanad

Yes I have heard what you all say. One thing we all have to feel. What we are discussing now is based on a simple assumption; there is no concrete proof, at least what I have understood. Even we cannot directly ask our mother what to do.

- Now it is your turn to solve the riddle, we have just introduced the matter before you but mind it we have to face the battle if any discrepancy comes.

– Now say what can we do, mother is also aged now, she has already crossed her fifties, and this age is very threatening. Any undue excitement can be fatal for her.

– No, there is no question of any dispute, just hear what your sister says. Your Mom goes out somewhere every Saturday from three thirty to four in the afternoon and returns in the evening. Now we all have to fetch out the matter. If we follow her then the matter may be resolved. We will take another key and mother may take another, then we….'

- How does she go?

- By bus or auto.

– How do you know?

– One of our neighboring Boudi once said this to me. She asks your Maa, but she avoids answering.

8

Catastrophe

Maa, what are you doing, sitting in this dark riverside? You may catch a cold.

Ruma hears everything but does not reply. She heaves a sigh. Dipu her daughter stands beside Bimbi, she asks 'Maa, please reply we are in great trouble, and worried for you.'

Ruma exhales a deep air and starts to reply, "Just after one month of our marriage your father says, 'You can feel my touch is this flowing brook. When your father is alive, I have not found any relevance of his words but after his death I have no option left but only to abide by his words.' When I touch this flowing river it seems your father touches me. Though the river is getting thin by the paws of skyscrapers, its cemented steps have also been broken. Still, it is my only ventilator of grief. I still love my husband.'

Evening pants over the afternoon, and they all are waiting on the bank of this brook. But even the evening cannot understand if there is any droplet of brackish water in the eyes of any one.

Wribhu Chattopadhyay, from West Bengal, India, is a Govt School Teacher by profession and writer by passion. Four collections of Bengali short stories have been published so far. He is now working on the collection of his first English short stories.

An Ode to a Million-dollar memory

Sushma Vijayakrishna

Remember the bridge we crossed a few years ago?
The news this morning says that it is all set to be demolished.
I am not sure, but…can I really see it go?

When walking on it, we were literally on cloud nine
Observing fast-moving traffic under our feet was a little more than fine!

They designed an alternate route
Sharing a sidewalk with noisy traffic was the proposed quote!

Nothing close to the peace and quiet of the walkway
Just 'US' and the sway!

Build one and then break the other
It is a 'want' and not a 'need', so why bother?

With no heavy distractions, the footbridge could last our lifetime
Certain things just need ‘let alone be ‘, with no primetime!

They built it for 3.5 hundred grand
A good sixty years ago
Now, they are paying 1.5 times the price
To safely see it go…

This is the saying of the civil white collars,
One of our best memories is now worth a million dollars!

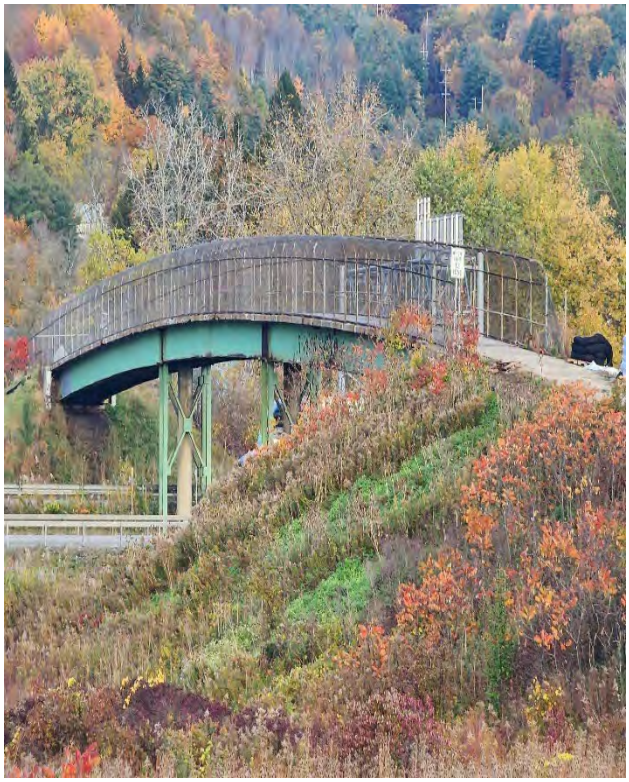

Sushma Vijayakrishna

"There is no austerity equal to a balanced mind; no happiness equal to contentment; no disease like covetousness; and no virtue like mercy."

The Pilot and His Dames

Aniruddha Sen

A seaman, they say, has a wife in each port. Likewise, shouldn't an airman have a wife in each airport?

Well, Francis is trying his level best. As yet, he has just three.

Francis is a jet pilot. He flies the private jet of a business tycoon between various megacities. Presently, he is in his New York apartment with Hilda. Her – well, rather generously developed body may raise fear of god in any stranger. But those who know her would swear that in the heart, she is quite docile. As gentle as a lamb.

In a few hours Francis would fly his boss to Paris. He would be really sad to leave Hilda behind. But then business is business and personal life comes next.

While Francis was frantically searching the internet for the latest weather reports, Hilda was busy with her wardrobe. She was apparently in a dress rehearsal for a forthcoming party. Being what she was, she had to invariably shop in the special stores for the big and the long. Still, she had a bountiful wardrobe and was trying one after another for the best fit. After quite a few trials and still unable to make up her mind, she called out, "Sweet dear, please have a look and help me out with my dress."

"What?" Francis answered absent-mindedly.

"Tell me which one will make me look really gorgeous and smart."

"None." Engrossed in his gadget, Francis inadvertently let the truth slip out.

"Whaat!" Jolted out of his computer screen and into the real world around by her scream, he immediately realized the bloomer and foresaw the imminent peril. Now she would throw herself on bed and start wailing mournfully in a voice unbelievably shrill for a person of her stature. Desperate for damage control he said, "Well dear, what I meant was that you look the prettiest only when in your birthday suit."

"Suit – my foot!" Far from being pacified, she erupted, "Have you miser ever gifted me even lingeries on my birthday?"

Sigh – language was never her forte! But Francis suddenly found a straw that he could cling on to. "Forget and forgive, honey – I'm now going to Paris. I'll get you a lingerie set that's the latest rage!" He declared with a generous smile.

"Promise?" Wiping tears, Hilda smiled sweetly, came forward and embraced Francis.

And then he blissfully forgot everything else. Once there, she is in eternal peace.

***

The weather was good. After eight hours of jolly ride they landed in Paris. He was expectantly looking forward to meeting Stephanie. Unfortunately, it would be a very brief stopover in Paris.

Stephanie's apartment was a couple of hours' drive from Charles de Gaul. But before that Francis didn't forget to stop at Laurence Tavernier to buy a reasonably expensive set of lingerie for Hilda.

The moment he stepped in, Stephanie was upon her. She was a beauty with a slender frame Jumping onto Francis, she clung on his chest.

"I'm sorry darling, I have to rush soon," Francis mumbled.

"That's always your excuse!" She said in tearful eyes, "Why can't you ever be with me for a full day?"

"I'm a jet pilot, dear – always on the move."

"Then why can't you ever take me on board – at least for a change?"

"That's a possibility." Francis pretended to be thoughtful. Then suppressing a devious smile he said, "But do I want my boss to flirt with you while I'm engaged at the cockpit? You are such a something!"

"You bloody flatterer!" Stephanie giggled, as Francis heartily joined.

"Now let's have a few bites. I've brought some snacks." Francis declared.

Before he could be aware of the consequences, Stephanie rushed ahead to open his bag and immediately spotted the neatly packed lingerie set.

"Wow – Laurence Tavernier! You really love me, Francis!" She pounced on the packet.

He bit his lips and pulled his hair in disgust as Stephanie tore open the wrap. Next moment her whole body erupted into a violent tremor.

"Is this for me, dear?" she roared in laughter, "Am I soooo big?"

Before he could think of a plausible explanation, Stephanie came forward, embraced him and planted a kiss on his cheek as she said, "My cute, innocent darling –Better be wiser next time."

Francis mumbled some affirmatives, as Stephanie started arranging their small table for tea.

***

Next port was Ankara. Francis was not at all pleased with such a short stay with Stephanie. But the boss insisted he had to be at Ankara before nightfall. He apparently had a brief business meet at Paris. But looking at his cozily satisfied face with soporific eyes and sensing the aroma of eau de cologne all around, Francis suspected he rather had quite a pleasant experience here. After all, it was Paris and the boss was a 'Wham-bam, thank you ma'am' type of person.

Unlike Francis – who is arty and sensual and needs time.

The scheduled flying time to Ankara was three and half hours. As Francis completed the climb, he had an uncanny feeling that everything was not right. There was a silent message of trouble in the cool air. He didn't have to guess long. After a while the ground control radioed the message that a small twister was advancing from the North-West and was likely to cross his path in a few minutes. Francis sought permission to climb to the next corridor but was politely told that it was reserved for a VVIP flight.

"Turn back if you may", was the sage advice. Francis was immediately in touch with the boss who fretted, fumed and screamed. He had to sign a billion dollar deal that evening, or so he said. Francis then decided to brave the twister.

He wished he didn't! In a few minutes he was within it and immediately felt he had lost control of things. The little aircraft was nearly in a spin and it took all the expertise of Francis to steady it again. Then he summoned all his grit and determination to fight a battle that he genuinely believed was a lost one.

After about ten minutes that seemed to be eternity he realized they had survived – and how, he wasn't quite sure about. The swirls and gusts slowly fizzled out to steady jitters and bumps. Once again it was a smooth ride – or so to say.

"We're still in the air", he radioed back to the ground control, possibly giving them a nasty shock thereby.

But when he reached Ankara he realized there was a flip side too. The extraordinary tail-wind had pushed them to the destination a full half an hour ahead of the schedule!

And Francis didn't grudge. It would give him half an hour extra with Nafisa. A pilot, Francis had seen many pretty women before. But he had never seen and neither did he expect to see any graceful beauty that could match Nafisa. She was neither too plump nor too bony, neither too tanned nor too ashy. Her height and features were just right. Her soft eyes couldn't mask the sharp mind that would peep through those pair of exquisite windows. In short, she was exactly what it should have been and in precisely the correct proportion. Just like the great Taj Mahal of Agra!

"Wow, you're here so soon!" It seemed Nafisa was rather shocked than surprised to see Francis too early.

"I had the help of a divine broom sweeping me towards you." Francis grinned, "Why – aren't you happy, my dear?"

"Well, why not?" Nafisa gulped, "It's just that I'm not yet through with the chores. I must rush to the stores for some groceries. Please rest awhile – I'll be back in fifteen minutes."

Nafisa covered her exquisite body with the traditional 'burqa'. Quite possessive about her, Francis could have been glad at this bit of conservatism of his lady. But he wasn't. Rather he felt it allowed her the undue privilege of watching men without hindrance from under her cover. Anyway, it was her birthright and who was he to deny it?

While Nafisa went inside to pick up her purse, he eyed a shadow-like figure stealthily crossing the inner door. It was another burqa-clad woman! Who the hell was she? Francis frowned inquisitively towards Nafisa when she came out.

“Never mind – she’s my cousin.” She said, “I’ll tell you all, once I’m back.” Then throwing a naughty glance she added, “And let her alone, my sweet darling – don’t try to cast your charm.”

But the curiosity of Francis was already aroused. The moment Nafisa was off, he peeped into her room to spot her cousin. Within the burkha, she looked rather big – well, too big for a woman! He became suspicious. Was that a woman? He remembered Nafisa was too shocked to see him too early. Did he then gatecrash into a sweet, little tryst?

As Nafisa’s mysterious cousin was looking out through the window, Francis tiptoed from behind, grabbed her veil and lifted the cover in a short and swift action. And lo and behold – it was good old Hilda!

“Hilda dear – how come you’re here?” He gasped.

“We three were having a small party”, she beamed, “Why did you have to come too early to spoil it?”

“But how can you be here before me – nothing is faster than a supersonic jet!”

“There is – that's the internet!”

“What!” Francis nearly choked.

“Inter-net! I came via in-ter-net!” Hilda jumped and danced and giggled, as awestruck Francis saw her morphed figure shaking and twisting into ghostly shapes. The broad smile bared her protruding fangs that were sharp and honed.

Francis was on his feet and was closely followed by Hilda. As he wanted to zoom past the door, he nearly bumped against Stephanie and Nafisa. They were all smiles.

“Come on, dear”, they heartily invited, “Join us in our little party.” They extended their hairy claws to shake hands with Francis. He desperately tried to scream but in vain.

***

Francis woke up with a jolt and realized he had fallen asleep in his wheelchair. He was trembling and was in all sweat. Slowly he came back to himself and looked around.

It had never happened before – those nightmares! It might be the lunch that didn’t agree with him. Never mind, one has to live with a few small glitches and carry on. He fondly caressed the stubs that once carried a pair of strong legs and recounted some distant scenes. The crash of his trainer aircraft – the emergency eject finally working, albeit a bit too late – a hard thud on the ground – two months of bitter struggle for survival – at last walking out or rather rolling out of the hospital – only to find that his wife had walked out on him.

But all that was now past. And the past is a fantasy one can ill afford to live in. Not the least, a jet pilot who must fly in the sky of reality. He looked at the computer screen ahead of him, with 'Google Earth' on. After some deliberations, he chose a city and clicked on it. Immediately, the claustrophobic Mumbai apartment, the meager pension, and the grumbling mother vanished into thin air.

Last night, he had heard her sobbing, "God, why did he survive?"

Well, he would be the last one to concur. Life is worth it till the last puff, for what all it's worth.

But if you want to avoid nightmares, you should avoid the food that doesn't agree with you.

Aniruddha Sen is an electrical engineer from J.U. and a retired scientific officer of TIFR, Mumbai. His stories, articles and poems in Bengali and English have been published in a number of printed and web magazines, occasionally in some mainstream ones. He had authored three story collections in Bengali and one in English. His interests include science and conservation.

Caregiving

Archana Susarala

Caregiving in the mild stage of (AD) can be challenging yet rewarding and very educational. In a few weeks, I plan to take a training session on how to care for mild (AD) patients, which will be offered by the Office for Aging. In the early stages of AD, patients are still able to complete many tasks with assistance. In the early stage, companionship is very important as patients are still able to socialize.

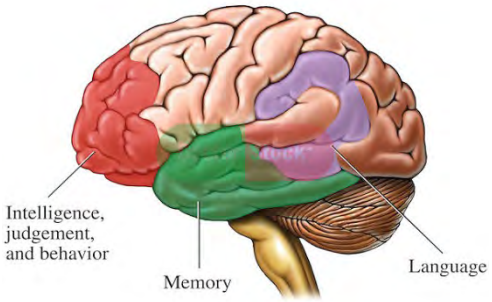

During the early stages of AD, routine for the patients is important for bathing, dressing, and eating. For each activity, caregiver's should try and keep the same timeframe each day. In this stage, keeping lists for patients for appointments and events is vital as patients can still follow written directions. Patients in this stage are still able to socialize so games such as marbles or dominos can be fun. This will maintain their social skills, turn taking skills, memories of colors, shapes, and numbers.

Physical routines such as going for a walk will provide exercise and conversation skills. During this stage, reminders to take medications can help maintain independence. Patients should do as much for themselves as possible. Patients should wear loose-fitting clothes with zippers or elastic waistbands and Velcro shoes. Shower chairs are also very helpful to prevent falls. For each activity a caretaker provides, they should communicate clearly what they will do. Step-by-step directions can be helpful. Caregivers should provide plenty of time for each activity so patients are not frightened or uncomfortable. Caregivers should be gentle in their approach and connect with the patients to avoid resistance to tasks. The more patients do for themselves, the more productive they are. Early stage caregiving can be challenging, yet rewarding to see how clients with mild memory loss can still function with some independence.

Reference: Tips for Caregivers and Families with Dementia (2024). Alz.Gov.

Archana Susarla lives in Vestal, New York. She is a graduate of SUNY Oneonta with a BS in Psychology.

Śyāmalakṛṣṇa basu

Oh, my Love (October ‘1980)

All day, I am walking in a sweet dream
I think about you constantly,
Just like an ever-flowing little stream,
Your memory hunts me constantly.
Oh, my love. Oh, my love.

Though you are no longer near me
Still, I feel your presence deeply,
Love birds bring your songs to me
Reminds me of you constantly.
Oh, my love. Oh, my love.

Try to forget you from my mind,
Who can forget those days gone by?
Breezes whispers your name to me,
Reminds me of you constantly.
Oh, my love. Oh, my love.

As the stars keep burning in the sky
Your love will stay aflame in me,
Though we now may be far apart,
Still, I love you constantly.
Oh, my love. Oh, my love.

Śyāmalakṛṣṇa basu: Enjoying retirement; In 1922, my collection of stories called *Jibaner Anubhabe* and my collection of poems called *Sudha* were published.

In 2023, I published four of Tagore’s short stories in drama form from *Hridayer Katha Prakashoni*, College Row, Kolkata, India.

https://drive.google.com/file/d/0B_whe9nAmB7beDhfb2tNeDBGbHM/view?usp=sharing&resourcekey=0-Uazw-4fdz7C5JdK1eQV87A

THE GREAT CONTRACT

Prasun Kumar Dutta

This is a fictional story drawn upon the great Indian mythological epic Mahabharata which revolved around the conflict within a powerful royal family. The sparring factions were cousins, the Kauravas and the Pandavas of the illustrious Kuru family. The Kauravas were the hundred sons of the patriarch Dhritarastra, the emperor, and the Pandavas were the five sons of his brother Pandu who died early.

Convinced that Pandavas and Kauravas could not live together in peace and harmony, the emperor Dhritarastra approved partition of the Kuru kingdom. He decided that the Kauravas would retain Hastinapur as their capital and the Pandavas would have to build a new one for them.

The question of land acquisition for the new capital accommodating the royal palace, the administrative buildings, the residential colonies, the shopping malls, the educational institutes, the sports facilities etc. turned out to be a very complex issue of colossal magnitude.

“Hastinapur has no surplus land left and I am against acquisition of farm land for this useless project just to satisfy the ego of those five unscrupulous individuals, the Pandavas” said Duryodhana, the eldest of the Kauravas.

The senior ministers of the kingdom like Bhisma, Dronacharya and Kripacharya were compassionate to the Pandavas, yet they saw merit in Duryodhana’s argument and agreed that farmers cannot suffer because of the royals.

In his report, Bidur, the cabinet minister of land and water resources wrote, “The Pandavas may be allotted the rocky barren land lying amidst the wilderness, on the western bank of the river Yamuna” and appended a short personal remark stating that it would be an injustice to them.

“That is your personal opinion Bidur” quipped Dhritrarastra “The resourceful Pandavas possess great entrepreneurial skills. I will personally propose this option to Yudhisthir, the eldest of the Pandavas, offering him that the government of Hastinapur will bear the entire cost of building the new capital”

Yudhisthir was very much upset, so also his four brothers Bhim, Arjun, Nakul and Sahadev. They did not like the location and the terrain of the offered land. Their shared wife Draupadi (polyandry was rare but not abolished) called her trustworthy friend Krishna, the incarnation of Lord Vishnu. He advised the Pandavas to accept the offer.

“Have you lost your sense of letting go of such a wonderful opportunity? You are getting a gold mine free of cost. Grab it. Use your entrepreneurial skills and build a great city. My friends in Heaven will help you.” Krishna said.

Led by Lord Viswakarma, the entire Technology and Infrastructure department of Heaven agreed to provide technological assistance as needed.

The Pandavas had Heavenly connections, too. Arjun spoke to his godfather Indra, the emperor of Heaven. On his instruction Varun, his minister of water resources, endowed unprecedented monsoon rains. Parched and rocky western bank received much needed wetness. The low lying eastern bank adjoining Hastinapur was massively inundated. Flood brought misery to the farmers of Hastinapur. Invited by the Pandavas, the farmers migrated to the west bank. Duryodhana had to waive taxes and offer attractive incentives but could not prevent the exodus.

As a mark of respect to Indra, the capital city of the Pandavas was named "Indraprastha".

"We need a magnificent royal palace, an awesome seat of power" said Arjun.

Yudhisthir was not in favor of flaunting pomp and splendor but had to give in due to insistence of the brothers and the shared wife Draupadi Even their mother Kunti wanted the best palace the universe had ever seen.

It was decided that the contract for this project would be awarded to a large infrastructure contractor through a competitive bidding and Viswakarma in his capacity as Engineer General of Heaven would prepare technical specifications and tender documents.

The news of the competitive bidding became the buzzword of the business community. Pandavas were still living in Hastinapur. The international builders started opening liaison offices in Hastinapur. Intense lobbies and counter lobbies ensued through numerous seminars, presentations and private meetings. In the tender documents, Viswakarma did include a clause proscribing canvassing but none took it seriously.

Bidders' qualification conditions included two critical aspects, nationality and purchase preference.

On the second issue a consortium of state owned Hastinapur Public Works and privately owned Kurukhestra Builders and Engineers met Duryodhana and requested some kind of purchase preference for the local bidders. Duryodhana, a staunch supporter of free market policy, was not keen but he did see in it an opportunity to block the Pandavas. Duryodhana wrote an official letter to Yudhisthir informing him till the time Indraprastha was formally built and the constitution of Pandavas' kingdom was in place; all the construction contracts would be governed by the laws of Hastinapur.

Unsuspectingly Pandavas consented. Even Krishna did not object.

Advised by Duryodhana, the representatives of the consortium met Bhisma, an incorrigible nationalist, and quietly lobbied for the grant of purchase preference. Bhisma agreed and committed total support.

An amendment of Hastinapur Tenders and Contracts act was done and an allowance of ten percent purchase preference to the state owned contractors, either bidding on their own or in consortium with other publicly or privately owned companies, was duly notified.

The Managing Director of Hastinapur Public Works did meet Yudhisthir and other senior Pandavas and expressed keen interest to build such a historic public works project.

Viswakarma opined, international bidding notwithstanding, provision of purchase preference would make the bidders from Heaven uncompetitive (in spite of significant export subsidy) and the contract would probably go to some Earth based bidder.

Yudhisthir was not very averse. Arjun however did not like the idea that such an iconic project would be constructed by an unimaginative state owned contractor from Hastinapur. Nor were the allies of the Pandavas happy. Balaram, the elder brother of Krishna, had already been approached by Dwarka Engineers who had impressive credentials and Dhrupad, the father-in-law of the Pandavas was secretly lobbying for Panchal Builders.

Deep in the south on the bank of Godavari Dravidian construction baron Moy had several rounds of meetings with his board members. "We must get this contract, "said he "and at any cost."

He spoke to Bhim, the second Pandavas in terms of seniority, through his secret emissary in Hastinapur. Bhim was quite sympathetic to the .

Bhim had a closed door discussion with Draupadi, what had exactly transpired in that discussion was not known but consequently Draupadi expressed her clear preference for a crystal palace. She conveyed her desire through his trustworthy friend Krishna.

Krishna knew if state of art crystal technology is specified, contractors of Dravidian and Heavenly origin would get technical advantage as Hastinapur based contractors were not so competitive in that segment. He spoke to Viswakarma and sought his advice. Viswakarma said "Technically it would be a novel solution befitting the emerging power of the Pandavas. Still in my opinion conventional stone and metal technology should be preferred."

Draupadi was adamant on her demand for the crystal palace, despite it was evident that the cost would escalate sharply.

Duryodhana supported by his brother Dussaasana opposed building of a crystal palace on the ground that the additional cost would put financial burden on the state.

Technical bids were evaluated first. At that time only a subtle favoritism of Viswakarma towards cause of the Dravidians and was against any racial discrimination. Moy knew this fact

Kripacharya, the finance minister of Hastinapur government, was also not in favor of so much strain to the state exchequer but was stumped by Krishna's argument "The Pandavas deserve land within Hastinapur but they have accepted the barren and rocky land on the west bank, the Kauravas should reciprocate allowing higher construction budget.

Unable to counter this argument, Dhritarastra approved.

Only three qualified bids at the end were received. Moy Udyog, Hastinapur Public Works in consortium with Kurukhestra Builders and Engineers and Heaven Construction and Projects were the bidders.

A tender evaluation committee was set up comprising three members, one each nominated by the Panadavas, the Kauravas and the government of Hastinapur. Duryodhana nominated his brother-in-law Jayadratha and Krishna was Pandavas' nominee. The state of Hastinapur was represented by Bidur, deeply respected for his uprightness.

the bidders from Heaven was discovered. It was related to lightning protection device intended to

protect the palace against lightning strokes. The specification stipulated a specific alloy of gold, platinum and titanium solely manufactured by Apsara Electricals, a small Heaven based subsidiary of the bidder Heaven Construction and Projects. Naturally only they complied technically and taking deviation the other bidders offered pure gold instead.

The evaluation committee had a long debate. At the end, persuaded by Bidur, everybody agreed that specification was a little unfair and so the deviations were accepted.

Price bids were opened with great expectations and enthusiasm. Moy Udyog was the lowest. Quoting eight and half percent higher, the consortium of Hastinapur Public Works and Kurukhestra Builders and Engineers was the second lowest. Heaven Construction was the highest at three percent above the second bidder. Considering ten percent purchase preference, the consortium bid of Hastinapur Public Works and Kurukhestra Builders and Engineers was thus the lowest effectively.

Moy Udyog's representative expressed clear disappointment in the bid opening ceremony and even made an emotionally charged short speech, which was live on the prominent media. He said an honest bid was sabotaged using unfair practice of the purchase preference, endorsed by the royals of Aryan origin who vehemently proclaimed themselves as the champion of the free market and trade policy.

When the evaluation committee met for the award recommendation, Jayadratha in a jubilant mood said "I am happy that the wealth of Hastinapur will remain within. I would have been happier if the consortium from Hastinapur could win without the support of purchase preference, nevertheless it is a victory allowed within the rule." he continued further "above all we are Aryans and what more can make us happier than a victory of Aryans over the Dravidians! "

Krishna coolly responded "Jayadratha, my dear, please do not jump into conclusion. Surely purchase preference will apply, but no price preference. The consortium bidder from Hastinapur will be awarded the contract provided they offer a discount to match the lowest price."

Bidur supported the argument. Jayadratha was upset but could not differ as the bigger question of overall price economy was involved.

The consortium agreed to match the price of Moy Udyog and offering an unconditional discount.

Mr. Moy, Managing Director of Moy Udyog, was not sitting idle. He enjoyed a good relationship with Brahma (Brahma, Vishnu and Siva constitute the trinity wielding the supreme Heavenly power) who he called for help. Brahma advised him to contact Mr. Narad, the media baron of

Heaven. Narad did not promise any help but agreed to look into the matter.

Just one day before the formal announcement of the order placement, Narad TV showed an in-depth well researched report proving that the offer of discount would make Hastinapur Public Works, a state owned company, lose up to seven percent of their share of the contract price. The report seriously questioned the financial prudence of this company and also the management's competence to manage public finances."

The stock market reacted sharply. The shares of Hastinapur Public Works tumbled by seventeen percent and those of Kurukhestra Builders and Engineers by ten percent.

The Hastinapur government swung into action. The Managing Director of Hastinapur Public Works was asked to resign. Bhisma, Dronacharya and Kripacharya met Dhritarastra who for the first time took a decision without consulting Duryodhana and the decision was to award the contract to Moy Udyog.

The crystal palace was built within the contractual time period. During the inauguration ceremony Mr. Moy looked visibly triumphant. He delivered a crisply worded speech and presented to Draupadi, the queen of Indraprastha, a platinum necklace studded with seven large diamonds and forty-nine other precious stones. A business magazine later reported that it was the most expensive corporate gift ever.

A few months later Narad Media and Entertainment set its first foot print in the Dravidian world through a TV channel named Dakshin Narad.

Prasun Kumar Dutta is a Delhi-based electrical engineer and corporate executive by profession. After retiring from active employment, he rekindled his passion for writing. He writes fiction and nonfiction in English and Bengali.

Maira's Wedding

Sushovita Mukherjee

The Bengali community in New York was abuzz with excitement as they prepared for the wedding of Maira Banerjee, the beautiful and feisty daughter of the esteemed Dr. and Mrs. Banerjee, to Bobby Das, the dashing and charming son of the illustrious Mr. and Mrs. Das. The wedding was going to be a grand affair, with all the traditional Bengali rituals and customs thrown in for good measure. The Bengali community in the tri-state area had been abuzz with anticipation for weeks, and the anticipation was palpable.

As the guests began to arrive at the ornate Bengali Cultural Center in Queens, it became clear that this was going to be a wedding like no other. The men were resplendent in their dapper kurtas and embroidered shawls, while the women dazzled in their vibrant sarees and intricate jewelry. Mrs. Banerjee walked through the venue in her gorgeous beige and red Banarasi saree, and was a symbol of power and controlling everything from sari to food. Maira's cousin Sonia simply could not decide if her *dupatta* should be placed on the right shoulder or on the left shoulder. She Jostled with other cousins until she sat next to Maira to be the limelight of the show. The air was filled with the sweet scent of incense and the sound of Bengali folk music, expertly played by the local band, "The Dhak Dynamites." The team of professional wedding photographers who seemed to be everywhere, at the reception desk where the guests had their faces zoomed in, at the stage where the bride and groom were seated, and everywhere else capturing every twitch, giggle, and nudge. Then there were the shutterbugs struggling to capture an awkward Titanic pose among the guests or an unaware awkward guest slumped over the banquet spread.

Bina Mashi, Mrs. Banerjee's friend from her college days, sat next to Maira inspecting her jewelry with glasses dangling on her nose bridge. She was the elite, exclusive circle of *saree-goina* spotters who could precisely point out the material, selling price, and actual value of a *saree* or a piece of jewelry in just one glance. They knew exactly how many carats or grams of precious stones or metals the bride's necklaces and earrings make up. Maira's grandmother had flown from Kolkata and beamed with joy seeing her granddaughter dressed in bridal finery. After all, Maira had satisfied her dreams, "want to see you married before I die" sentiment. She had played the role of matchmaker in the family and was frustrated not being able to help with Maira. Only, Maira's brother Tublu looked a little crestfallen. He was a sports lover and wanted to pursue sports in college much to the annoyance of his dad. He had just received a five-minute gyaan from his dad, pointing to Rono, his elder brother's son who had got straight "A"s in Harvard.

The wedding ceremony began with Boron (the Bengali tradition of welcoming the groom with a conch shell and ululation) The groom sat in a luxury limousine and stepped into the venue like a king about to marry his queen. Mrs. Banerji accompanied by her sisters and friends stood at the entrance gate with a holy lamp, sweets and water to welcome Bobby and his family. However, things took a turn for the absurd when the boron began. Subhra Mashi, Mrs. Banerjee's sister, got a bit too enthusiastic with the conch shell blowing

and the resulting cacophony sent the guests scrambling for cover, with some of the older aunties clutching their ears in horror. Meanwhile, Maira's maternal cousins, the mischievous Sen sisters, were busy playing pranks on the unsuspecting borjatri (the groom's party). They replaced Bobby's fancy wedding shoes with identical-looking slippers that looked like they belonged to the groom's toddler nephew. The result was Bobby doing an impromptu tap dance as he walked to the dais, much to the delight of the guests.

As the ceremony began, things only got more chaotic. it was time for the grand entry of Maira to the venue. She was carried on a wooden plank by her cousins and her brother Tublu, her face covered with betel leaves. It was a heavy duty job and at one point it seemed Tublu would let go off the Piri and he screamed "They should have prepared us for this weight lifting ceremony" Then the bride and the groom were lifted high up and the coy bride slowly removed the betel leaves away from her face for Subhodristi with blowing of the conch shells and he relatives hooting and shouting in delight.

It was time for Konya Daan. Dr. Banerji's younger brother, Bhanu was to do kanya daan but he was nowhere to be found. As everyone waited anxiously, Bhanu walked in looking frazzled. As all heads turned at him, Bhanu blurted out "It's the police"! Apparently, Bhanu was speeding over the Brooklyn bridge thinking he would be late for the ceremony when the cops pulled him over. After checking his license and registration, they asked the routine question, if he knew he was speeding. Bhanu was very intelligent and asked the cops if he could show them the trunk of his car. As the cops led him to the back of the car and opened the trunk, Bhanu pointed out two or three large aluminum trays of goat curry he had picked up from the local restaurant for wedding and said that had he braked, all the gravy would have spilled in the trunk. The cops were bewildered. They sniffed the mutton but decided to let him go with a warning. Everyone clapped at Bhanu's wit.

Then came the Saptapadi. Maira in her feisty mood declared she was tired of her heavy saree and jewelry and insisted that they drop the ritual. The priest was, determined to make the wedding as authentic as possible. Vigorously nodding his head while his tiki swung like a pendulum, he grabbed Maira and Bobby's arms and yanked them off from their seats. His intentions were clear. He was not going to be part of this barbarian savage ceremony without Saptapadi. It was a tense moment, but Maira had to give in.

The food stalls were set up under colorful tents, to serve the guests, and were manned by catering manager, Mr. Singh and Dr. Banerjee. The menu was scrumptious, ranging from "fish fry, tengri kebab, mutton biriyani, mutton rogan josh, murgh musallam, murgh dopiaza, butter murgh to Mishti Doi and mishti paan. Mr Singh took pride in displaying his menu. His family business has run successfully for 50 years catering to Indian Americans in the Northeast. The dining hall witnessed some tense moments when the bride's nervous father posed the most important question to the groom's parents as if the honor of the Banerjee family was at stake, "Did you like the food?" The response was in the affirmative by Mr. Das. Then there were other foodies in the Borjatri whose verdicts were important for the Banerjees. The

delicious menu, spices were just right, mangsho ekutu besi tel chilo , they declared, like a veteran food critic. Only Mrs. Das looked with disdain at the lined-up dishes. “Where are the veggies”? she cried, fearing she would put on a few more pounds before her son’s reception. When Mr. Banerjee’s trembling finger pointed out the lonesome paneer dish at the end of the table, Mrs. Das howled, Ponir? Ae ma! ponir ki Bengali menu te thake naki, chanar dalna kothai ?

Despite the chaos in the food arena, Maira and Bobby exchanged their rings in before the wedding cake cutting ceremony, surrounded by their loved ones and a sea of delighted guests. At one point, Bobby quipped, "I promise to love Maira till death do us part, or until she loses her temper and kills me, whichever comes first." The guests roared with laughter, and even the normally serious priests couldn't help but crack a smile. As they took their first dance as husband and wife, the crowd erupted into cheers and applause, and the Banerjee family beamed with delight. Bobby was a novice in Bollywood dancing but managed some impressive moves to "Badtameez Dil". Maira’s friend Neely brought the house down with her rendition of " Sheila Ki Jawani. As the night wore on, the dance floor became a battle ground. The Sen sisters and Bobby’s friends were engaged in an epic dance-off to the tune of "Dhak Dhak Karne Laga" from the Bollywood hit film, Beta. The competition was fierce. In the end, it was a close call, but the “lehenga” Squad emerged victorious.

The night was young for the guests but Mrs Banerjee was determined to close off ceremonies with “Bidai”. Maira was tired and she cried “I cannot fake tears Mom! I am too tired. Can we just put it off? Mrs. Bannerjee was exasperated. She was not going to have Maira spoil her well planned function.

“It won’t be long Maira, I promise. Bobby will drive you only a block and bring you back to the hotel. Now cheer up”.

As the ladies lined up for the Bidai, the and the band started playing a sad tune, everybody realized they were too tired to fake tears. But Subhra Mashi yelled

I am good at crying. I have acted in many stage shows in Kolkata. Just follow me”

With this she broke into a sever howling and the ladies joined her. Maira was bewildered and confused. Bobby grasped ger hand and led her to the car. Mrs. Banerjee heaved a sigh of relief at the car pulling out of the gate.

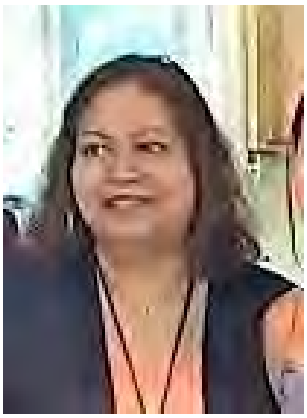

Sushovita Mukherjee lives in Maumie, Ohio. She is a research Scientist at Ann Arbor Michigan Lab. She has several hobbies; telling humorous stories is one of them

Plant Prajanmo:

Sheema Roychowdhury

‘Prajanmo’ is a Sanskrit word. This means procreation or coming into existence. Traditional essential elements for plant and animal kingdom are ether, air, fire, water and earth. Besides harvesting seed embryos there are different other ways to propagate certain plants. My Dad (Baba) had lots of interest in preparing a flower garden which was so beautiful that it drew attention from lots of visitors. In those days, in a small city in Assam the accessibility of good quality seeds was limited. He used to order different seeds including bulbs from Sutton Seeds. He would get the garden plot ready for germinating the seedlings. This he did it meticulously with lots of tender love and care with the help of his gardener. Every seed has embryonic plant and a starchy food supply. When the germination process occurs, the root breaks down the outer coating of seed and go down through the soil. This absorbs water from the soil and anchors the seedling. The shoot goes up. This needs light to support photosynthesis. When the seeds germinate, we would be amazed to see the two tiny embryos on both sides of the shoot which becomes strong slowly. Baba would tell us about the different parts of the plant and its need for moisture, light, temperature, air etc. In the morning by about 9 AM when the sun starts becoming strong if the helper was not there yet he would sprinkle water and put on the shade before he goes to his clinic which was in front of the house. While growing up I used to tend to the plants with Baba. I have seen him participating in many other horticultural arts of propagating procedures not only from cuttings, but also through grafting different color stems of bougainvillea, rose, hibiscus, dahlia etc. Grafting is the technique of joining a portion of one plant stem onto a stem, root or branch of another established plant in such a way that the union results in the growth of hybrid plant. The process is tedious and requires lots of patience. The art of propagating plants from cuttings opens up also lots of possibilities for garden enthusiasts. This is very rewarding and sustainable. This was Baba’s hobby and he enjoyed watching how new plants start flourishing which he instilled in me.

Later in life while travelling to NJ I saw a big potted cactus – colloquially called ‘Night Queen’ in one of our family friend’s house, The cactus is a species of Epiphyllum Oxypetalum which blooms at night and wilts down in the morning. The flowers are quite fragrant all through night. I had this cactus in my parents’ home and I knew this can be propagated through a leaf. I received a leaf from our friend. The leaf developed root system while I kept in soaking in water, as seen in the picture – what an amazing method of

reproduction. This leaf grew into much bigger plant which we needed to give support against backyard trees in summer. The Epiphyllum can have variety of species and can produce different colored flower which we acquired later. Few pictures of this incredible plants are shown below.

With support

artistic buds

Bloom

Bloom

Once in Christmas time our daughter presented a plant terrarium with wooded stand. I utilized this to propagate hibiscus. The life force is so strong that even though I did not pot into soil for 3 years, just changed water, these not only stayed alive but to my surprise these had buds this summer and very small hibiscus bloomed. I have many different types of potted hibiscus which blooms in summer when these are taken out of the sun room. Here are some of the flowers. Gladiolus and dahlias are propagated through bulbs and dahlias can be multiplied from stems of the plant.

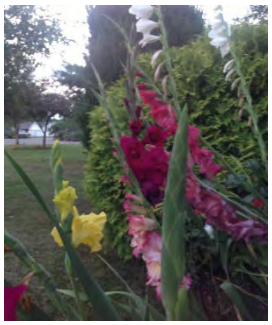

Some of the miscellaneous plants in my sunroom which have been acquired in different times. The asparagus plant e.g. is about 35 years old.

Succulent with long stem

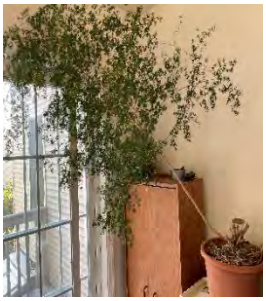
Asparagus

Bougainvillea

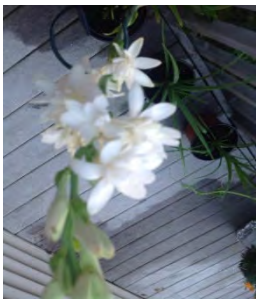
'Rajanigandha'

We received few bareroot trees about a foot long as gift toward donation to an arboretum. We did not think these will root in the soil. Now after 30+ years these are huge trees with proliferous blooms in spring.

Dogwood

Forsythia

Crab Apple

The interest grew into some vegetable planting as well.

Here is my ‘malancher sangee’ who was with me through all the processes of gardening. Initially, his interest was on vegetables only. He was innovative to devise different shades to protect the plants from the sun. But slowly he started tending to flower gardens, backyard evergreens.

Sheema Roychowdhury: Retired research scientist, studied in India and USA. Enjoys travelling, gardening and playing with baby grandson.

GBBA Community Pictures (By Maitrayee Ganguly)

GBBA Community

(Courtesy of Maitrayee Ganguly)

Cover Page drawing: Mahabrata Mondal, niece of Ashim Datta, was born and raised in Krishnagar, West Bengal. She was an ardent lover of various art and cultural activities from her childhood and specialized in drawing and painting. By profession, she is a school teacher and owns a boutique shop.

GBBA welcomes their Invited artist, Sanchita Bhattacharya; a rising singing star,and winner of many awards. Shanchita also is an established playback singer, she sang in many Hindi (Bollywood) and Bengali (Tollywood) movies.

She is Equally skillful in classical and modern music. She Sings in multiple Indian languages. She is the Winner ZEE TV “SA RE GA MA PA”, and serves as a Jury Member in ZEETV SA RE GA MA PA.

https://youtu.be/DSnwqXtUyjk?si=f_5z-ZiVwoh_krWC

https://youtu.be/8uZWpvkiq28?si=fphivVeFtGwDLDcR

https://www.youtube.com/watch?v=j8G4wMM9moo

Tri Noyoni Durga," created in a very unique and creative style.

Acrylic on paper board, 2024

Back Cover by:

I am Rajarshi Chattopadhyay, a contemporary fine artist, writer, sculptor, storyteller, and poet, working in both print and web mediums. I graduated from the Government College of Art and Craft, Kolkata, in 1996.

Rajapshi 24